# তবু কোকিল ডাকে

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সমকালীন প্রকাশনী
৮/২ এ গোয়ালটুলি লেন
। কলকাতা-১৩ ।

প্রথম প্রকাশ :
নববর্ষ : ১৩৭০
এপ্রিল : ১৯৬৩
প্রকাশক :
প্রসূন কুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
৮।২এ, গোয়ালটুলি লেন
কলিকাতা-৭০০০১৩
প্রচ্ছদপট :
গৌতম রায়
মুদ্রাকর :
মথুরা মোহন দত্ত
মা শীতলা কম্পোজিং ওয়ার্কস
৭০, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

নবকুমার বসু

মধুমিতার মেজাজ এমনি টগবগ করে ফুটছে যে সামনে দাঁড়ানো ঠাণ্ডা-মূর্তি মায়ের মনের ভিতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে কল্পনার মধ্যেও নেই। সামনে আয়না লাগানো গোদরেজের আলমারির দু'পাট খোলা। মধুমিতার অসহিষ্ণু হাতের টানাটানিতে ভিতরের সুবিন্যস্ত জামা কাপড়গুলোর লণ্ডভণ্ড দশা। মেঝেতে দু'পা ছড়িয়ে বসে এক একটা শাড়ি টেনে নামাচ্ছে. ভাঁজ খুলে দেখছে, আর রাগের চোটে মেঝেতে আছড়ে ফেলছে। মেঝেতে এখনো বিকেলের ঝাঁট পড়েনি। সিল্কের বাছাই শাড়ি ক'টা ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। নিশ্চল দাঁড়িয়ে বন্দনা অপলক চোখে কেবল দেখে যাচ্ছে।

মায়ের এভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা, চুপচাপ দেখা এমনিতেই অসহ্য লাগে মধুমিতার। ভাবে, মা এখনো এক-কালে দু'দিন সিনেমা করার সেই মেকি ব্যক্তিত্বের মহড়া দিয়ে চলেছে। ষোল বছর বয়েস হয়ে গেল মধুমিতার, জানতে কিছু বাকি নেই। এই রাশভারী মায়ের সেই ব্যক্তিত্বের ফানুস এক ছবিতেই ফটাস আর কুপোকাত। এখন স্কুল মাস্টারি করে সেই ব্যক্তিত্ব ফলাচ্ছেন আর বাড়িতেও সেই ঢং। যেন সবাই কত কেয়ার করে ওঁকে।

মায়ের ওপর রাগ হলেই মধুমিতা এ রকম ভাবে। সবাই যেন নিভা মাসি, সামনে দিয়ে হেঁটে চলে গেলেও মায়ের অঙ্গ দিয়ে ব্যক্তিত্ব ঝরতে দেখে। আসলে নিভা মাসি হাড়ে হাড়ে মোসায়েব একখানা। মা জল উঁচু বলল তো উঁচু, নিচু বলল তো নিচু। কিন্তু এই নিভা মাসিও মা-কে ভক্তি শ্রদ্ধা তলায় তলায় কত যে করে তা আর মধুমিতার জানতে বাকি নেই। সেই দু'বছর আগে নিভা মাসির সঙ্গে কি একটা ছবি দেখে ফিরে আসার পর নিভা মাসিই মায়ের সিনেমা করার কথা প্রথম ওর কাছে ফাঁস করেছিল। নিভা মাসির সিনেমা দেখার লোভ খুব। কিন্তু মায়ের জন্যেই আশ মিটিয়ে সিনেমা দেখার সাধ

মেটাতে পারে না। তার পড়াশুনার দৌড় বেশি নয়, কিন্তু লিখতে পড়তে পারে। বাড়িতে খবরের কাগজ বা সাপ্তহিক 'কথাকলি' এলে পড়ে শুধু সিনেমার খবর আর সিনেমার পাতা। আরো চার বছর আগে থেকে দেখছে নিভা মাসি বিকেলে ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরুত। রোজই তখন সে কাছের ম্যাগাজিন স্টলটার সামনে দাঁড়িয়ে যাবেই। প্রসাদ নবকল্লোল উল্টোরথ যা হাতের কাছে পাবে একটা টেনে নিয়ে এমন করে দেখতে থাকে যেন দু'চোখে দারুণ তেষ্টা। নিভা মাসির সঙ্গে গিয়ে দু'বছর আগে সেই এক ছবি দেখে আসার পর মায়ের সিনেমা করার ব্যাপারটা ফাঁস হতে মধুমিতা বুঝতে পারে বাবা এক সময়ের নামী ডাইরেক্টর হলেও সিনেমার মাসিক সাপ্তাহিকগুলো বাড়িতে কেন ঢুকতে পায় না।

ভক্তি শ্রদ্ধা না হাতি। আসলে মায়ের আশ্রয় ভিন্ন নিভা মাসির আর কোথাও ঠাঁই নেই বলে মাকে ভয় করে। নইলে দু'বছর আগে সেই ছবিটা দেখার জন্য নিভা মাসিই ওকে ফুঁসলেছিল। বলেছিল, তুই যে বাচ্ছা এখনো, নইলে তোকে নিয়ে সিনেমাটা দেখে আসতাম। কাগজে দারুণ লিখেছে, কিন্তু একটু বড়দের ব্যাপার তো...

তখনো মধুমিতা ছবি-টবি নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতো না। নিজের গান নিয়েই বেশি মেতে থাকত। কিন্তু চৌদ্দ বছরের মেয়েকে বাচ্চা বললে কেমন লাগে? ছোটদের দেখার মত ছবি হলে আর মধুমিতা ধরে পড়লে মা খুব আপত্তি করে না, নিভা মাসির সঙ্গে দেখতে পাঠায়। কিন্তু মায়ের পছন্দ না হলে আব্দার বাতিল। নিভা মাসির সেই কথা শুনে মধুমিতা মাকে আর কিছু বলেইনি। তার ঝোঁক চেপে গেছল ছবিটা দেখতেই হবে।...পারমিশন বাবার কাছ থেকে নিয়েছিল, আর দুজনের টিকিটের টাকাও। মধুমিতার বিবেচনায় বাবার মতো মানুষ পৃথিবীতে কমই হয়। বাবার কদর কেউ বুঝল না, নিজের স্ত্রী-ই বুঝল না, অন্যের আর কথা কি।...তা সেবারে বাবা টিকিটের টাকা আর পারমিশন দিতে মায়ের সে-কি ব্যক্তিত্ব ফলানো! যেন বাবার মতো বিবেচনাশূন্য মানুষ আগে আর দেখেনি।

ঠাণ্ডা ছ'চোখে তার মুখখানা আটকে নিয়ে দেখেই চলেছে। কিন্তু মেজাজ চড়লে বাবাও খোকাটি নয়। উল্টে ঝাঁজিয়ে উঠেছিল, কি এমন হয়েছে—এত কি দেখার আছে?

তারপরেও দেখার 'পোজ'খানা ঠিক রেখে মা জবাব দিয়েছিল, আমাকে লুকিয়ে মেয়ে কেন তোমার কাছ থেকে পারমিশন আর টাকা নিতে গেল বুঝতে পারছ না?

···বাবাও তেমনি মোক্ষম জবাব দিয়েছিল, প্রায় মুখ ভেঙচে বলে উঠেছিল, দারুণ বুঝেছি...মেয়ে তো আমার কিছু নয়, আমি ওর ভাল-মন্দও বুঝি না—তোমার ও-সব লেকচার-ফেকচার সব স্কুলের জন্ম তুলে রাখো।

মায়ের অত ফর্সা আর অমন সুন্দর মুখখানাতে রক্ত উঠতে দেখলে মধুমিতার অবশ্য মন্দ লাগে না।

ওদিকে নিভা মাসিও কি তলায় তলায় কম পাজি! মাকে শুনিয়ে ভাল মুখ করে ওকে বলেছিল, দাদা বলুক আর যে-ই বলুক, দিদির হুকুম না হলে আমি নিয়ে যাচ্ছি না। মায়ের থেকে চার বছরের বড় হলেও মাকে দিদি বলে সেই সুবাদে বাবাকে দাদা। এরপর ওকে নিয়ে সিনেমা দেখতে বেরিয়েও অনুযোগ, আমার কথা শুনে তুই একেবারে দাদার কাছে টাকা আদায় করতে ছুটবি জানলে তোকে কিছু বলতামই না। দিদি রেগে রইল···

রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেলে মধুমিতা তাকে জিভ ভেঙচেছিল। বলেছিল, বেশি ফ্যাচাং ফ্যাচাং কোরো না। দেখার লোভে তো নাচতে নাচতে চলেছ। তারপর সে ছবি দেখে কি দারুণ ভাল যে লেগেছিল মধুমিতার। ছেলেতে-মেয়েতে একটু জাপটা-জাপটি বেশি ছিল বটে, কিন্তু নায়ক-নায়িকার বিয়ের পর সুখে-দুঃখে ভালবাসার স্বর্গে উঠে বসেছিল দুজনে। সংকটের আগুনের মধ্যে পড়েও ওই ভালবাসার জোরে তারা উতরে গেছে। তারপর নায়িকাকে বুকে জাপটে-সাপটে নায়কের সেই তুমুল আদর দেখে তো মধুমিতারই দম-বন্ধ হওয়ার দাখিল। এক কথায় যাকে বলে দারুণ রিয়ালিস্টিক। আর মায়ের

কিনা ওকে এই সব ছবি দেখতে দিতেই আপত্তি! (…এই মেজাজে ছবিটার নামটা কিছুতে মনে আসছে না মধুমিতার। তাঁর হাতের ধাক্কায় আরো দু'টো শাড়ি মেঝের ওপর ছিটকে পড়ল।) মধুমিতার মনে আছে নিভা মাসিকে বলেছিল, এ রকম ছবি হলে তুমি আগে থাকতে আমাকে বলবে, দেখি কেমন দেখতে না দেয়।

ম্যাটিনি শো দেখার পর হেঁটে বাড়ি ফেরার পর ওই কথা হচ্ছিল। এই এক ছবি দেখতে পারার ফলেই ও নিভা মাসির কাছের একজন হয়ে গেছল। বড় একটা নিশ্বাস ফেলে নিভা মাসি বলে ফেলেছিল, সবই বরাত, নইলে ছবির জগতে তোর মায়ের তো আজ রাণীটি হয়ে বসার কথা—বরাত মন্দ না হলে আজ কি তোর সিনেমা দেখার ব্যাপারে এত কড়াকড়ি থাকত!

মধুমিতা শুনে তো হাঁ প্রথম। তরপর ভীষণ ব্যগ্র।—তার মানে? মা কি সিনেমায় নামতে চেয়েছিল নাকি?

নিভা মাসি যাকে বলে হাঁসফাঁস করে উঠছিল। ঢোঁক গিলে জবাব দিয়েছিল, ইয়ে—না না—কি বলতে কি বলে ফেললাম—তুই এ নিয়ে দিদিকে একটি কথাও বলিস না—তাহলে চিরকালের মতো আমি সিনেমা দেখাই ছেড়ে দেব বলে দিলাম!

এই শুনেই কৌতূহল উবে যাবে মধুমিতা এমন কাঁচা মেয়ে নয়। নিভা মাসির মুখ দেখেই মনে হয়েছিল যেটুকু শুনেছে তার মধ্যে দারুণ কিছু রহস্য আছে। তক্ষুনি চোখ টেরিয়ে হুমকি দিয়েছে, বলবে তো বলো, নইলে বাড়ি ফিরে মাকেই আমি জিগ্যেস করব—আর বললে কাউকে কি-চ্ছু বলব না।

বিপাকে পড়ে নিভা মাসি ওকে তখন তিন সত্যি করিয়েছে, গা ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছে। তার পরেও মা-কালীর নামে দিব্বি কাটিয়েছে। শোনার আগ্রহে মধুমিতা দিব্বি কেটেছে মা কখনো কোনদিন ওর কাছ থেকে কিছু জানবে না। তারপর শুনেছে, সিনেমায় নামতে চাওয়া নয়, মা সিনেমায় নেমেই ছিল, এক্কেবারে সরাসরি হিরোইনের রোলে—বাবার লেখা গল্প, বাবার ডিরেকশন—

ছবির নাম 'ব্যক্তিত্ব'।

উত্তেজনায় মধুমিতার চোখ বড় বড়, বুক ঢিপ ঢিপ। নিজের কান দুটোকে বিশ্বাসই হচ্ছিল না। এর পর চৌদ্দ বছরের মধুমিতা আর পঁয়তাল্লিশ বছরের নিভা মাসি মায়ের অনুপস্থিতিতে যেন দুই সখী। ক'টা দিন কি-যে উত্তেজনায় মধ্যে কেটেছিল মধুমিতাই জানে। ফাঁক পেলেই 'ব্যক্তিত্ব' ছবির আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে শুনেছে। মাত্র চার সপ্তাহ চললেও নিভা মাসি নাকি তিন-তিনবার মায়ের আর বাবার সেই 'ব্যক্তিত্ব' ছবি দেখেছে। নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে ছবির নায়িকা, মানে মা নাকি তিন-তিনটে. শয়তানের মুখ পুড়িয়ে ছেড়েছিল। ছবির নায়কও ভুল বুঝতে মা নাকি তেমনই ব্যক্তিত্ব নিয়েই দূরে সরে গেছল। এই ছাড়াছাড়ির ফলে নায়কের আক্রোশ আগুন হয়ে নায়িকাকে অর্থাৎ মা-কে দগ্ধ করতে চেয়েছিল। মায়ের তখনো নাকি কি দারুণ ধৈর্য আর ব্যক্তিত্ব। শেষে ভুল বুঝতে পেরে নায়ক হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা চেয়ে নেয়। মায়ের তাকে ক্ষমা করার ব্যক্তিত্বও নাকি অদ্ভুত সুন্দর হয়েছিল।

মধুমিতা অবাক।—তাহলে সেই ছবি চার সপ্তাহের মধ্যে উঠে গেল কেন? বলল না কেন? এটুকু শুনেই মধুমিতা এত ভালো লেগেছে—সে ছবি মার খাবে কেন? বাবার ডিরেকশন কেমন হয়েছিল? নায়কের অভিনয় কেমন হয়েছিল? মা কেমন অভিনয় করেছিল?

নিভা মাসি ডিরেকশনের অত শত বোঝে না। মায়ের পাশে নায়কের অভিনয়ও খুব পছন্দ হয়নি। কিন্তু বিবেচনায় মায়ের অভিনয় খুব সুন্দর হয়েছিল...তবে মায়ের তখনকার অত সুন্দর চেহারা ছবিতে খুব ভাল আসেনি...কেমন রাফ্-রাফ্ মনে হয়েছে, আসল মুখখানা কত সুন্দর পোড়ারমুখোরা যেন ছবি তোলার সময় আর দেখেনি—তাছাড়া ওই সাউণ্ড না কি বলে তা-ও বিচ্ছিরি—কথা ভাল করে বোঝাই যায়নি।

তার পরের ক'টা দিন মাকে আবার নতুন চোখে দেখেছে মধুমিতা। ওর সঙ্গে, আর ওর জন্মের আগে দাদা, ছোড়দা, বাবা আর মায়ের সঙ্গে যে ফোটো তিনটে ফ্ল্যাটের তিন ঘরে টাঙানো আছে—সেগুলোও নতুন করে লক্ষ্য করেছে। শুধু বাবা মায়ের আগের ফোটো কোন ঘরে নেই। মায়ের সব থেকে কম বয়সের ছবি ওই দাদাদের সঙ্গে। বছর চব্বিশ হবে তখন মায়ের বয়েস একটু বুদ্ধি পাকতে একটা ব্যাপারে মধুমিতার দারুণ অবাক লাগত। নিভা মাসির মুখেই শুনেছিল, মায়ের বছর চব্বিশ বয়সের ছবি ওটা। কিন্তু সেই বয়সে মায়ের তাহলে অমন বড় বড় তুটো ছেলে থাকে কি করে। ছবিতে দাদার বয়েস এগারোর কাছাকাছি ( এখানো অস্পষ্ট ধূ ধূ মনে পড়ে কি সুন্দর না দেখতে ছিল দাদা ), আর ছোড়দার বছর নয়। দাদার যদি এগারো হয় তো মায়ের চব্বিশ হয় কি করে—মায়ের কি তাহলে তেরো বছর বয়সে ছেলে হয়েছিল? বুদ্ধি আরো পাকতে জেরায় জেরায় নিভা মাসির কাছ থেকেই জেনেছিল দাদা আর ছোড়দা বাবার আগের পক্ষের ছেলে—মায়ের বিয়েই হয়েছিল চব্বিশ বছর বয়সে, তারও অনেক বছর আগে বাবার প্রথম পক্ষের বউ মরে গেছল। অর্থাৎ বাবার আর দাদাদের সঙ্গে মায়ের ওই ফোটো তাহলে বিয়ের পরে পরেই তোলা।...মায়ের সিনেমায় নামার ব্যাপারখানা শোনার পর মধুমিতা লক্ষ্য করেছে, ওই বয়সের তোলা ছবিতেও মা আসলে যত সুন্দর ততো সুন্দর অন্তত মনে হয় না। তু'দিকের চোয়াল একটু বেশি চওড়া লাগে, যার ফলে সত্যিকারের মিষ্টি ভাবটুকু কম মনে হয়। আর মধুমিতার সঙ্গে যে ফোটো আছে তাতেও তাই।

নিভা মাসির মুখে 'ব্যক্তিত্ব' ছবির কথা শোনার পর মাকে নতুন করে খুঁটিয়ে দেখা এমনি বেড়ে গেছল যে মা-ই একদিন বলে উঠেছিল, তুই ও-ভাবে চেয়ে থাকিস কেন—আমার দিকে চেয়ে চেয়ে কি দেখিস?

···সে আরো তু'বছর আগের কথা। মায়ের এখন একচল্লিশ, তখন উনচল্লিশ ছিল। তারও পাঁচ বছর আগে থেকে মধুমিতা মাকে

ঠিক এক রকমই দেখে আসছে। এক রত্তিও বদলায়নি। গুণতির হিসেব যা-ই হোক চেহারা দেখলে অন্তত মনে হবে মায়ের বয়েসটা এক জায়গাতেই থিতিয়ে আছে। কিন্তু দু'বছর আগে দস্তুরমত হিংসেই হত মধুমিতার। কারণ এটা ঠিক—মায়ের থেকে বেশি সুন্দরী আর কাউকে দেখত না। চলতে ফিরতে বা ট্রামে বাসে উঠলে পুরুষগুলোর আদেখলে চোখ কাকে বলে সেটা মধুমিতার জানা হয়ে গেছে। তখন একসঙ্গেই তো স্কুলে যেত রোজ, একসঙ্গেই ফিরত। স্কুলের বাস ঢের আগে আসে বলে ও উঁচু ক্লাসে উঠতেই মা স্কুল বাস ছাড়িয়ে দিয়েছিল, নিজেও ছেড়েছিল। মধুমিতার ঠিক হিসেব আছে ক'টা লোক তখন ঠিক সময় ধরে সেই বাসে উঠবেই—দেখে দেখে মুখ চেনা হয়ে গেছল। হবে না কেন, দূর থেকে ওরা আসছে দেখলে ওই রকম চেনা মুখকে মধুমিতা বাস ছেড়ে দিতে দেখেছে। ওরা যায় দক্ষিণে, অফিস টাইমের উল্টো দিকের ফাঁক বাস তখন—ভিড় নেই, তবু সে বাস ছেড়ে দেওয়ার আর কি কারণ থাকতে পারে? সেই চেনা মুখগুলোর মধ্যে মায়ের থেকে দশ বছরের ছোট এমনও দুই একজন ছিল। মধুমিতার রাগ হত, হিংসে হত আবার হাসিও পেত। কারণ মায়ের ব্যক্তিত্ব ঠাঁসা মুখখানা তখন আরো দেখার মতো হত।

সে যাক, মায়ের ওই কথায় হঠাৎ খিলখিল হাসি মধুমিতার। তারপর জবাব দিয়েছিল, তোমাকেই দেখি, এত সুন্দর দেখতে তুমি আর অদৃষ্টে জুটল কিনা স্কুল মাস্টারি—আর কিছু করতে পারলে না?

মাকে বোকা মধুমিতাও ভাবে না, কিন্তু ওর মনে কি আছে মা কল্পনা করবে কি করে? শুনে ধমক অবশ্য খেতে হয়েছিল। মা বলেছিল, দিনকে দিন বড় বেশি পাকা হয়ে যাচ্ছিস এ কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি। এই জন্যেই রেজাল্টের এমন ছিরি—কেমন?

আগে পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়াটা ধরা বাঁধা ছিল। তারপর সেকেণ্ড আর সে-বছর থার্ড। মায়ের তাই ওর ওপরে তখন উঠতে বসতে রাগ। যা-ই হোক একটা বছর মায়ের সিনেমা করা নিয়ে নিভা মাসির সঙ্গে

ফিসফিস গুজগুজ করেছে। পনেরোয় পড়তে মাথায় নতুন প্ল্যান গজিয়েছে, বাবা তো এমনিতেই দারুণ ভালবাসে ওকে, তাকে আরো ভোলানো তো জল-ভাত ব্যাপার। বাবার সঙ্গে মায়ের দিন রাতে বিশটা কথাও হয় কিনা সন্দেহ। আর কথা মানেই ঝগড়া। রেগে গেলে যা-তা অবশ্য বাবাই বলে বসে, কিন্তু অত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলে রাগ তো হতেই পারে। মা গলা অবশ্য কখনোই চড়ায় না, কিন্তু এমন চেয়ে থাকে যেন টিকটিকি দেওয়ালের গায়ের পোকা-মাকড় দেখছে। আর তাইতেই বাবা সব থেকে বেশি তেতে ওঠে। মায়ের কোন কথায় আপত্তি করলেও তেমনি চাউনি। তারপর বলবে, বাজে বোকো না, যা বলছি করো!

মধুমিতার ধারণা বাবাকে মা মানুষ বলেই গণ্য করে না। তার একমাত্র কারণ, নিভা মাসিকে নিয়ে এখানকার এই চারজনের সংসারের সংসারের খরচা-পত্র বেশির ভাগ মা-ই চালায়—ছবি করার ব্যাপারে বাবার ভাগ্যটা যেন রাহুর গ্রাসের মধ্যেই পড়ে আছে—এদিকে চন্দ্র সূয্যি গিলে সামলাতে না পেরে আবার উগরে দেয়, শুধু বাবার ভাগ্যখানাই রাহু যেন একেবারে হজম করে বসে আছে। বাবা অবশ্য এখনো হাল ছাড়েনি। নিয়মিত স্টুডিওতে যায় আসে, ছবির প্রডিউসারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। পুরনো লোক, চেনে তো সকলেই। তাদের স্ক্রপ্ট লিখে দিয়ে বা আরো পাঁচ রকম ভাবে সাহায্য করে কিছু রোজগারও করে। স্বাধীন স্ক্রপ্ট তৈরি করার কাজ পেলে থোকে ভাল টাকাও ঘরে আনে অনেক সময়। মধুমিতা সেটা সকলের আগে টের পায়, কারণ তখন সকলের আগে বাবা ওকেই ডেকে জিগ্যেস করে কি নেবে। ওর হাতের এই দারুণ দেখতে ঘড়িখানাও তো বাবার দেওয়া।

কিন্তু বাঁধা রোজগার নেই বলেই মায়ের কাছে বাবার কোন দাম নেই, নইলে এমন হেলাফেলার আর কি কারণ থাকতে পারে? বাবা যখন মাঝে মাঝে মনমরা হয়ে চুপচাপ ঘরে বসে থাকে তখনও যদি মায়ের এতটুকু সহানুভূতি থাকত—ফিরে পর্যন্ত তাকায় না। তাই ওর

মতো মেয়ের এমন বাবার চোখের মণিটি হয়ে বসতে কতক্ষণ। কাছে বসে গায়ে পিঠে একটু হাত বুলোলে গলে জল।

মায়ের সিনেমা করার খবরটা জানার পর থেকে মধুমিতা বাবার দিকে বেশি নজর দিচ্ছিল। মায়ের সঙ্গে একতরফা চেঁচামেচি করে বাবা মন খারাপ করে নিজের ঘরে শুয়ে থাকে, মধুমিতা তখন নিজের হাতে হয়তো বাবার জন্য এক পেয়ালা চা করে আনল। বাবার চা খুব পছন্দ, কিন্তু সকালে, আর বাড়ি থাকলে অন্য সময় বরাদ্দের বাইরে চা কমই জোটে। চাইলে নিভা মাসি অবশ্য করে দেবে, কিন্তু তার আগে ভয়ে ভয়ে মায়ের দিকে এমনভাবে তাকাবে যে বাবার কেন, মধুমিতার সুদ্ধু ভীষণ রাগ হয়ে যায়। অপমান লাগে বলেই বাবা নিভা মাসিকে সহজে বলে না।

কিন্তু মধুমিতা চা নিয়ে গেলে বাবা গলে জল।—তুই চা আনলি, কে পাঠালে?

মধুমিতার সাফ জবাব, কে আবার পাঠাবে—আমি নিজেই তোমার জন্যে করে নিয়ে এলাম।

—তোর মা কিছু বলল না?

—হুঁ, আমি ভারি কেয়ার করি, শুধু জিগ্যেস করল কার জন্যে—বলে দিলাম।

বাবার মুখে খুশি ধরে না।

এই চায়ের কথাতেই আর একদিন মধুমিতা যে-কথা বলে বসেছিল তাতে বাবা কি কাণ্ডটাই না করল। ভয়ে আঁতকেই উঠেছিল একেবারে বাবার কথার উত্তরে ও বলেছিল, হুঁঃ, বলবে, আমি যদি তখন ফিরে মাকে জিগ্যেস করি—প্রদোষ খাসনবিশ এলে মা এক সন্ধ্যায় দু'বার ছেড়ে তিনবারও চা করে কেন—তখন তো বিরক্তি ধরে না?

বাবা লাফিয়ে উঠে এক হাতে ওর মুখে চাপা দিয়েছিল—চুপ চুপ! বাবার চোখে মুখে অদ্ভুত আনন্দ আর ফিসফিস গলা।—কক্ষণো বলবি না, অমন কথা মুখে আনবি না—মা তাহলে আস্ত রাখবে না!

না, মাকে ওরকম বলার সাহস মধুমিতার সত্যি নেই তা বলে।

কিন্তু নিজের বুদ্ধি বিবেচনায় কেন যেন মনে হয়েছিল, ওর মুখে এ-কথা শুনলে বাবা খুশি হবে। তা খুশি বলে খুশি—চায়ের পেয়ালা ওর হাত থেকে নামিয়ে রেখে ওকে পাশে বসিয়ে সে কি আদরের ঘটা। তেমনি ফিসফিস করে বলেছিল, তুই আমার সোনা মেয়ে···খাসনবিশ এলে তোর মা তিনবার চা করে দেয় বুঝি?

মধুমিতাকে একটু ঢোঁক গিলতে হয়েছিল।—এক-একদিন তু'বার তো দেয়ই।

প্রদোষ খাসনবিশ মায়ের বা ওদের অমন নামজাদা স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার। ওই একজন ছাড়া কমিটির আর সবাই অবাঙালী। কিন্তু প্রদোষ খাসনবিশের প্রতাপ প্রতিপত্তি ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যানের থেকেও বেশি। ভদ্রলোকের ইমপোর্ট এক্সপোর্টের কি ব্যবসা তা বাবা বা মধুমিতা জানে না। তবে সকলেই জানে এই ব্যবসায় তার অঢেল টাকা। তার এক ভাই মন্ত্রী, তাই আরো পাঁচজন মন্ত্রীর সঙ্গে তার খাতির। আর এক ভাই মস্ত পুলিশ অফিসার। সেই সুবাদে পুলিশ মহলেও সে দাদা গোছের একজন। এমন লোক স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির বহুদিনের মেম্বার, তার প্রতিপত্তি হবে না তো কার হবে।

···আসলে মধুমিতার কিন্তু প্রদোষ খাসনবিশের ওপর একটুও রাগ নেই। রাগ থাকবেই বা কেন। মাসে এক আধ-দিন মস্ত গাড়ি করে এসে বাড়িতে পা দিয়ে ভদ্রলোক মধুমিতার নাম ধরেই হাঁক দেয়। ওর জন্যে কিছু না কিছু হাতে করে নিয়ে আসেই। জন্মদিন-টিনে তো সব থেকে দামী উপহার সে-ই দেয়। বসে কম করে ওর তু'তিনখানা গান শোনে। আদর করে মামুণি বলে ডাকে—বলে তোর গান শোনার জন্যেই তো তেল খরচ করে এলাম।

মধুমিতা সাত বছর বয়স থেকে গান শিখছে। শনি, রবিবারে গানের স্কুলে যায়। সেখানে মাসে পঁচিশ টাকা বেশি দিয়ে সপ্তাহে একদিন আজকাল মা শুভেন্দু লাহিড়ীর কাছেও গান শেখার ব্যবস্থা করেছে। মায়ের সঙ্গে আগে জানাশোনা ছিল কি না কে

জানে, নইলে স্কুলের অমন একজন নামী গাইয়ে মাত্র পঁচিশ টাকায় গান শেখাতে রাজি হয় কি করে।

মোট কথা, গান মধুমিতা রায় দস্তুরমত ভাল গায়, আর পাড়ায় বা কাছাকাছির মধ্যে গানের আসর বসলে তার ডাকও পড়ে।

কিন্তু প্রদোষ খাসনবিশের মতো মানুষ ওর গান শুনতেই আসে মধুমিতা বোকার মত সেটা আগে বিশ্বাস করত, এখন আর করে না। কারণ সেই চৌদ্দ থেকে মাথাখানা পাকতে শুরু করেছে, পনেরোয় তো আরো পেকেছে। ঠিক বুঝতে পারত মায়ের এই সমাদরের মানুষকে বাবা একটুও পছন্দ করে না, সে এলে বাড়িতে থাকলেও বেরিয়ে যায়। তাই এমন এক হোমরাচোমরা মানুষের বাড়ি আসাটা মধুমিতা সেই চৌদ্দ বছর থেকেই বাবার কথা মাথায় রেখেই বিচার বিবেচনা করেছে। পনেরোয় নিঃসন্দেহ হয়েছে ওর গান ভালো লাগে বিশ্বাস করলেও ভদ্রলোক সেইজন্যেই আসে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আসে মায়ের সঙ্গে গল্প করার লোভেই। বেশ একটু মজাই পায় তার পর থেকে, ওর গান হয়ে গেলে আর সামনে বোকার মতো বসে থাকে না, ঘুরে ফিরে এক একবার আসে, আড়াল থেকেও লক্ষ্য করে দুজনকে। দরজা জানলা সব হাট করে খোলাই থাকে, চোখে পড়ার মতো কি আর দেখবে? এক, মায়ের তখন বেশ হাসি হাসি মুখ। ভদ্রলোকের এক একবারের হা হা হাসিও মেকি মনে হয় না, তবু মধুমিতার মাথায় অনেক রকমের কৌতুক উঁকিঝুঁকি দেয়।

মায়ের মুখেই শুনেছিল, ছাব্বিশ বছর বয়সে ম্যানেজিং কমিটির এই বাঙালী ভদ্রলোকের সুপারিশেই অমন নামজাদা মেয়ে স্কুলে চাকরিখানা পেয়েছিল। অবশ্য মা ফিলসফিতে এম. এ পাশ কোয়লি-ফিকেশনের ঘাটতি কিছু ছিল না। তবু অন্য মেম্বারদের নাকি আপত্তি ছিল, এমন কি প্রিন্সিপালেরও। সেই আপত্তির কারণ মধুমিতা তার পনেরো বছর বয়সেই আঁচ করেছে। ফিল্ম এ্যাক্ট্রেসকে কে আর পারলে স্কুলে ঢোকাতে চায়? সে সময়ের মেয়েদের কাছে বা টিচারদের কাছে মায়ের 'ব্যক্তিত্ব' ছবির খবর তো আর অজানা থাকতে পারে না। ছবি

আর করবে না বললেই বা সেটা ক'জনে আর মেনে নিতে পারে। মায়ের সেই ইণ্টারভিউতে গোটা ব্যাপারখানা কি হয়েছিল মধুমিতার খুব জানার লোভ। প্রদোষ খাসনবিশ কি করে বা কি বলে সকলের আপত্তি নাকচ করল তা-ও। ...এই একজন পিছনে আছে বলেই চাকরির তেরো বছরের মাথায় মা অমন একখানা স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল। এখনো তাই। আরো তিন চার বছর বাদে প্রিন্সিপাল রিটায়ার করলে মা-ই প্রিন্সিপাল হবে সেটা ধরা বাঁধাই। তাছাড়া এখন ম্যানেজিং কমিটিতে প্রিন্সিপাল ছাড়া বাকি দুজন টিচার মেম্বারের মধ্যে মা একজন। স্কুলের অন্য টিচারদের কথা না হয় ছেড়েই দিল, প্রিন্সিপাল পর্যন্ত মাকে কম খাতির করে? অবশ্য সেই বাচ্চা বয়েস থেকে মধুমিতা দেখে আসছে স্কুলে মায়ের নাম ডাক খুব। অমন চেহারাও আর কারো নেই, অত পারসোনালিটিও না। অল্পবয়সী টিচাররা মাকে দারুণ সমীহ করে, আর মেয়েদের তো ভয়-ভক্তির শেষ নেই। মা বাড়িতে যেমন স্কুলেও তেমনি। কোন মেয়েকে গলা চড়িয়ে বকা দূরে থাক, সোজা মুখের দিকে খানিক চেয়ে থাকলেই তার হয়ে গেল। কিন্তু শুধু ঐ জন্যেই স্কুলে মায়ের এত মর্যাদা, এ বিশ্বাস করার মতো দুধের মেয়ে মধুমিতা এখন অন্তত আর নয়।

বাবা মাঝে-সাজে মদ খায় এ-ও মায়ের অসহ্য! সিনেমা লাইনের পুরনো লোক, পার্টি-টার্টি থাকলে ডাক পড়ে। বাবা নিজেই মনের দুঃখে মেয়েকে এ-কথা বলেছে। মদ খেয়ে বাবাকে কখনো বেতাল হতে দেখেনি মধুমিতা, বরং আরো চুপচাপ আর ঠাণ্ডা থাকে। কিন্তু মদ খাওয়াটাই মায়ের দু'চক্ষের বিষ। তখন বকাবকি রাগা-রাগি কিছু করে না। কিন্তু দু'তিন দিন পর্যন্ত ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয় না, ঘরে ঢুকলেও আপত্তি। বলে, এদিকে না, নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসে থাকো।

বাবার হতাশা মধুমিতা যেটুকু বোঝে মা কেন সেটুকু বোঝে না বা বুঝতে চায় না, ভেবে পায় না। ওর ধারণা,

এর মধ্যে একটু আধটু ড্রিংক করলে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও বাবার মন ভালো থাকে। ওদের ক্লাসের সোনালি মস্ত বড়লোকের মেয়ে। বাড়িতে তিনখানা গাড়ি ওদের। গাড়ি ছাড়া সোনালির মাটিতে পা পড়ে না। ওর সঙ্গে মধুমিতার খুব ভাব। সোনালি বলে, প্রায়ই রাতে ওর বাবা মা আর বড়দা একসঙ্গে বসে মদ খায়। বড় হলে নাকি অন্য দুই দাদা আর ও নিজেও খাবে। ওরা তো কম কালচার্ড নয়, বাপের চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্সির ফার্ম, দুই দাদা এঞ্জিনিয়ার, ছোড়দা বি. এ. পড়ছে—মা-ও বি. এ. পাশ। তাহলে মদ খাওয়া এত কি দোষের ? অবশ্য রাস্তায় মাতাল দেখলে মধুমিতার ভয়ও করে ঘেন্নাও করে, কিন্তু মদ খাওয়া মানেই তো মাতলামি করা নয়। ওর বদ্ধ বিশ্বাস, বাবাকে গঞ্জনা দিয়ে মা এক ধরনের আনন্দ পায়, তাই উঠতে-বসতে তার দোষ। মধুমিতার ভাবতে ইচ্ছে করে অত বড় লোক প্রদোষ খাসনবিশও একটু আধটু মদ খায়, আর মা তা জেনেও তাকে বরদাস্ত করে।

·· মধুমিতা বড় হয়ে যদি অনেক টাকা রোজগার করতে পারে (অঢেল টাকা রোজগারের একটা রাস্তা মগজে এখন থেকেই উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে) তাহলে বাবাকে ও ভাল-ভাল বিলিতি বোতল প্রেজেন্ট করবে। তখন বাবার মুখখানা ছেড়ে মায়ের মুখখানা দেখতে কেমন হবে ভাবতে মজা লাগে।

এই পনেরো বছর বয়স থেকে মধুমিতা বাবার ঢের কাছে এসে গেছে। মায়ের অজান্তে বাবার সিনেমার কাজ-কর্ম নিয়েও আলোচনা করে। বাবার বয়েস হয়ে গেছে আর সেকেলে হয়ে গেছে বলে তাকে কেউ ছবির ডিরেকশন দিতে ডাকে না শুনে যেমন রাগ হয় তেমনই দুঃখ হয়। বয়েস তো একদিন সকলেরই হয়, তা বলে সে কি ফুরিয়ে যায় নাকি ! বাবা তো নিজেই বলে, নিজের এমন দু-তিনটে প্লটের চিত্রনাট্য পর্যন্ত তার করা আছে যে, টাকা নিয়ে কেউ এগিয়ে এলে একালের ডাইরেক্টরদের সব তাক লাগিয়ে দিতে পারে। কিন্তু বরাতটাই খারাপ, কেউ মোটে শুনতেই চায় না। যদি কেউ

মাথা উঁচিয়ে উঠল তো ভেড়ার পালের মতো প্রডিউসাররা সেদিকেই ছুটল।

বেশ মাথা খাটিয়ে মধুমিতা বাবার পুরনো ছবির আলোচনাও তুলেছে। কোন্‌টা কোন্‌টা ভাল ছবি, তখন কেমন নামডাক হয়েছিল বাবার। তিন চারটে ছবির নাম, গল্পের নাম, তার নায়ক-নায়িকাদের নাম আগ্রহ ভরে শুনেছে। তারপর তাঁর মার-খাওয়া ছবি সম্পর্কে আলোচনা তুলেছে—কেন মার খেল, নায়ক নায়িকা কারা ছিল। বাবা প্রথম যে ছবিটার নাম করেছে সেটা মায়ের ছবি নয়। মাথা খাটিয়ে ঠিক এই সময়েই উঠে গিয়ে মধুমিতা বাবার জন্য এক পেয়ালা চা করে এনেছিল। তারপর ভালো মুখ করে জিগ্যেস করেছে, আর কোন্ ছবি মার খেয়েছিল?

এবারে বাবা ফোঁস করে একটা বড় নিশ্বাস ফেলে জবাব দিয়েছে, শেষের যে ছবিটা মার খেল তাইতেই তো আমার পিঠটা ভেঙে গেল, মাথায় কি যে শনি চেপেছিল...

এরপর জেরায় জেরায় মধুমিতা 'ব্যক্তিত্ব' ছবির সমস্ত খুঁটিনাটি বার করে নিয়েছে। বলতে বলতে বাবা অনেক বার করে থেমেছে আর ওকে সাবধান করেছে, আমি বলেছি তোর মা যেন না জানে।

মধুমিতা মাথা নেড়ে আশ্বাস দিয়েছে, মা জানবে না। আবারও বলতে গার্জেনের মত মুখ করে বলে উঠেছে, ও-কথা বার বার বলছ কেন, তোমার জন্যেই মায়ের ওপর আমার কত রাগ বুঝতে পারো না?...তা ছবিটা ওভাবে মার খেল কেন, মায়ের দোষে?

বাবা আমতা আমতা করে জবাব দিয়েছিল, না, দোষে ঠিক নয়, অভিনয় বেশ ভালই করেছিল, কিন্তু তোর মায়ের মুখ ছবিতে খুব ভাল আসে না...আমি ভেবেছিলাম মেক-আপ-এ মেরে দেব—কিন্তু তাইত আরো কেমন হয়ে গেল।

মধুমিতার খেয়াল হয়েছে, বাড়িতে মায়ের যে ফোটো ক'খানা আছে, তাতেও মা যে এত সুন্দর তা মনে হয় না। ওদিকে ওর নিজের ফোটো যে দারুণ ভাল আসে ততদিনে সে জ্ঞানও টনটনে

হয়েছে। এর দিন কতক আগেও একটা ফোটো তুলতে বাবা খুশি হয়ে বলেছিল, তোর মুখ তো দারুণ ফোটোজেনিক রে!

কথাটা মধুমিতা সেই থেকে মনে রেখেছিল। মায়ের প্রসঙ্গে বাবা ও-কথা বলতে শব্দটা ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া গেছল। বেশ গম্ভীর চালে জিগ্যেস করেছিল, তার মানে মায়ের মুখ ফোটোজেনিক নয়?

বাবা বেশ জোরেই মাথা নেড়েছে।—একেবারে না, অথচ তোর মা তখন সত্যিকারের সুন্দরী ছিল—

মা যে এখনও দিব্বি সুন্দরী মধুমিতা সেটা নিজের কাছে অস্বীকার করতে পারে না।

বাবা বলে গেল, তা ছাড়া ছবিটাকে আরো মেরে দিয়েছিল পুওর সাউণ্ড রেকর্ডিংয়ে...বরাত মন্দ হলে যা হয়।

কি মনে পড়তে মধুমিতা দারুণ উৎসুক।—আচ্ছা বাবা, সিনেমার কাগজ-টাগজগুলোতে মায়ের তখন খুব ছবি-টবি বেরিয়েছিল, তাই না?

—হ্যাঁ, আগে তো দারুণ বুম্ ছিল বইটার।

—বুম্ ছিল মানে, একটা দারুণ ছবি আসছে রটে গেছল? সিনেমার সেই সব পুরনো কাগজ তোমার কাছে আছে?

বাবার আবার অস্বস্তি।—ও দিয়ে আর কি হবে, তোর মা যদি আবার—

সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের মিষ্টি তর্জন, ফের! এরপর তোমার সঙ্গে আড়ি হয়ে যাবে কিন্তু বলে দিলাম।

—আচ্ছা, তোর মা যখন বাড়ি থাকবে না তখন দেখাব।

দেখিয়েছে। হাঁ-করা পুরনো চামড়ার সুটকেসের মধ্যে ছিল। না, মায়ের এ ছবিগুলোও একটু ভালো ওঠেনি। তবে একটা খবর অনেক কাগজেই আছে, নবাগতা এম. এ. পাশ অভিনেত্রী-বন্দনা মিত্র (তখন মিত্র ছিল) ছবিটিতে দারুণ অভিনয় করছে!

দুঃখ করে বাবা ওকে 'ব্যক্তিত্ব' ছবির স্ক্রপ্ট পর্যন্ত পড়তে দিয়েছিল।

—চুপি চুপি পড়ে দেখ, আমারই প্লট—এ-গল্প কি মার খাবার মতো ছিল… !

মায়ের অজান্তে মধুমিতা সাগ্রহে পড়েছে। শেষ না করে ছাড়তে পারে নি। তার মনে হয়েছে ভীষণ ভালো গল্প। এ গল্পকে কেউ মেরে না দিলে মার খেতে পারে না। এর পর ও বদ্ধ বিশ্বাস বাবার অমন দুর্দিনের জন্য মা-ই দায়ী।

এরপর বাবার সঙ্গে আরো জমাটি ভাবসাব। তবু মধুমিতার মগজে যে-বাসনা এখন দানা বাঁধছে সে-সম্পর্কে বাবাকেও কিছু বলেনি। তার সঙ্কল্প, মা বাবাকে ডুবিয়েছে, আবার ও একদিন এই বাবাকে টেনে তুলবে—তুলবেই। আর কিছু না হোক, বাবার দুর্দিন ঘোচাবেই, তাকে ও কক্ষনো মায়ের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে দেবে না।

সেই পনেরো বছর বয়সেই এক রকম জোর করে নাচের স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। গান ভালো করে, কিন্তু ভবিষ্যতের রাস্তা পাকা করতে হলে গানের সঙ্গে নাচও জানা দরকার।

মা বাধা দিয়েছিল, গান নিয়ে আছিস এর ওপর আবার নাচ কেন—পড়াশুনায় জলাঞ্জলি দেবার ইচ্ছে ?

মধুমিতার সাদা সাপটা জবাব, স্বাস্থ্য চর্চা করলে পড়াশুনা নষ্ট হয় না মা—নড়াচড়া নেই খেলাধুলো নেই, ঘরে বসে থেকে থেকে তোমার মতো মুটিয়ে যাই আর কি।

বন্দনা লক্ষ্য করেছে, মেয়ের কথাবার্তার ধরন বদলাচ্ছে, মুখের ওপর ঠাস ঠাস জবাব দেয়। তবু এ-কথায় একটু হাসিই পেল।—তোর চোখ দেখা, আমি ঘরে থেকে মুটোচ্ছি, না তুই দিনকে দিন ফড়িং হচ্ছিস ?

এ-ও খুব সত্যি নয়। মেয়ে এখনই তার মত লম্বা, দোহারা পেলব স্বাস্থ্য। তবু ইচ্ছে করেই বন্দনা খোঁচাটা দিল কারণ তার ওপর মেয়ের চাপা হিংসে জানা আছে। মেয়ের এই কাঁচা বয়সের মুখশ্রী বলতে গেলে তার থেকেও সুন্দর। কিন্তু মেয়ের হিংসে গায়ের

রং নিয়ে। ফর্সাই, তবে মায়ের ধারে-কাছে নয়। সাত আট বছর বয়সে এই মেয়ে দরজা বন্ধ করে মা'র গায়ের জামা কাপড় সরিয়ে গায়ে গা ঘষত আর বলত, আমি তোমার গায়ের রং নিয়ে নিচ্ছি— এরপর তুমি কালো হতে থাকবে আর আমি ফর্সা হতে থাকব। নিজেও জানে ও কালো নয়, স্কুলে তো সুন্দরী মায়ের সুন্দরী মেয়ে বলেই ওর নাম—কিন্তু মায়ের রঙের এত তফাতটা চক্ষুশূল।

নাইন থেকে টেন উঠেছিল যে-বছরে, সেবারেই মধুমিতা প্রথম স্কুলের থিয়েটারে নিজে সেধে নাম দিয়ে এসেছিল। এতদিন ফাংসানে কেবল গান করত। থিয়েটারে মায়ের আপত্তি জেনে টিচার বা ছাত্রীরা ওকে ডাকতে সাহস পায়নি। কিন্তু নিজে থেকে নাম দিচ্ছে যখন, তাকে বাতিলই বা করবে কেন। জানাজানি হতে মা ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছল, মধুমিতার চোখ এড়ায়নি। একদিন ডেকে রুক্ষ গম্ভীর মুখে বলেছে, ও-সব আমি পছন্দ করি না, আমাকে না বলে কেন নাম দিতে গেলি ?

মধুমিতার সাফ জবাব, করবই তো, সব মায়েরই যদি তোমার মতো আপত্তি হয় তো নিজেদের স্কুলের থিয়েটার কি বাইরের মেয়েরা এসে করবে ?

বরাত জোরে সেই সন্ধ্যাতেই প্রদোষ খাসনবিশ বাড়ি এসে হাজির। মায়ের সামনেই মধুমিতা তাড়াতাড়ি তাকে সুখবরটা দিয়েছে, স্কুলে এবার আমাদের চিত্রাঙ্গদা আর চণ্ডালিকা হচ্ছে— চণ্ডালিকায় আমি গান গাইব আর চিত্রাঙ্গদায় আমার চিত্রাঙ্গদার রোল্।

ভদ্রলোকও প্রথমে একটু অবাক হয়েছিল বোধ হয়, কারণ, খবরটা শুনেই মায়ের দিকে তাকিয়েছিল। তারপর অবশ্য সানন্দে উৎসাহ দিয়েছে,—ওয়াণ্ডারফুল ! আমাকে তো তাহলে দেখতে যেতেই হয়।

মায়ের দিকে আড়চোখে এমন করে তাকিয়েছিল মধুমিতা যে তার দুই ভুরুর মাঝে ভাঁজ একটু পড়েই ছিল।

চিত্রাঙ্গদা নাটকে মধুমিতার সত্যি দারুণ নাম হয়ে গেছল। সকলে বাহবা দিয়েছে। মধুমিতা নিজেও ভাবেনি প্রথম নাটকেই এত ভালো অভিনয় করবে। মায়ের সঙ্গে একটা কাল্পনিক রেষারেষির ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। প্রদোষ খাসনবিশ তো ওকে একটা সোনার মেডেল পর্যন্ত দিয়েছে। শুধু মা ভালো মন্দ একটি কথাও বলেনি।

পরের বছর মধুমিতা যেন গোঁ ধরে মায়ের আরো বেশি অবাধ্য হয়েছে। মা ডাইনে যেতে বললে বাঁয়েও পা বাড়াবে। কথায় কথায় বেশি পারসোনালিটি ফলানোর খোঁটা দেবে। ঝগড়া লেগে গেলে গলা বাবা একতরফাই চড়ায়—তাতেও মধুমিতা বাবার পক্ষ নিয়ে মাকে দু'কথা শোনায়। রেগে গেলে বন্দনা ঠাণ্ডা চোখে মেয়ের দিকে চেয়ে থাকে, বলে, আমি কিন্তু দেখে যাচ্ছি।

মধুমিতা বেপরোয়া। জবাব দেয়, দেখে যাও—অনেক দেখেছ, আরো ঢের দেখতে বাকি আছে। বলেই হনহন করে সামনে থেকে চলে যায়।

বন্দনা রায় ভাবতে পারে না, তার মুখের ওপর তারই মেয়ে এ-ভাবে কথা বলতে পারে। বাবা-মেয়ের এখন খুব ভাব দেখছে, সে-ই তলায় তলায় বিষোচ্ছে কিনা মেয়েটাকে এমন সন্দেহও হয়। কিন্তু মুখে কিছু বলে না।

চার মাস আগে সেকেণ্ডারী পরীক্ষা হয়ে গেছে। আর সেই সময় মধুমিতার মাথায় মা-কে মোক্ষম জব্দ করার মতো একটা দারুণ বুদ্ধি খেলে গেছে। অবশ্য নিজের অজান্তে সেই সুযোগ বাবাই করে দিয়েছিল। তার দু'দিন আগে বাবা এক পার্টি থেকে বোধ হয় একটু বেশি মাত্রায় মদ খেয়ে ফিরেছিল, কারণ, পরদিন সকাল ন'টার আগে আর বিছানা ছেড়েই ওঠেনি। সকালের বাজার বাবাই করে থাকে। মায়ের মেজাজ আঁচ করে নরম করেই বাবা বলেছিল, কি আনতে হবে···দাও···

দাও বলতে টাকা। জবাবে মা ঠাণ্ডা চোখে বাবার মুখখানা

দঙ্গেছে খানিক। তারপর বলেছে, আমাদের ভাবনা আর তোমাকে ভাবতে হবে না—আদর করে যারা অত খাওয়ায় তোমার ভারটা তারা নেয় কিনা চেষ্টা করে দেখ।

অপমানে বাবার দু'চোখ লাল। মা তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে তো আর বলতে পারে না, তিন ঘরের পুরনো পৈতৃক বাড়ি বাবার নামে—তাই খাওয়ার খোঁটা। মায়ের কথার জবাবে মেয়ের দিকে ফিরে বলেছিল, শুনলি?

—ওকে বলছ কেন, তুমি শুনেছ? মায়ের গলায় আবারও সেই ঠাণ্ডা আগুন।

রাগে মধুমিতা জ্বলছিল। বাবাকেই ধমকে উঠল, তোমাকে নিয়ে মায়ের যখন এত অসুবিধে, তখন মাকে তুমি হস্টেলে গিয়ে থাকতে বলতে পারো না? এখানে আমরা দুজন না হয় এক বেলা খেয়ে থাকব—তাও না জোটে না খাব!

দুমদাম পা ফেলে চলে গেছল। বাবাও সঙ্গে সঙ্গেই সরে গেছে। মায়ের মুখের ওপর মেয়ে এমন জবাব দিতে পারে এ যেন কানে শুনেও বিশ্বাস হয় না।

··বন্দনা পায়ে পায়ে ঘরে এলো। ফর্সা মুখ রক্তবর্ণ। কিন্তু মেয়ে ঘরে নেই। ওর বাবার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বাপের চৌকিতে মেয়ে গুম হয়ে বসে আছে। বাইরে থেকে দু'জনকেই দেখল খানিক। তারপর চলে গেল।

পরদিন। মা ও বাজারের টাকা দিতে বাবার ঘরে ঢুকল না। বাবাও ঘর ছেড়ে বেরুল না। এই সময় ঝাঁট-পাটের ঠিকে ঝি বাবার ঘরে ঢুকতেই তার চাপা গর্জন শোনা গেল, চলে যাও, ঝাঁট দেবার দরকার নেই, চারদিকে জঞ্জাল স্তূপাকার—উনি ঝাঁটা বোলাতে এলেন।

ঝি ভয়ে পালিয়ে এলো।

এদিকে মা-মেয়ে দুজনেই ওই গর্জন শুনল। ঝিকে মেজাজ দেখানোর দরুণ মায়ের মুখে বিতৃষ্ণা।

এই ব্যাপার থেকেই বিদ্যুত ঝলকের মতো একটা দারুণ বুদ্ধি

মধুমিতার মাথায় খেলে গেল। একটা কৃত্রিম ব্যক্তিত্ব ভাঙার সুযোগ যেন হাতের মুঠোয়।

বেলা তিনটে নাগাদ বাবা বেরিয়ে গেল। মধুমিতা এই অপেক্ষাতেই ছিল। সেকেণ্ডারী পরীক্ষার পর ওর তো আপাতত আর স্কুলের বালাই নেই। মায়েরও সেদিন কি কারণে স্কুল ছুটি। মা দিনে ঘুমোয় না। খাটে ঠেস দিয়ে কি একটা পড়ছিল। মধুমিতা তার সামনেই গায়ের ফ্রকটা একটা ফিতে দিয়ে কোমর জড়িয়ে টাইট করে বেঁধে নিল। তাতেও মায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করতে না পেরে জিগ্যেস করল, তোমার সেই ঝুলঝাড়াটা কোথায়?

মায়ের মুখের কাছ থেকে বই সরল। ফিতে দিয়ে কোমর বাঁধা চোখে পড়ল।--কেন?

—বাবা সকালে রাগারাগি করল শুনলে না?

বিরক্তি।—নিভা করবে'খন।

পাল্টা দাপটের সুরে মেয়ে বলল, না, কাউকে করতে হবে না, আমি করব।

চলে গেল। মাকে জানান দেবার দরকার ছিল কেবল। ঝুলঝাড়া কোথায় আছে ও দেখেই রেখেছে। এক হাতে ওটা আর অন্য হাতে ঝাঁটা নিয়ে বাবার ঘরে ঢুকল। ও দুটোর কাজ সারতে দশ মিনিটও লাগল না। তারপর বাবার পুরনো ছেঁড়া চামড়ার স্যুটকেসটা টেনে এনে মেঝের মধ্যিখানে রাখল। ওটার ভিতর থেকে সিনেমার পুরনো মাসিক সাপ্তাহিকগুলো আর হাতে লেখা স্ক্রিপ্টগুলো নিয়ে মা শুনতে পায় এমন ভাবে চটাস চটাস করে মেঝেতে আছড়াল বারকয়েক। অর্থাৎ মা বুঝুক ধুলো ঝাড়া হচ্ছে। তারপর মিনিট পনেরো চুপ একেবারে। মুখে হাসি ফেটে পড়ছে, দম বন্ধ করে মেঝেতেই বসে আছে।

—মা! ওমা! মা! শিগগীর—।

মা ওঘর থেকে পড়ি কি মরি করে ছুটে এলো।—কি রে? কি হয়েছে?

মধুমিতার চোখে মুখে বিস্ময় আর উত্তেজনা ধরে না। সিনেমা পত্রিকাগুলো থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। বলে উঠল, একি দেখছি!

ব্যক্তিত্ব ছবি, বাবা সুবীর রায় ডাইরেক্টর—নবাগতা এম. এ. পাশ নায়িকা বন্দনা মিত্র—তখন তো তুমি মিত্র ছিলে—দারুণ অভিনয় করেছো—তোমারই ছবি—একটাতে নয়, অনেকগুলোতে—এ-সব কি ব্যাপার? অ্যাঁ—?

সেই মুহূর্ত থেকে মধুমিতার একেবারে বদ্ধ বিশ্বাস—অভিনয়ে নামলে একদিন ও দারুণ অভিনয়ই করবে।

ওদিকে মা দরজার কাছে কাঠ প্রথম। বাবার এ-ঘরে ঢোকেই না বড়। সেদিন পায়ে পায়ে ভিতরে এসে দাঁড়াল। প্রথম বিমূঢ় ভাব কাটিতে স্থির চোখে জার্নালের পাঁজাগুলো দেখল।—এগুলো কোথায় ছিল?

—এই তো, বাবার ছেঁড়া সুটকেসে, ধুলো জমে একাকার হয়ে আছে দেখে ঝেড়েঝুড়ে রাখছিলাম। কিন্তু কি ব্যাপার মা—তুমি কি সিনেমায় অভিনয় করতে নাকি?

জবাবে মায়ের গলার স্বর কঠিন হল, হুকুম করল, ওগুলো তুলে রেখে দে।

—বা রে। তোমার ছবি তোমার নাম দেখছি কেন? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বাবাকে জিগ্যেস করব।

মা ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। মধুমিতা ঠিক লক্ষ্য করেছিল। অত ফর্সা মুখে প্রথমে কাগজের মত সাদা হয়ে গেছল। তারপর যেন আলগা রক্ত উঠে এসেছে। মধুমিতার দম ফেটে হাসি আসছিল। নিঃশব্দে সুটকেসটা জায়গায় তুলে রেখে ঘর থেকে বেরুল। কোমরের ফিতেটা খুলে ফেলল। তারপর বাথরুমে ঢুকে সাবান দিয়ে হাত মুখ ধোবার আগে একপ্রস্থ হাসি—শব্দ না করে বেদম হাসি।

বিকেল পর্যন্ত মায়ের থমথমে মুখ দেখেছে। তবু ঘরে ঢুকেছে, সকৌতুকে বারবার মায়ের দিকে তাকিয়েছে। কারণ, এটাই মা

স্বাভাবিক ভাববে। মা সিনেমার হিরোইন ছিল একদিন—এতকাল বাদে মেয়ে সেটা জানার পর কৌতূহল হবে না তো কি?

মজার উত্তেজনা সামলে ওঠার পর মাথায় আবার অন্য দুশ্চিন্তা মধুমিতার। ও এত বড় একটা কাণ্ড করে বসে আছে বাবা কিছুই জানে না।

বাবা বাড়ি ফিরলে মা আচমকা কিছু জিগ্যেস করলে বাবা যদি উল্টা পাল্টা কিছু বলে বসে তাহলেই চিত্তির।

বিকেলে মাকে প্লাস্টিকের ব্যাগটা নিয়ে বেরুতে দেখল, নিভা মাসি চা এনে দিতে মা তাই শুধু খেয়েছিল, জলখাবার ছোঁয়নি। মায়ের মুখ দেখে নিভা মাসি ভিতরে ভিতরে শংকিত। কিন্তু মধুমিতার তাকে কিছু আশ্বাস দেবার ফুরসৎ নেই। মা শপিংএ বেরুতেই ও ছুটে আবার মায়ের ঘরে। হাতে লেখা ফোন নম্বরের ডায়রি খুলে পাতা ওলটাতে লাগল। মা ভাইস প্রিন্সিপাল আর ম্যানেজিং কমিটির মেম্বর হতে প্রদোষ খাসনবিশ এই বিনে পয়সার ফোনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। বাবা স্টুডিও অফিসের একটা ফোন নম্বর দিয়ে রেখেছিল—হঠাৎ খুব দরকার হলে যেখানে তাকে পাওয়ার সম্ভাবনা।

নম্বর পেল। রিসিভার তুলে ডায়েল করল। বাবার নাম করে খোঁজ করতে পেয়েও গেল। দিনটা আজ সব দিক থেকেই ভাল দেখা যাচ্ছে।

—কে—বাবা? আমি মিতা, যা বলি চুপচাপ শুনে নাও আগে!

মাকে আজ কি দারুণ জব্দ করা গেছে গড়গড় করে বলে গেল। না—সন্দেহ হবে কি করে—মা তো জানে সকালে ঘরের জঞ্জালের কথা বলে তুমি ও-ভাবে রাগ করতে আমি তোমার ঘর সাফ করতে গেছলাম—তারপর স্যুটকেস উল্টে ধুলো ঝাড়তে গিয়ে আমার কাছে সব ফাঁস—মায়ের সে-মুখ যদি দেখতে বাবা, হেসে হেসে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। না না—মা কিচ্ছু সন্দেহ করেনি—আমি কাঁচা অভিনয় করিনি, বুঝলে? যাক, শোনো—মা বেমক্কা তোমাকে

যা-ই বলুক, যা-ই জিগ্যেস করুক তুমি শুধু অবাক হয়ে আকাশ থেকে পড়বে—যেন কিছুই বুঝতে পারছ না—ঠিক আছে ?

ও-ধার থেকে বাবার চাপা হাসি শোনা গেল। আশ্বাসও পেল, ঠিক আছে। ফোন রেখেই দেখল নিভা মাসি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। ছুটে এসে দু'হাতে জাপটে ধরল তাকে। তারপর তাকে সুদ্ধু মাটিতে গড়াগড়ি।—আজ সব ফাঁস, বুঝলে ? মায়ের ব্যক্তিত্বের সব ফাঁস।

সেই দুপুর থেকে নিভা মাসি মায়ের মেজাজের যেমন কুল-কিনারা পায়নি, তার মেয়ের এই উৎকট আনন্দেরও না। তার মাথায় কিছুই ঢোকেনি। ফাঁসের ব্যাপারখানা তাকেও বলল এরপরে। কেবল আগে থাকতে জেনে প্ল্যান করে সে যে সব করেছে তা বলল না। বিশ্বাস নেই, মায়ের যা বশম্বদ নিভা মাসি, কোন সময় বলে দিলেই হয়ে গেল। বাবার স্যুটকেস পরিষ্কার করতে গিয়ে ধরা পড়েছে নিভা মাসির কেবল এটুকু জানাই ভাল।

এত দিন বাদে নিভা মাসিও একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। মেয়ে ঢের আগেই তার কাছ থেকে সব জেনেছে এটা আর কোন কারণেই ফাঁস হবার ভয় নেই।

বাবা ফিরল রাত আটটার একটু আগে। মায়ের মূর্তি আগের মতই থমথমে সারাক্ষণ। দুপুরের সেই বই নিয়েই বসে ছিল। পড়ছিল না এক অক্ষরও—মধুমিতা হলপ করে বলতে পারে।

ও-ঘর থেকে বাবার গলা শোনা গেল।—মিতা ! এক গেলাস খাবার জল দিয়ে যা তো—

জল আনার আগেই মা উঠে আস্তে আস্তে দরজার দিকে পা বাড়ালো। পাশের ঘরে অর্থাৎ বাবার ঘরের দোরগোড়ায় আসার আগেই মধুমিতা জল নিয়ে হাজির।

জল খেতে খেতে বাবা পাকা অভিনেতার মতই ফ্যালফেলে চোখে মায়ের দিকে চেয়ে রইল। মধুমিতা বাবার হাত থেকে গেলাসটা ফেরত নিতে মা বরফ-ঠাণ্ডা দু'চোখে বাবার মুখখানা বেশ আটকে নিল আগে।

তারপর তেমনি ঠাণ্ডা প্রশ্ন।—ষোল বছর আগের সেই সব সিনেমা ম্যাগাজিনগুলো স্যুটকেসে জমিয়ে রেখেছ কেন? মেয়ে বড় হলে তাকে সব দেখাবে বলে?

ভাগ্যিস মধুমিতা বাবাকে ফোনটা করে রেখেছিল! নইলে আচমকা মায়ের গলার এই স্বর শুনে আর এই চাউনি দেখে বাবা ধড়ফড় করে উঠতই।

কিন্তু এখন বাবা হাঁ। মাথায় ঢুকছেই না কিছু।

—বুঝতে পারছ না—কেমন? গলা দিয়ে মায়ের হিসহিস আগুন ঝরল এবার।—তোমাকে আমি বলে রেখেছিলাম কি না যা মুছে গেছে, কেউ যেন আর তা জানতে না পারে—তবু তুমি তোমার অত বড় কীর্তি স্যুটকেসে জমিয়ে রেখেছিলে কেন? কার জন্যে?

বাবা এবার ভয়ে ভয়ে নিজের ছেঁড়া স্যুটকেসের দিকে তাকালো। তারপর সত্ত সত্ত জল খাওয়া সত্ত্বেও ভারী শুকনো গলায় জবাব দিল। ওতে তো আমার পুরনো স্ক্রিপ্টগুলো আছে, ওগুলো তো আর ফেলে দেওয়া যায় না…কেন, কেউ হাত দিয়েছে নাকি?

মধুমিতার ধারণা অভিনয়ে নামলে বাবাও মন্দ করত না।

সে কথার জবাব না দিয়ে মা ঝাঁঝিয়ে উঠল, তোমার সাধের স্ক্রিপ্টের কথা বলা হচ্ছে না—ছবি-টবি সুদ্ধু ওই ছাই-ভস্মগুলো রেখে দিয়েছিলে কেন?

ঠিক সময় বুঝেই মধুমিতা বাধা দিল।—আচ্ছা মা, এবারে আমি তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করছি, ক্লান্ত হয়ে ফিরতে না ফিরতে তুমি এ-ভাবে বাবাকে নিয়ে পড়লে কেন—দোষের মধ্যে আমি জেনে ফেলেছি, এই তো? তাহলে একদিন তুমি যা করেছ সেটা কি খুব ঘেন্নার কাজ?

মা আস্তে আস্তে ওর দিকে ফিরল। ফর্সা মুখে রক্তকণার ছোটাছুটি। গলা না চড়িয়ে জবাব দিল, খুব খুব খুব ঘেন্নার কাজ—সেই কাজের মধ্য দিয়ে আমি যাকে যতটুকু চেনার চিনেছি—বুঝলি?

চলে গেল।

বাবা খুব চাপা গলায় রাগ দেখাল।—হুঁঃ খুব চিনেছে—ছবি ফ্লপ্ না করলে কাউকে চিনতে হত না, আর অত ঘেন্নার কাজও মনে হত না—স্কুল মাস্টারি না করে এখনো তাহলে ওই করত!

এ ব্যাপারের পর থেকে মধুমিতার কথাবার্তা হাব-ভাব চাল-চলন আরো বদলে গেছে। মায়ের অবাধ্য হবার সুযোগ খোঁজে। বাইরে বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে আড্ডা দিয়ে ইচ্ছে করেই সন্ধ্যার পরে বাড়ি ফেরে এক-একদিন। মা বকতে একদিন মুখের ওপরেই বলে বসেছিল, দেখ মা, অত শাসন করতে এসো না—আমি যতটুকু বুঝেছি তুমিও তোমার ইচ্ছেমতই চলতে—নইলে মামাবাড়ির সঙ্গে আজও আমাদের কোন সম্পর্ক নেই কেন? তুই মামার এক মামাও একবারটি ডেকে আমাদের খোঁজ নেয় না কেন?

মা শুনে স্তম্ভিত। মধুমিতা সটান তার ঘরে।

মধুমিতা যত ভাবে, মায়ের দোষত্রুটিগুলো ততো বেশি চোখে পড়ে। যেমন, স্কুল কলেজের নাটক-থিয়েটারে মা এক নম্বর আর সব থেকে সেরা আর্টিস্ট ছিল বাবার মুখেই শুনেছে। কিন্তু ওর স্কুলে নাটক করার বেলায় মায়ের আপত্তি।·বাবার আগের পক্ষের দু'দুটো ছেলে থাকতেও এম. এ. পাশ মা বাবাকেই বিয়ে করল···প্রেম-টেমের ব্যাপার না ঘটলে এমন হতে পারে না—কিন্তু ওর বেলায় মায়ের একেবারে পুলিশের চক্ষু।···তাছাড়া নিজে এখনও প্রদোষ খাসনবিশের সঙ্গে দিব্যি ঘরে বসেই দেড় দু'ঘণ্টা গল্প করে। কেন—না মায়ের আয়-পয়-ভাগ্যি সব তার হাতে। সে-বেলা দোষ নেই—কিন্তু খাসনবিশের মতো এমন জাঁদরেল মানুষ এখানে আসে কোন টানে? আর কোন টিচার বা কমিটির কোন মহিলার বাড়িতে সন্ধ্যার পর আড্ডা দিতে যায় সে? মাকে যদি এ-কথা ও মুখের ওপর জিগ্যেস করে বসে তাহলে মায়ের সুন্দর মুখের ব্যক্তিত্ব থাকবে কোথায়? বেশি

বেশি করলে ঠিক একদিন বলে বসবে।

মধুমিতার আরো রাগ হয় যখন বাবার কথা ভাবে।···ডিরেক্টর হিসেবে বাবা তো বেশ নামই করেছিল, মা-কে ছবি করতে নামিয়েই তো তার ভাগ্যখানা মার খেল। বাবার সঙ্গে এম. এ. পাশ মায়ের যোগাযোগই তো শুনেছে এই ছবি করা নিয়ে। নিভা মাসি এরপর আর গপ্‌প করতে বাকি রেখেছে কি? কিন্তু সে ছবি চলল না বলে সব দোষ গিয়ে পড়ল বাবার ঘাড়ে—নিজের অমন সুন্দর মুখ ছবিতে আসে না সেটা যেন মস্ত গুণ। বাবা ঠিকই বলেছে, ছবি ও-ভাবে মার না খেলে মা কি কখনো চাকরির জন্য ওই স্কুলের গেটমুখো হত? সবই না হয় হল, তাহলে অমন গুরুগম্ভীর দাপট কিসের? উঠতে বসতে বাবার ওপর এত ঝাঁঝই বা কেন?

এদিকে সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় মধুমিতা টায়েটোয়ে সেকেণ্ড ডিভিসনে পাশ করল। ওর নিজেরই মন খারাপ হবার কথা—হয়েও ছিল। কিন্তু মায়ের ঠাণ্ডা চাউনি দেখে উল্টে রাগ হয়েছে। নিভা মাসীকে শুনিয়ে আসলে মাকেই শুনিয়েছে।—উঃ! দশ ক্লাসের পরীক্ষাই যেন জীবনের স···—তাছাড়া কোনো মেয়ে যেন আর থার্ড ডিভিসনে পাশ করেনি—কোনো মেয়ে যেন ফেল করেনি।

নাম করা স্কুল একবারও অস্বীকার করে না, কিন্তু মায়ের স্কুল বলেই এগারো-বারো ক্লাসের অন্য কোন স্কুলে গিয়ে ভর্তি হবার ইচ্ছে ছিল। বাবার সে-রকম রোজগারপাতি থাকলে মধুমিতা ঠিক অন্য কোন স্কুলে ভর্তি হত। বাধ্য হয়ে মায়ের স্কুলেই পড়তে হচ্ছে আবার। স্কুলের মেয়েদের মুখে মায়ের রূপের কথায় না হোক—ব্যক্তিত্বের বা পারসোনালিটির কথা শুনলে এখন কান জ্বলে ওর। মা একটা ঠমক নিয়ে আছে ভাবে। মনে হয়, আসলে ভিতরের দুর্বলতারই উল্টো মুখোস ওটা।

রাগ হলে মধুমিতা এমন অনেক কথা অনেক মন্তব্য বাতাসে ছোঁড়ে এখন, যা কানে গেলে মা দাঁড়িয়ে যায়। কখনও কঠিন চোখে চেয়ে থাকে। আর কখনও বা এগিয়ে আসে।—কি বললি?

মধুমিতার সব সময়েই সাফ জবাব, তোমাকে কিছু বলা হয়নি। উঃ, একেবারে তেড়ে এলেন। বলে বেপরোয়া মুখ করে সোজা নিজের ঘরে বা বাবার ঘরে চলে যায়।

সেদিন কি কথায় মুখের ওপরেই মধুমিতা বলে বসেছিল, তোমার ভবিষ্যত তুমি বেছে নিয়েছিলে, আমার ভবিষ্যতও আমিই বেছে নেব এটা খুব ভাল করে জেনে রেখো। উঠতে বসতে আমার দিকে তোমার অত চোখ রাখতে হবে না।

মোট কথা মায়ের ওই ঠাণ্ডা চাউনিকে আর যে ও একটুও ভয় করে না এটা বেশ ভালো করেই বুঝিয়ে দেয়

তারপর এই দিন। মায়ের আলমারি খুলে মেঝেতে দু'পা ছড়িয়ে বসে শাড়ি বাছাইয়ের দিন।

মেজাজখানা আজ সকাল থেকেই খিঁচড়ে আছে একেবারে। আর সেই থেকে রাগে ফাত ফাত করে জ্বলছেও। মধুমিতার নিজের বয়সের দিন ক্ষণের পর্যন্ত হিসেব আছে এখন। ষোল বছর এক মাস সতেরো দিন আজ। ওর বিবেচনায় এতদিনে অন্তত ষোলটা পোশাকি শাড়ি ওর থাকা উচিত ছিল, আছে মাত্র তিনখানা। তাও গেল জন্মদিনে একখানা দিয়েছিল প্রদোষ খাসনবিশ— আর একখানা বাবার দেওয়া। খাসনবিশের দেওয়া শাড়ি দামী হতে পারে, কিন্তু এমন গাঢ় খয়েরী রং মধুমিতার একটুও পছন্দ নয়। বাবার দেওয়া শাড়িটা সুন্দর, কিন্তু তেমন পোশাকি বলা চলে না। আর বাকি একখানা, যা দু'বছর আগে মা দিয়েছিল সেটাও এখন আর চোখে ধরে না। শাড়ি চাইলেই মায়ের এক কথা, শাড়ি দিয়ে কি করবি, পরিস তো না—

শাড়ি খুব একটা পরতে চায় না সত্যি কথাই, ভাল ভাল ম্যাক্সি আছে, স্কার্ট ব্লাউস আছে—বেশির ভাগই তাই পরে। ওগুলোই বেশি পছন্দ। কিন্তু তা বলে ওর ভাল কিছু শাড়ি থাকবে না কেন? আজ কি হবে? আজ সোনালির মেজদার বিয়েতে ও কি পরে যাবে?

মাকে যতবার বলেছে, মায়ের এক জবাব, তোর টা না পছন্দ হয়, আমার থেকে একটা বেছে নিয়ে পর—

বিয়ে খাওয়ার নেমন্তন্নে তাই অবশ্য করে থাকে। মায়ের শাড়িগুলো থেকেই একটা বেছে নেয়। কিন্তু সোনালিরা দারুণ বড়লোক, সে-রকম সাজসজ্জা করেই মধুমিতা বিয়েবাড়িতে যেতে চায়।··· সোনালির কলেজে পড়া ছোড়দার এখন থেকেই তার দিকে চোখ সে-কি আর জানতে বাকি আছে? সোনালি নিজেই এ নিয়ে হি-হি করে হেসেছে আর বলেছে, ছোড়দার চোখে তুই যেন গরম চিকেন তন্দুরি একখানা! গরম চিকেন তন্দুরির স্বাদ মধুমিতা সোনালিদের বাড়িতেই জেনেছে। কিন্তু এখন মায়ের শাড়ির একটাও পছন্দ হচ্ছে না, তার কারণ রাগ। সকালে বহুবার বায়না করতে মা শেষে শাড়ির জন্য দু'শো টাকা বার করে দিয়েছিল। কিন্তু শাড়ি কি ও কেনে যে এখনকার দাম জানবে? বড় দোকানে অনেক বাছাইয়ের পর যে শাড়িটা বেশ পছন্দ হল তার দাম চারশো বিয়াল্লিশ। ফিরে এসে একশো টাকার নোট দু'টো মায়ের খাটে আছড়ে ফেলে গনগন করে বলে উঠল, দু'শো টাকায় শাড়ি হয় না আজকাল, তুমি জানো না?

—হবে না কেন, শাড়ি ক'দিন পরিস?

ফের এই এক কথা শুনে মধুমিতার অগ্নিমূর্তি। প্রায় ভেঙচি কেটে বলে উঠেছে, তার জন্যে একটা যা-তা পরে আমাকে বিয়েবাড়িতে যেতে হবে? যে শাড়ি পছন্দ হয়েছে তার দাম চারশো বিয়াল্লিশ টাকা—বুঝলে?

মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে মা নোট দুটো তুলে নিয়ে বলল, কিনতে হবে না—আমার শাড়ি পরে যা।

সেই থেকেই রাগে জ্বলছে মধুমিতা। পারলে মা-কে একেবারে ভস্ম করে ফেলে। তারপর বিকেল না হতে আলমারির সামনে দু'পা ছড়িয়ে বসে তার ক্রুদ্ধ হাতের শাড়ি বাছাই চলছে। কোনটাই পছন্দ হচ্ছে না, তাই রাগের মাত্রাও চড়ছে। মোটামুটি ভাল শাড়িগুলো একটার পর একটা ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। ও-ভাবে বসার দরুন

ফ্রকের ডানদিকের অনেকটাই ওপরে উঠে গেছে, বলতে গেলে এক-দিকের উরুর ওপরে। ওটা টেনে নামাতে গিয়ে মধুমিতা রাগ করেই নামালো না।···নিজের রূপের দেমাক খুব, ওরও দেখুক—ক্যাটকেটে ফর্সা হলেই রূপসী হয় না—শ্রী আর সৌষ্ঠব মিলিয়ে যে রূপ তা যে মায়ের থেকে ওর এখন বেশি এ যার চোখ আছে সে-ই বলবে।

এবারের হাতের শাড়িটার অনেকটা ভাঁজ খোলা হয়েছে, চলতে পারে কিনা···মনে হচ্ছে পারে—কিন্তু এক জায়গায় ছোট্ট কিসের দাগ—খোলা অবস্থাতেই শাড়িটা মাটির ওপর আছড়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে গলায় স্বগত ঝাঁঝ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই থেকে ব্যক্তিত্ব দেখানো হচ্ছে, ব্যক্তিত্বের দৌড় কত আমার বড় জানতে বাকি আছে যেন—

কথার সঙ্গে সঙ্গে তলার একটা সিল্কের দামী শাড়ি অসহিষ্ণু হাতে এমন ভাবে টানল যে অন্য দিকটা গিয়ে লাগল আলমারির এক পাটের নিচের টিনে—সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়েই গেল প্রায় এক ইঞ্চির মতো।

সেই মুহূর্তে কি কাণ্ড ঘটে যেতে পারে বা ঠাণ্ডা মূর্তি মায়ের মেজাজ কি হয়ে উঠতে পারে মধুমিতার কল্পনার বাইরে।

কনুয়ের কাছটা মুচড়ে ধরে আচমকা একটানে বন্দনা রায় ওকে বসা থেকে একেবারে দাঁড় করিয়ে দিল। ও-ভাবে ধরে টানার দরুন যন্ত্রণায় কিছুটা নিজেই উঠে পড়েছে। দাঁড়াতে না দাঁড়াতে গালের খানিকটা মুখের খানিকটা আর নাকের পাশটা বেড়িয়ে এমন এক চড় পড়ল যে চোখে অন্ধকার দেখে মধুমিতা আবার মাটিতেই পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পড়ল না, চুলের মুঠি ধরে তার আগেই বন্দনা টেনে ওকে কাছে নিয়ে এলো—এবারে বাঁ হাতে আবার তেমনি চড়—একটা নয়—পর পর তিন চারটে। গালে মাথায় মুখে।

—তোর অনেক দিনের পাওনা আজ একসঙ্গে মিটিয়ে দিচ্ছি।

শক্ত এক হাতে চুলের মুঠি ধরাই ছিল ঠেলে টেনে এনে মাথার এক দিক জোরে দেয়ালের সঙ্গে ঠুকে দিল। এ-ও এত জোরে যে মধুমিতা চোখে লাল নীল হলদে দেখছে। এই করতে গিয়ে মায়ের চুলের মুঠি ধরা হাত ঢিলে হয়েছিল। অস্ফুট আর্তনাদ করে মধুমিতা

সেই ফাঁকে নিজেকে উদ্ধার করেই দিশেহারার মতো দরজার দিকে ছুটল। বাইরে পা দিয়ে একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসে তাকালো। মাকে নয়, মায়ের মধ্যে যেন ঠাণ্ডা মাথার এক ঘাতক দেখল। তারপর ছুটে পালালো।

বন্দনার মুখে শুধু লাল, চাউনি স্থির কঠিন। খাটে এসে বসল। অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে।

তিন চার—মিনিট। সুবীর রায় মেয়ের হাত ধরে টানতে টানতে ধরে নিয়ে এলো. রাগে থর থর করে কাঁপছে। চিৎকার করে বলল, এত বড় মেয়ের গায়ে শুধু হাত তোলা নয়—ওকে তুমি এ-ভাবে মারলে? মাথা যদি ফেটে গিয়ে থাকে তাহলে আমি—কোন্ সাহসে তুমি—

গর্জনের মাঝখানেই কেউ যেন গলা টিপে ধরল! না, কেউ না, স্ত্রীর ওই দুটো চোখই। বন্দনা উঠে দাঁড়িয়েছে। ঘরের এ-কোণ ও-কোণ দেখছে। দেখল। সেদিকে এগুলো। বাইরে কোথা থেকে বহুকাল আগে সুবীর রায় এই শৌখিন লাঠিটা কিনে এনেছিল। এখন আর ওটা শৌখিন নেই। মাথার দিকটা চামড়ায় মোড়া বেতের লাঠি। ঘরের কোণে পড়ে থাকে—পাখা বন্ধ হলে বন্দনা ওটা দিয়ে ব্লেড ঠেলে দেখে চলে কিনা, কখনো বা তোষক পিটে ধুলো ছাড়ায়, নয়তো বেড়াল তাড়ায়। চোখের পলকে কোণ থেকে লাঠিটা তুলে নিয়ে বাপের হাতে ধরা মেয়ের দিকে এগুলো।

বাবার হাত ছাড়িয়ে মধুমিতা সন্ত্রাসে আবার ছুটে পালাল।

শুধু ও নয়, ভ্যাবাচাকা খাওয়া বাপেরও মানে মানে চোখের আড়াল হওয়ার তাগিদ।

## ॥ দুই ॥

আগুনে কারো মুখ পুড়লে ক্ষত কোন একদিন সেরে যায়। কিন্তু দাগ ওঠে না। সেই দাগই দগদগে ক্ষতটাকে কোন দিন ভুলতে দেয় না।

বন্দনা— বন্দনা মিত্র প্রায় ষোল বছর আগে এমনি এক ভুলের আগুনে নিজের সর্বস্ব পুড়িয়ে ছিল। সেই ক্ষত হয়তো এতদিনে শুকিয়েছে, কিন্তু বুকের তলার সেই যন্ত্রণার দাগ এ-জীবনে বোধ হয় আর ঘোচবার নয়। সব থেকে আশ্চর্য, যাকে নিয়ে এত বড় ভুল আজও তাকে বন্দনা—বন্দনা মিত্র জীবন থেকে একেবারে নির্মূল করে ছেঁটে দিতে পারেনি। পারে না। পারে না যে, তা কেবল সে নিজেই জানে। পারত, যদি অমন পিচ্ছিল পথে এগনোর পরেও ওই লোক আবার নিশ্চয়তার আলো বাতাসের মুখ দেখত, যদি তার ভাগ্যের দরজা আবার কোনভাবে খুলে যেত। বন্দনা তাহলে অনায়াসে তাকে জীবন থেকে ছেঁটে দিয়ে দূরে সরে যেতে পারত। একেবারে চলে যেতে পারত।...তবু, শুধুই কি তাই? শুধুই এ-জন্যে পারেনি বা পারল না? নিজের অন্তস্তলের বদ্ধ মহলে চোখ চালাতে নিজেরই ভয় করে বন্দনার। সেখানে কি এত সবের পরেও কোনো আশার পিদিম টিপ-টিপ জ্বলছে না?···ডিভোর্সি মহিলা তো বেশ ক'জন দেখল···তাদের ছেলেমেয়েদের মানসিক আর সামাজিক সংকট দেখে আর তার থেকে আরো বেশি কল্পনা করে নিজের মেয়ের কথা ভেবে বন্দনার ভেতরটা কি শিউরে ওঠে না? তার স্কুলেই এমন মা-ছাড়া বা বাপ-ছাড়া চার পাঁচটা মেয়ে আছে। ওদের মুখের দিকে তাকালে বন্দনার বুকের কাছটা টনটন করে। মনে হয় এত বড় পৃথিবীতে ওদের পায়ের নীচে মাটি নেই। যন্ত্রের মতো স্কুলে আসে, হাসে, চলা-ফেরা করে।···উঁচু ক্লাসের ও রকম একটা মেয়ে তো এখন মানসিক হাসপাতালে।

বন্দনা সম্পর্ক ঘোচানোর চিন্তা মনে ঠাঁই দিতে পারে না তার আরো কারণ আছে।...উনিশ বছরের একটা তরতাজা ছেলে বলে গেছল, ছোটমা, তোমাকে আমি কোন দিন ভুলব না, একদিন না একদিন ঠিক তোমার কাছে ফিরব জেনো...সেই গলার স্বর হঠাৎ-হঠাৎ কানে বাজতে বন্দনা রায় কি ঘুমের মধ্যে আজও ধড়ফড় করে উঠে বসে না? হাড়-পাঁজর দুমড়ানো রটনা সত্ত্বেও সেই ছেলে আছে কি নেই সে সংশয় কি একেবারে ঘুচে গেছে? আর ওই ক্ষতর দাগটা বুকের তলায় সর্বদা খচখচ করে কেবল এখানকার যে একটি মানুষের জন্য, অগোচরের মন থেকে তার আশাও কি একেবারে বিসর্জন দিতে পেরেছে বন্দনা রায়?...অনিশ্চয়তার গ্রাস থেকে বাঁচার তাড়নায় ওই লোকের যে মূর্তি উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েছিল তা যেমন সত্যি, তেমনি বীভৎস। কিন্তু দুর্বলতার ফাঁকে ফাঁকেও যে দুই একটা স্মৃতির ছোঁয়া এখনো একেবারে মুছে যাচ্ছে না তা কি একেবারে মিথ্যে?

যাক, জীবনের এই বাস্তবে দাঁড়িয়ে বন্দনা রায়ের নিজেরই অন্তস্তলে উঁকি দিতে ভয় করে। আশা করতে ভয় করে।

...বাবা মায়ের আদরের মেয়ে ছিল। দুই দাদারও আদরেরই বোন ছিল। বি এ. পড়তে এম. এ. পড়তে কলেজের বা য়ুনিভার্সিটির যে-কোন ফাংশানের সে সম্রাজ্ঞী ছিল। স্কুলে কলেজে থিয়েটার করতই। এম. এ পড়ার সময় পাড়ার এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শরৎবাবুর 'ষোড়শী' নাটকে পুরুষ জীবানন্দর মুখোমুখি অলকার ভূমিকায় নেমে স্টেজ মাত করেছে। একটা সোনার আর দুটো রূপোর মেডেল পেয়েছিল ওই অভিনয় করে। তারপর থেকেই গ্রুপ থিয়েটারগুলো থেকে টানাটানি তাকে নিয়ে। জীবনের এক নতুন স্বাদ অনুভব করেছে বন্দনা তখন। এম. এ. পাশ করার ফাঁকে ফাঁকে বেশ কয়েকটা অভিনয় করেছে, কদরও বেড়েই চলেছে।

বাবা-মা এর আগেই নিজেদের সময়ে আর ওর অসময়ে চোখ বুজেছে। দুই দাদারই ওকে এই অবাধ স্বাধীনতা দিতে বিশেষ আপত্তি ছিল। বিশেষ করে দাদার আর সমবয়সী বউদির। গ্রুপ

থিয়েটারে ওর যত কদর হচ্ছে, তাদের বাধা ততো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বউদি ওকে হিংসে করত আর দাদার কানে বিষ ঢেলে দিত এ অজানা ছিল না। কিন্তু বন্দনা মিত্র তখন মনে প্রাণে স্বাধীন—কারো মতামত বা বিবেচনার ধার ধারত না।

…সে সময়ে ওর সরব আর নীরব স্তাবকের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিলনা। য়ুনিভার্সিটির সহপাঠী থেকে তরুণ প্রফেসার—চেনা-জানার মধ্যে ছোট থেকে বড় চাকুরে—এঞ্জিনিয়ার থেকে ডাক্তার—একবার মাথা হেলালে যে-কোন একজনের হৃদয় সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী হয়ে বসতে পারত। কিন্তু মাথা হেলানোর ব্যাপারে বন্দনা মিত্র অতিমাত্রায় সচেতন ছিল।

প্রদোষ খাসনবিশ দাদার সহপাঠী না হলেও এক কলেজের ছাত্র ছিল। তাছাড়া অবস্থার এত ফারাক যে তুজনের মধ্যে বন্ধুত্বের পাকা সড়ক গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল কিনা বন্দনা মিত্রর সন্দেহ, যদি না ওই লোকের আর কোনো আকর্ষণ থাকত। বি. এ. পাশ করে বন্দনা সবে যখন য়ুনিভার্সিটিতে ঢুকেছে, কোন্ বন্ধুর বাড়ি থেকে নেমন্তন্ন সেরে ফেরার পথে প্রদোষ খাসনবিশ দাদাকে লিফট্ দিতে এসেছিল। একই পথ দিয়ে বন্দনাও হেঁটে কোথা থেকে বাড়ি ফিরছিল। যোগাযোগ কপালে লেখা না থাকলে এরকম হবে কেন। ওকে দেখে দাদা বন্ধুকে বলে গাড়িটা থামিয়ে ওকেও তুলে নিয়েছিল। বড়লোক বন্ধু দাদাকে আর বন্দনাকে বাড়ির দোরে নামিয়ে দিয়ে তক্ষুণি চলে যায় নি। দাদার আমন্ত্রণে গাড়ি থেকে নেমে এসে বসার ঘরে বসে কম করে আধ ঘণ্টা গল্পো করেছিল। নেমতন্ন খেয়ে আসার পরেও তার কফির তেষ্টা পেয়েছিল। আর বন্দনা নিজে হাতে সেই কফি করে আনার ফলে দারুণ ভাল সার্টিফিকেট পেয়েছিল। প্রশংসা শুনে মনে হয়েছিল অত ভালো কফি ভদ্রলোক সেই প্রথম খেল।

…বাড়িতে তার আনাগোনাও তখন থেকেই শুরু হয়েছিল। দাদার তখন সবে বিয়ে হয়েছে। তুই দাদার আর বউদির এতটুকু বুঝতে অসুবিধে হয়নি অত বড়লোকের ছেলের হঠাৎ এত বন্ধুপ্রীতি

কেন। সেদিনের বন্দনা মিত্র এই বড় লোকের ছেলেকে বিশেষ পাত্তা কখনো দেয়নি। তবু বউদি তো খাসনবিশকে নিয়ে ঠাট্টাই শুরু করে দিয়ে ছিল। ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তাদের সকলেরই লোভনীয় মনে হয়েছিল। প্রদোষ খাসনবিশ তখন তার বাবার সঙ্গে এক্সপোর্ট ইমপোর্ট বিজনেসে জাঁকিয়ে বসেছে। হাতে কাঁচা পয়সার ছড়াছড়ি। ছুটির দিনের সকালে এক একদিন সে গাড়ি বোঝাই মাছ মাংস নিয়ে হাজির। বউদিকে বলত, ম্যাডাম, সকালে উঠেই মুখ বদলানোর বাসনা হল, তোমার হাতের কেরামতি দেখা যাক।

প্রথম বারেই বউদি তার মুখের ওপর বলে বসেছিল, আমার হাতের কেরামতি কি অত মিষ্টি লাগবে চান তো আর কাউকে হাত লাগাতে বলি।

এদিকের ঘরে দাঁড়িয়ে বন্দনা শুনছিল। আর কেউ বলতে রান্নায় কে হাত লাগাতে পারে বউদি তার নাম করেনি। তবু প্রদোষ খাসনবিশের গলায় পাল্টা বিস্ময়, বন্দনা রাঁধতেও জানে নাকি?

—শুধু জানে! রান্নায় দ্রৌপদী বলতে পারেন।

রাগ দূরের কথা, বন্দনা মজাই পেত। দাদার কথাতেই খাসনবিশ ওকে নাম ধরে আর তুমি করে কথা বলা শুরু করেছিল। তবে লোকটা ভদ্র, আর মার্জিত রুচির, স্বীকার করতেই হবে। এতটুকু বেচাল কখনো দেখেনি। দাদার ওই কথায়ও উৎসুক চোখে ওর দিকে ফিরে জিগ্যেস করেছিল, আপত্তি হবে না তো?

বন্দনা হেসেই জবাব দিয়েছিল, আপত্তি হবে কেন—নাম তো ডাকার জন্যেই

গ্রুপ থিয়েটারে নাটক করা দাদারা বা বউদি কেউই পছন্দ করত না। বউদির ঠেস শুনে বিরক্ত হয়ে দাদা তো প্রায়ই বলত, পড়াশুনা করছিস ভাল কথা—কিন্তু অন্য দিকে তোর ঝোঁক এত বাড়ছে কেন—সখে কখনো-সখনো এক-আধটা করলি তো করলি—তা না, কেউ এসে ধরলেই তাদের পিছনে ছুটতে হবে!

কিন্তু প্রদোষ খাসনবিশ ওর অভিনয়ের ভক্ত হয়ে পড়ার পর থেকে

দাদা তো নয়ই, বউদিও আর কিছু বলত না। ভদ্রলোক সর্বদা উৎসুক, কবে ও কোন্ নাটক করছে বা করবে। নিজের, দুই দাদার আর বউদির জন্য সব থেকে দামী সীট ক'টা আগে থাকতে বুক করে রাখত। নাটক দেখা হলে এই বাড়িতেই জমজমাট আলোচনার আসর বসত, বাধ্য হয়ে দাদা বউদিকে যোগ দিতে হত।

বন্দনা এম. এ. পাশ করে বেরুতে দাদা জিগ্যেস করেছিল, এবারে ওর বিয়ের চেষ্টা করা যেতে পারে কিনা। হেসে বন্দনা ফিরে জিগ্যেস করেছিল, যেখানে চেষ্টা করবে সেখানে তারা বউয়ের নাটক করা বরদাস্ত করবে?

দাদার বদলে মুচকি হেসে জবাবটা বউদি দিয়েছিল। বলেছিল, তা-ও করবে হয় তো—।

শোনা মাত্র দাদা বউদির ওপর রেগে গেল।—না জেনে আগ বাড়িয়ে কথা বলো কেন, প্রদোষের বাবা কি রকম কনজারভেটিভ মানুষ খবর রাখ? ছেলের মুখ চেয়ে তারা বিয়েতে রাজি হলেই বেশি, তাছাড়া এ কি ছেলেখেলা না কি যে বিয়ের পরেও নাটক করে বেড়াতে হবে?

বি. কম. পাশ করা নাদুসনুদুস চেহারার একজন বিজনেসম্যানকে বিয়ে করবে এমন চিন্তা বন্দনার মনের কোণেও কখনো ঠাঁই পায়নি। টাকার অত জোর জৌলুস না থাকলে দাদারাও তাকে পাত্তা দিত কিনা সন্দেহ। প্রদোষ খাসনবিশের একটাই বড় গুণ চালিয়াতি নেই, টাকার বাতাসে ভেসে বেড়ায় না। অত যে বড়লোক চালচলনে তা বোঝাতে যায় না সত্যি কথা। তাছাড়া ভদ্র আর সভ্যভব্যও যে বন্দনা তা-ও অস্বীকার করে না। সেই কারণেই দাদা বউদির ওপর অনেক সময় রাগই হয়। একটা ভালো মানুষকে প্রশ্রয় দিয়ে মাঝখান থেকে তার দুঃখ পাওয়ার রাস্তা তৈরি করছে।

না, এজন্যে প্রদোষ খাসনবিশের কিছু দোষ দেখে না বন্দনা। পুরুষের কম বেশি দুর্বলতার আঁচ সে কি আজ থেকে পাচ্ছে? এ পর্যন্ত অনেকেই কাছে আসতে চেয়েছে, অন্তরঙ্গ হতে চেয়েছে। সেটা

কিছু মাত্র অস্বাভাবিক ভাবে না। না চাইলে বরং নিজের সম্পর্কে ধারণা ছোট হয়ে যেত বন্দনাব। কিন্তু সেই চাওয়াকে প্রশ্রয় দেওয়া না দেওয়া ভিন্ন কথা। বন্দনা কাউকেও সে রকম প্রশ্রয় দেয়নি—ফুরিয়ে গেছে। বিরক্ত হয়নি বলে কাউকে কখনো আঘাত দেওয়ারও দরকার হয়নি। শুধু বুঝে গেছে ঐ রমণী হৃদয়ে তার ঠাঁই হল না। প্রদোষ খাসনবিশের কাছে আসা বা অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা সহজ হয়েছে প্রথমে দাদার জন্য, তারপর দাদা বউদি দুজনেরই জন্যেই। দুজনেই তার টাকার গুণে মুগ্ধ। আব দাদা এত মুগ্ধ যে ওই কনজারভেটিভ বাপ ছেলেব এ বিয়েতে রাজি হলেই বেশি ভাবে।

দাদাব এই কথায় বন্দনাব স্নায়ু বিলক্ষণ তেতে উঠেছিল। কিন্তু রাগ প্রকাশ কবার ব্যাপারেও বন্দনার শালীনতা বোধটুকু প্রখর। রাগের মুখে দরকার হলে হাসতেও পারে। গলার স্বরের ওপরেও দখল রাখতে পাবে। দাদার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখে বরং একটু কৌতুকের ছোঁয়া লেগেছিল। বলার সুরেও।—আচ্ছা দাদা, তোমরা আমার খুব ভাল চাও না হয় বুঝলাম, কিন্তু ওই বন্ধুটির ওপব তোমাদের এতটুকু মায়া নেই কেন?

দাদা বউদি দুজনেরই দুর্বোধ্য লাগল। দু'জন দুজনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। তারপর দাদা বলল, তার মানে?

—তার মানে ওই ভালো মানুষ ভদ্রলোকের মনে যদি আর বেশি দাগা দিতে না চাও তো তাকে নিয়ে আর বেশি বাড়াবাড়ি না করে তাব কেটে পড়াব সুযোগ কবে দাও।

এবারেও না বোঝাব মত নির্বোধ নয় দুজনের কেউ। আরো রেগে গিয়ে দাদা বলে উঠল, তাহলে কি করবি—তোর মতলবখানা কি?

জানি না। হেসেই মাথা নেড়েছে, বলেছে যা-ই করি না কেন, প্রদোষ খাসনবিশ নয়।

দাদা রাগ করে চলে গেছে। বউদিরও নিঃশব্দ অনুগমন।

দু'দিন বাদেই বোঝা গেল দাদা বউদি আশা একেবারে ছাড়েনি,

অর্থাৎ এই ভদ্রলোককে তারা একেবারে হতাশ হবার মতো কোন আভাস দেয়নি। শনিবারের বিকেল সেটা দাদা খুব সহজ মুখ করে জিগ্যেস করল, ভাল কথা, তুই সন্ধ্যেয় বাড়ি আছিস তো ?

—কেন ?

—তোকে বলতে ভুলে গেছি, প্রদোষ ওদের ব্যবসার কাজে বম্বে গেছল, আজ সকালের ফ্লাইটে ফিরেই ফোন করেছিল, তোর পাশের খবর শুনে খুব খুশি—সন্ধ্যায় তোকে কংগ্র্যাচুলেট করতে আসছে বলল, তুইও কাছে ছিলি না, অফিসের তাড়ায় আমারও মনে ছিল না। মুখে একটু বিব্রত হাসি টানার চেষ্টা দাদার।—আমি ওদিকে আগে থাকতে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে বসে আছি তা-ও ওকে বলা হয়নি, অবশ্য যত তাড়াতাড়ি পারি চলে আসব—

দাদার মুখের দিকে চেয়ে বন্দনার হাসিই পেয়ে গেছল। সত্যিই হেসে ফেলেনি রক্ষে। দুর্বলতা ধরা পড়লে দাদার মেজাজ চড়ে। খুব সাদা মুখ করেই বন্দনা বলেছে, থাকব 'খন···বউদির অ্যাপয়েন্ট-মেন্ট আছে নাকি ?

—না, তোর বউদি থাকছে।

বন্দনার এতটুকু সন্দেহ নেই প্রদোষ খাসনবিশ সন্ধ্যায় আসছে বলেই দাদার এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট। আর মগজে যদি এতটুকু বুদ্ধি থেকে থাকে তো হলপ করে বলতে পারে, ওই লোক আসা মাত্র, বউদি ছুট করে আজ তার অভ্যর্থনায় দোতলা থেকে একতলায় ছুটে আসবে না—যতটা সম্ভব আর যতক্ষণ সম্ভব সরে থাকতেই চেষ্টা করবে। এমনও হতে পারে ফোনে প্রদোষ খাসনবিশকে দাদা বলেই দিয়েছে, বোনের মতি-গতি বোঝা যাচ্ছে না, যদি পারে তো সে নিজে বুঝে নিক। মোট কথা, পরীক্ষায় পাশের জন্য আজ নিছক কংগ্র্যাচুলেট করার জন্যেই সন্ধ্যেয় প্রদোষ খাসনবিশ আসছে না। এই আসার আরো কিছু তাৎপর্য আছে বন্দনার তাতে সন্দেহ নেই।

বউদি ঠিক সন্ধ্যা পার করে দিয়ে বাথরুমে ঢুকল গা-ধুতে। এরপর বেরুতে এক ঘন্টার ধাক্কা। দু'বেলায় ঘন্টাখানেক ধরে তার স্নান

বিলাস চলে। কারো আসার কথা তার জানাই নেই মনে হল।

আরো মিনিট কুড়ি বাদে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রদোষ খাসনবিশের ঝকঝকে গাড়িটা থামতে দেখল। তাকে নামতে দেখল। বন্দনা একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, ঢাউস ফুলের তোড়াটোড়া কিছু হাতে থাকা বিচিত্র ছিল না। থাকলে আরো বিরক্তির কারণ হত। কিছু কাণ্ডজ্ঞান আছে বলতে হবে।

বন্দনা নেমে এলো। দরজার কাছে আসতে খুব মৃদু একটু আমেজের শিস কানে এলো। ঘরে পা দিয়ে বন্দনা হাসি মুখে বলল, বেশ মেজাজে আছেন দেখছি, বম্বে থেকে ভাল বিজনেস করে এলেন বুঝি ?

প্রদোষ খাসনবিশ খুশি মুখে তার দিকে ফিরল। এসে প্রথমেই ওকে দেখবে ভাবেনি। দাদা বা বউদি কেউ ডেকে পাঠালে তবে আসে। এই ব্যতিক্রমটুকু আরো খুশির কারণ মনে হল বন্দনার।

হাসি মুখে অতবড় করে জবাব দিল, বিজনেস অর নো বিজনেস —আমি এই মেজাজেই থাকতে চেষ্টা করি।...কংগ্রাচুলেশনস্, সকালে বাড়ি ফিরে তোমার দাদার ফোনে সুখবরটা পেলাম—বোসো।

বন্দনা পাশের সোফায় বসল। প্রায় অবিশ্বাসের সুরে বলল, আপনি বাড়ি ফিরতে না ফিরতে এই খবরটা জানানোর জন্য দাদা আপনাকে ফোন করল ?

—জানানোর মত খবর হলে করবে না কেন।

বন্দনা কেন মজা পাচ্ছে তা এই লোক বুঝবে কি করে !

প্রদোষ খাসনবিশ উৎসুক মুখে সামনে ঝুঁকল।—তাহলে আমরা কবে সেলিব্রেট করছি ?

—সেলিব্রেট তো আমার করার কথা !

—তা কেন, তুমি কষ্ট করে এত ভাল পাশ করলে সেলিব্রেট আমরাই করব—তোমার দাদা কোথায় ?

—দাদার কি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পড়ে গেল ফোনে আপনাকে বলতে ভুলে গেছল...এসে যাবে বলে গেছে।

দাদা নেই বলে একটুও ক্ষুণ্ণ মনে হল না।—আর ম্যাডাম ?

—একটু আগে গা ধুতে ঢুকল দেখলাম, হাসি চেপে বন্দনা উঠে দাঁড়াল, ডেকে আসি, নইলে বেরুতে এক ঘণ্টা।

সঙ্গে সঙ্গে শশব্যস্ত বাধা।—থাক থাক, ওঁকে ব্যস্ত করতে হবে না, বোসো—তাড়া তো নেই কিছু।

বন্দনা বসল না। বলল, তাহলে আপনার জন্য আগে এক পেয়ালা কফি করে নিয়ে আসি—

চটপট বেরিয়ে এলো। হাসিও পাচ্ছে আবার দাদা বউদিকে এক হাত নিতেও ইচ্ছে করছে। চা-কফির পাট ওপরে। দোতলায় এসে কি ভেবে ফ্রিজটা খুলল। যা ভেবেছে তাই, সমাদরের অতিথির আপ্যায়ণের ব্যবস্থা না থেকে পারে না—বড় ডিসে অনেক মিষ্টি সাজানোই আছে।

ট্রে-তে খাবারের ডিস এক গেলাস জল আর দু'পেয়ালা কফি সাজিয়ে নিভাকে দিয়ে আসতে বলল। নিভা মায়ের আমল থেকেই এ বাড়ির আশ্রিত আর এই দিদিটির সব থেকে অনুগত। বউদি ত্রুটি পেলেই কথা ছোঁড়ে, ওদিকে হাতের মুঠো টাইট। আর এই দিদির বকুনিও নেই, হাতও উদার। এই অতিথির এত কদর কেন নিভাও জানে মনে হয়। চটপট ট্রে নিয়ে নেমে গেল।

বন্দনা আবার ঘরে ঢুকতেই প্রদোষ খাসনবিশের খুশির অনুযোগ—এ কি কাণ্ড করছ, এত কে খাবে ?

সোফায় বসে বন্দনা জবাব দিল, আমি শুধু কফি করেছি, বাকিটা আপনার ম্যাডামের কাণ্ড...

ভেরি গুড, তুমি হেল্প করলে সবটাই মেরে দিতে পারি।

বন্দনা মুখ টিপে হাসল।—তাহলে আর আপনার বাহাদুরি কি ? একলাই চেষ্টা করুন।

বড়লোকের ছেলের মুখে জবাবটা অবশ্য মন্দ লাগল না বন্দনার। বলল, বাহাদুরি-টাহাদুরি আমি পছন্দ করি না—মিউচুয়াল হেল্প-এর ওপর বেশি ভরসা রাখি। খাবারের ডিসটা হাতে নিল, হাসি ভরা

দু'চোখ বন্দনার মুখের ওপর, বলল, আর একটা ডিস তো দরকার···

বন্দনার চোখে হাসি ছড়াচ্ছে। আপত্তি না করে নিজের কফির পেয়ালা ট্রে-তে রেখে ডিসটা সামনে ধরল।—আমি মিষ্টি খাই না, জাস্ট ওয়ান ফর কম্প্যানি।

প্রদোষ খাসনবিশ দুটো তুলে দিয়ে ছাড়ল। তারপর নিজে বেশ আয়েস করে খাওয়া শুরু করে দিল। খেতে খেতে বলল, এটা হল সেলিব্রেশনের ফার্স্ট পার্ট, সেকেণ্ড পার্টের মেনু অ্যাণ্ড ভেনু আমার ···আচ্ছা, কোন ছুটির দিনে আমরা যদি বাই কার কোথাও চলেই যাই···?

—আমরা বলতে...? দাঁতে মিষ্টি কাটতে কাটতে বন্দনা আলতো করে জিগ্যেস করল।

সাদা অর্থেই নিল প্রদোষ খাসনবিশ। জবাব দিল, তুমি ম্যাডাম জিতেন মণি আর আমি···তোমার কোন ফ্রেণ্ডকে নেবার ইচ্ছে থাকলে অনায়াসে নিতে পারো—একটা গাড়িতে এমনিতেই হবে না —আর একটা গাড়ি নিতে হবে।

কোথায় যাওয়া যেতে পারে সেই আলোচনা শুরু করে দিল। তার ফাঁকে নিজের খাবারের ডিশ খালি। বন্দনার তখন দ্বিতীয় মিষ্টি শেষ হয়নি। খেয়াল হতে লজ্জা পেল ভদ্রলোক। হেসে বলল, অতগুলো মেরে দিলাম, অফিস থেকে সোজা ছুটেছি, বেশ খিদে পেয়ে গেছল দেখছি।

নিরীহ মুখ করে বন্দনা বলল, তার মধ্যে আমি ভাগ বসালাম, আর কিছু এনে দেব?

—না না না, দারুণ পেট ভরে গেছে। তাড়াতাড়ি কফির পেয়ালা টেনে নিল।

বন্দনা দ্বিতীয় মিষ্টি আর শেষ করতে পারল না। সত্যি মিষ্টি তেমন চলে না, তাছাড়া মোটা হয়ে যাবার ভয়। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি বরাবর সচেতন। ডিসটা একপাশে সরিয়ে রেখে সে-ও নিজের পেয়ালা হাতে নিল।

খুশি মেজাজে প্রদোষ খাসনবিশ এবারে প্রসঙ্গ ঘোরালো।—এম. এ. পাশ তো হয়ে গেল···এবার কি ?

—চাকরি-বাকরির চেষ্টা দেখতে হবে।

—চাকরি করবে ?

—বাঃ, চাকরি না করলে কি করব, আমাদের কি আপনার মতো ব্যবসা আছে যে দেখব।

প্রদোষ খাসনবিশ হাসল।—ব্যবসায় মজা কত জানলে বুঝতে, যাক্ সে-কথা বলছি না···তা কি চাকরি করবে, প্রোফেসারি ?

—প্রোফেসারি ! শব্দ করেই হেসে উঠল বন্দনা।—শুধু আপনার আর দাদার বিবেচনায় আমি খুব ভাল পাশ করেছি—বি. এ., এম. এ. কোনটাতেই ফার্স্ট ক্লাস পাইনি, কলেজে ঢুকতে চাইলে দারোয়ান তাড়া করবে।

হাসতে গিয়ে প্রদোষ খাসনবিশ হঠাৎ উৎসুক একটু। কফির পেয়ালা নামিয়ে রাখল।—স্কুলে যদি চাকরি করো তাহলে আমি একটা নাম করা স্কুলে ব্যবস্থা করে দিতে পারি—অত মাইনেও বোধ হয় কলকাতার আর কোন স্কুলে দেয় না।

—কোন্ স্কুল ?

নাম বলল। খুব বড়লোকের মেয়েদের বড় স্কুলই বটে।

—আপনি বললেই ও স্কুলে চাকরি হয়ে যায় ?

—আমি বললে নয়, আমার বাবা বললে হতে পারে। তিনি ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার, তাছাড়া ওই স্কুলে তাঁর অনেক কনট্রিবিউশন আছে—বাবা এ বছর নিজের নাম উইথড্র করে আমাকে ঢোকাতে চেয়েছিল আমি রাজি হইনি। হেসে উঠল, ব্যাচিলর মানুষ, মেয়ে স্কুলের কমিটিতে যাব কি ! যাক, তোমার কি মত বলো, চেষ্টা করব ?

হাসছে বন্দনাও। মাথায় কিছু বুদ্ধি খেলছে। ..এদের রক্ষণশীল পরিবার শুনেছে। একটু দ্বিধাগ্রস্ত মুখখানা করে জিগ্যেস করল, স্কুলে চাকরি যদি করি আপনাকেই প্রথম ধরব...কিন্তু থিয়েটার সিনেমা করা মেয়েকে আপনাদের স্কুল কমিটি পাত্তা দেবে ?

প্রদোষ খাসনবিশ অবাক একটু।—শখ করে দুই একটা থিয়েটার করেছ তাতে কি ·কিন্তু সিনেমা এলো কোত্থেকে?

এই মুহূর্তে এলো আর মগজ থেকে এলো সে কি আর বন্দনা বলে। এবারে একটু অপ্রতিভ মুখ করে জবাব দিল, এখনো আসেনি, কিন্তু লেগে থাকলে চান্স পেয়ে যাব দেখবেন। তারপরেই উৎসুক, সামনে ঝুঁকল একটু —আচ্ছা, আপনার তো কত জানাশুনা, সিনেমা লাইনে আমাকে একটু হেল্প করতে পারেন না? একটু সুবিধে পেয়ে গেলে আর চাকরির চেষ্টাই করতে হয় না—চাকরি করব ভাবলেও মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

প্রদোষ খাসনবিশের প্রসন্ন খুশি ভাবটুকু মিলিয়ে যাচ্ছে। মাথা নাড়ল।—না এ লাইনের কারো সঙ্গে আমার জানাশোনা নেই। ভিতরের অস্বস্তিটুকু তারপর প্রকাশই করে ফেলল।—তুমি সিনেমায় অভিনয় করতে চাও জানতাম না।

—চাই মানে। বন্দনার গলায় নিখাদ আত্মপ্রত্যয়।—ওটাই তো এখন ধ্যান-জ্ঞান আমার, চান্স একদিন তো পাবই—এতে থিয়েটারের থেকে আমি ঢের ভাল করব দেখবেন—আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

প্রদোষ খাসনবিশ মুখের দিকে তাকাল। হাসতে চেষ্টা করল। বলল, তুমি চাইলে চান্স সেধে আসবে আর ভালও নিশ্চয় করবে।

বন্দনার মুখ দরাজ হাসি খেলল বলল, আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

দাদা ফেরার আগে এমন কি স্নান সেরে বউদি নিচে নামার আগেই প্রদোষ খাসনবিশ চলে গেল। দাদার আগে বউদিই ঘরে ঢুকেছে। আকাশ থেকে পড়া মুখ।—কি হল, ভদ্রলোক এরই মধ্যে চলে গেলেন?

সাদা মুখ করে বন্দনা বলল, এরই মধ্যে নয়, প্রায় এক ঘণ্টার কাছাকাছি ছিলেন ··কিন্তু তুমি তো ছিলে বাথরুমে কেউ এসেছিল জানলে কি করে?

অপ্রস্তুত হয়েও বউদি জবাব দিল, বাঃ, তার তো আসার কথাই ছিল। খাবারের ডিসের দিকে চোখ পড়তে হাসল।—আপ্যায়ন-টাপ্যায়ন তো করেছ দেখছি, খোশখবর কিছু আছে?

—খোশখবর শুনেই তো তিনি এসেছিলেন, আনন্দ করে পরীক্ষা পাশের মিষ্টি খেলেন। আর বললেন, সকলকে নিয়ে একদিন পিকনিকে বেরিয়ে সেলিব্রেট করবেন—

কথার মাঝে দাদা হাজির তারও চোখে মুখে বিস্ময়।—প্রদোষ আসেনি?

বন্দনা হাসি চেপে আছে। জবাব দিল বউদি। বলল, এসেছিলেন, আমি চান সেরে নেমে আসার আগেই চলে গেলেন দেখছি। দাদা এসে যেতে মনে একটু জোর পেল বোধহয়। ননদকে সোজা জেরার মুখে টেনে আনল।—আমরা জানতে চাই তিনি কোনো প্রপোজাল দিয়েছেন কি না?

জবাবে বন্দনার মুখে অভিনয় পটু নিরীহ বিস্ময়।—বললাম তো, একদিন নিজের গাড়িতে সকলকে নিয়ে বাইরে কোথাও গিয়ে সেলি-ব্রেট করবেন।

দাদার সন্দিগ্ধ চাউনি তার মুখের ওপর।—তুই রাজি হোসনি?

—বাঃ, আমরাই পাশের আনন্দে সেলিব্রেট করবেন, রাজি না হবার কি আছে!

সঙ্গে সঙ্গে বউদি রেগেই গেল প্রায়।—দেখো, ভাজা মাছখানা উল্টে খেতে জানো না, আমরা কি জানতে চাইছি বুঝছ না—কেমন? তাহলে শোনো, প্রদোষ বাবু আজ এসে কোনো বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন কি না?

বন্দনা নিজের মেজাজে ফিরল এতক্ষণে। গম্ভীর দু'চোখ কয়েক পলক তার মুখের ওপর ফেলে রাখল। তারপর ফিরে জিগ্যেস করল, সে রকম কোনো প্রস্তাব দেবার কথা ছিল?

বউদির ধরা-পড়া গোছের মুখ। বলল, ছিল তো···

বন্দনার কথার সুরে স্পষ্ট শ্লেষ এবারে।—এই জন্যেই ভদ্রলোকের

ঠিক আসার আগে তোমার এত চানের ঘটা আর দাদার বাইরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট— কেমন ?

বউদিটিও খুব নরম মেজাজের মানুষ নয়। পাল্টা ঠেসের সুরে বলল, তুমি যতই বাইরে নেচে মা-মানে হৈ-হৈ করে বেড়াও, আমাদের কর্তব্য তো আমাদের করতে হবে। ভদ্রলোক নিজেই বলেছিলেন আজ এসে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন, তাই উচিত বুঝেই আমরা সরে ছিলাম এখন তোমাকে যা জিগেস করা হচ্ছে তার সোজা জবাব দাও, তিনি বিয়ের কথা তুলেছিলেন কি না ?

বন্দনা রাগতে গিয়েও হেসে ফেলল। এই গোছের অভিনয়টুকুও ভালো রপ্ত করেছে। মাথা নাড়ল বলল, না, তিনি বিয়ের কথা মুখেও আনেননি, আর আশা করছি ভবিষ্যতেও আনবেন না –

—কেন ? প্রশ্নটা একসঙ্গে দাদা বউদি দু'জনারই।

বন্দনা জবাব দিল, আমি আশা করছি বললাম তো, তোমাদের অন্য রকম আশা থাকলে তাঁকেই জিগ্যেস করতে পারো। থামল একটু, তারপর বউদির দিকে চেয়ে বলল ভদ্রলোক ভালো মানুষ আমি জানি, সেই জন্যেই তোমাদের নিষেধ করেছিলাম উনি দুঃখ পান এমন কিছু কোরো না—কিন্তু তোমরা আমার কথা শুনলে না— সে দোষ এখন আমার ঘাড়ে চাপাতে এসো না।

একটু দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বেরিয়েই দেখল নিভা প্রায় ছুটেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে। বন্দনার এবার সত্যিই হাসি পেল। ও-যে পর্দার আড়ালে এতক্ষণ আড়ি পেতে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

·· দাদা বউদির ব্যাপারে বন্দনার সব ধারণাই মিলেছে। তাদের আগ্রহে প্রশ্রয় পেয়েই প্রদোষ খাসনবিশ বিয়ের ব্যাপারে বোঝাপড়া করতে এসেছিল। এরপর বন্দনার আরো ধারণা, সব জানতে-বুঝতে দাদা এরপর ওই ভদ্রলোকের বাড়ি ছুটেছে নয়তো ফোন করেছে। প্রদোষ খাসনবিশ দাদাকে কি বলে থাকতে পারে বন্দনা আঁচ করতে পারেনি। কিন্তু ভদ্রলোক এমন কিছু নিশ্চয় বলেনি যার

দরুন দাদা এই বোনের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে।···বন্দনা সিনেমায় নামতে চায় আর সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছে আর সেই কারণেই প্রদোষ খাসনবিশ সরে দাঁড়িয়েছে এ শুনলে চিৎকার চেঁচামিচি করে দাদা বাড়ি মাথায় তুলত। আর বউদিও বাতাসে কথা ছুঁড়ে ঠেস দিতে ছাড়ত না। যে কারণেই হোক প্রদোষ খাসনবিশ এ অশান্তি থেকে অব্যাহতি দিয়েছে এ জন্য বন্দনা কৃতজ্ঞও।

কিন্তু এর দিন পাঁচেকের মধ্যে আর একটা ব্যাপার ঘটে গেল যার জন্য বন্দনা আদৌ প্রস্তুত ছিল না। যাব ফলে প্রদোষ খাসনবিশ তার মনে আরো একটু শ্রদ্ধায় পাত্র হয়ে রইল।

···সেদিন বিকেলে বউদি গেছে তার বাপের বাড়ি, সঙ্গে দাদা তার শ্বশুর বাড়ি। ছোড়দা কোনো বিকেলেই বাড়ি থাকে না। বাড়িতে শুধু ও আব নিভা। বন্দনা একটা পড়া উপন্যাসের পাতা ওল্টাচ্ছিল। তার গ্রুপ থিয়েটার থেকে এক ভদ্রলোকের আসার অপেক্ষায় ছিল।

নিভা এসে বেশ অবাক মুখ করে জানান দিল, জিপ থেকে নেমে এক ভদ্রলোক দিদিমণির সঙ্গে দেখা করতে চাইছে—

বই রেখে বন্দনা সাদা মনেই ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছিল। পিছন থেকে নিভা বলে উঠল, ভদ্রলোকের পুলিশের গাড়ি মনে হল, পরণেও পুলিশের পোশাক!

বন্দনা থমকে ঘুরে দাঁড়ালো। পুলিশের লোক তার কাছে আসবে কেন ভেবে পেল না।—কে বা কি দরকার জিগ্যেস করলে না কেন?

নিভার ঈষৎ অপ্রস্তুত মুখ। পুলিশের লোক দেখে কিছু জিগ্যেস করতে ভরসা পায়নি বোঝা গেল।

বন্দনা নিচে নেমে বসার ঘরে ঢুকতে ভদ্রলোক তৎপর সৌজন্যে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত জুড়ে নমস্কার জানালো। পরণে ফিটফাট পুলিশের পোশাকই বটে, কাঁধে ব্যাজ। টুপিটা টেবিলের ওপর। প্রতি নমস্কারের ফাঁকে বন্দনার মনে হল মুখের আদল চেনা-চেনা।

-আমার নাম প্র.বাধ খাসনবিশ, প্রদোষ খাসনবিশ আমার দাদা-

—ও। বসুন—

দু'জনের মধ্যে গড়নের মিল কোথাও নেই। বেশ লম্বায় ওপর মজবুত স্বাস্থ্য, মাথার চুল বেশ ছোট করে ছাঁটা, হাসি ছোঁয়া চাউনি। এককথায় বেশ স্মার্ট। বড় ভাইয়ের সঙ্গে শুধু মুখের আদলটুকু মেলে। এ ভদ্রলোক হঠাৎ তার কাছে কেন ভেবে না পেয়ে বন্দনা বেশ অবাক।

নিজে সামনের চেয়ারটায় বসতে প্রবোধ খাসনবিশ ঈষৎ উৎসুক চোখে ওকে দেখে নিয়ে সবিনয়ে বলল, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য প্রথমেই মাপ চেয়ে নিচ্ছি, আমাকে কেউ এখানে আসতে বলেনি, দাদা আজ সকালের প্লেনে বম্বে চলে যেতে অনেকটা নিজের তাগিদে এসেছি... আপনার একটু সময় হবে তো?

চাউনি আর কথা শুনেই বোঝা যায় লোকটি চালাক চতুর। বন্দনা যতটা সম্ভব নিস্পৃহ।—বলুন...

—আমি এখানকার থানার ও. সি. লেখাপড়া শিখে পৈত্রিক ব্যবসা ছেড়ে পুলিশের চাকরিতে ঢুকেছি বলে একমাত্র দাদা ছাড়া আমার ফ্যামিলির আর সকলে আমার ওপর বিরক্ত—এ লাইনে আমার ঝোঁক দেখে শুধু দাদাই আমাকে উৎসাহ দিয়েছিল।...আমি শুধু বলতে চাই দাদা আমার শুধু বড় ভাই নয়, তার থেকেও বেশি কিছু—

চোখে চোখ রেখে বন্দনা নরম স্বরেই বলল, আপনি এ কথাই বা আমাকে জানাতে এসেছেন কেন?

ভদ্রলোক এক মুহূর্ত থমকালো। তারপর জবাব দিল, পুলিশে চাকরি করার ফলে আমার চিন্তা ভাবনাগুলো ঠিক দাদার মতো নয়—তার মতো মানুষ এতটা এগোবার পর ধাক্কা খেয়ে নিজের ভুল বুঝল এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি. তাই নিজে একটু বুঝতে এসেছিলাম।

মুখের দিকে চেয়ে থেকে তেমনি ঠাণ্ডা গলায় বন্দনা জিগ্যেস করল, আপনার দাদার মতো মানুষ এতটা এগোবার পর বলতে আপনি ঠিক কি মিন্ করছেন ? আমি তাঁর সঙ্গে ফ্লার্ট করে বেড়িয়ে তারপর তাঁকে বতিল করেছি ?

—সে রকম ভাবলে আমার কিছুই বুঝতে আসার দরকার হত না···আর ফ্লার্টিং টাইপ বুঝলে দাদাও আপনার ধারে কাছে ঘেঁসত না। আপনি দয়া করে আমাকে আর একটু সময় দিন—

বন্দনা চুপচাপ চেয়ে আছে। অপেক্ষা করছে।

প্রবোধ খাসনবিশ বলে গেল, আমাদের খুব কনজারভেটিভ ফ্যামিলি, আমাদের বাবা-মা তাদের বাপ-ঠাকুরদার রাস্তা ধরেই এত কাল চলে এসেছেন। দাদা এখন ফ্যামিলির বড় ছেলে, বাবা মা তার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।···তু'বছর আগে দাদা শুধু আমাকে জানালেন কোথায় কাকে বিয়ে করতে চান।···দাদার বুদ্ধি বিবেচনার ওপর আমার অন্ধ বিশ্বাস, তবু আপনি শৌখিন থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত জেনে আমি আপনার তুটো নাটক দেখতে গেছলাম। যাক, মোট কথা, বাবা-মাকে বুঝিয়ে রাজি করানোর দায়িত্ব আমি নিয়েছিলাম, আর রাজি করিয়েও ছিলাম। কিন্তু আপনার দাদা আমার দাদাকে বলেছিলেন এম. এ পাশের আগে আপনি বিয়েতে রাজি নন। আমরা সকলেই সেই শুভ দিনের অপেক্ষায় ছিলাম। ···কিন্তু দিন পাঁচেক আগে দাদা আমাকে ডেকে বললেন তাঁর বুঝতে ভুল হয়েছিল, এখানে বিয়ে হবে না। আর বাবা-মা-কে বলতে বললেন তাঁরাই মেয়ে ঠিক করুন।

এ-পর্যন্ত বলে প্রবোধ খাসনবিশ থামল। গম্ভীর অথচ প্রখর দৃষ্টি তার মুখের ওপর। তারপর বলল, এখন বুঝতে পেরেছেন বোধ হয় আমি কেন এসেছি ?

খুব ঠাণ্ডা সুরে বন্দনা জবাব দিল, পেরেছি। আপনি নিজেই বলেছেন আপনার দাদার ভুল বোঝাটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি, তাই আমার দিক থেকে কিছু কৈফিয়ত প্রাপ্য ভাবছেন।

দেখুন আমার দাদা খুব সাদা মনের মানুষ, কিন্তু নির্বোধ নন।... "দু'বছরের ওপর ধরে তিনি এ-রকম একটা ভুল ধারণা নিয়ে বসেছিলেন কি করে ভেবে পাচ্ছি না। এখানে বিয়ে হবে না জানানোর পরেও তিনি কিন্তু আপনার সম্পর্কে একটি অশ্রদ্ধার কথা বলেননি। আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, কৈফিয়ত নিতে নয়, দাদার জন্য কষ্ট হচ্ছে বলেই বলেই আমি এসেছি, এটা আপনাদের মধ্যে কোনো সাময়িক ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার কিনা এ-ও মনে হয়েছে।

এবারে বন্দনার ভিতরটাও নরম একটু। লোকটার দৃষ্টি এখনো প্রখর বটে কিন্তু পুলিশ অফিসারের দাপট কিছু দেখছে না। দাদার প্রতি অকৃত্রিম টানটুকুই স্পষ্ট। এ বাড়িতে তো দাদা ছোড়দার অনুপস্থিতিতে তার উদ্দেশ্যে বাতাসে কথা ছোঁড়ে আর ছোড়দাও দাদার অনুপস্থিতিতে তাই করে। ঈষৎ বিব্রত মুখে এবারে মিষ্টি করেই বলল, আপনার কথা শুনে আমিও সত্যি খুব দুঃখিত।...আপনার দাদা অমন সাদা মনের মানুষ বলেই হয়তো দু'বছরের মধ্যে একটা দিনের জন্যও মন বুঝতে চেষ্টা করেননি। হয়তো তাঁর এ ভুলের জন্য আমার দাদা বউদিও কিছুটা দায়ী! ..তাঁরা আর আপনার দাদা আমার ভবিষ্যত স্থির করেছেন, কিন্তু আমার বয়েসটা যে আর পনের ষোলয় আটকে নেই, আমার ভবিষ্যৎ যে অন্য কোন দিকে গড়াতে পারে এ-চিন্তা কারো মনেই আসেনি—এলে কারো কোনো দুঃখ পাওয়ার কারণ ঘটত না—

—তার মানে আপনি আগে থেকেই অন্যত্র এনগেজ্‌ড ?

লোকটা তার কথার এই অর্থ করল দেখে বন্দনার হাসিই পেল। যা-ই ভাবুক কিছু এসে যায় না। সহজ মুখেই বলল, এরপর এ আলোচনায় দরকার নেই, দাদাকে যখন এত ভালবাসেন তাঁকেই জিগ্যেস করে দেখবেন দাদার বন্ধু হিসেবে আলাপ হবার পর থেকে তার ভুল বোঝার মতো কোনো সুযোগ একদিনের জন্যেও আমি দিয়েছি কিনা···তিনি অস্বীকার করলে কৈফিয়ত নেবার জন্য আপনি না-হয় আমাকে আপনার থানাতেই ধরে নিয়ে যাবেন।

ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে একেবারে উঠে দাঁড়ালো।—কি কাণ্ড, এ-রকম ব্যাপার আমি তো ভাবতেই পারিনি...দাদাকে নিয়ে আর পারা যায় না, মানুষটা কত সোজা সরল বুঝুন তাহলে। আচ্ছা, আপনার অনেক সময় নষ্ট করে ফেললাম—

—কিছু না, আমি তো বাড়িতেই বসে···এত কথার মধ্যে আপনাকে এক পেয়ালা চা-ও দিলাম না—বসবেন একটু?

—না না, থ্যাঙ্কস্। ভদ্রলোকের মুখে সপ্রতিভ হাসি।—তবে দাদা যত সরল মানুষই হোক, তাঁর পছন্দের তারিফ না করে পারছি না—আমাদের ব্যাড্ লাক।

হাসতে হাসতে নমস্কার জানিয়ে দরজার দিকে দু'পা এগিয়েও ঘুরে দাঁড়ালো।—একটা অনুরোধ করতে পারি?

বন্দনা জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো।

—এরপর আপনার সঙ্গে দাদার কখনো দেখা হলে আমি যে এসেছিলাম তাঁকে বলবেন না। আমিও লজ্জা পাব।

বন্দনা একটু হেসেই সায় দিল, ঠিক আছে, বলব না।

চলে গেল। জিপ স্টার্টের শব্দ কানে এলো।

এর দেড় মাসের মধ্যে প্রদোষ খাসনবিশ নিজে এসে তার বিয়ের নেমন্তন্নর চিঠি দিয়ে গেছে। যাবার জন্য বন্দনাকেও বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে। নেমন্তন্নের বাড়ি এসেও কেবল দাদা বউদির মুখ ভার আর বন্দনা মিত্র বেজায় খুশি। ওদের দুই ভাইই দরাজ আপ্যায়ন জানিয়েছে।

কিন্তু যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অনায়াসে প্রদোষ খাসনবিশকে সরানো গেছল, সেটাই যে এমন সত্যি হয়ে জীবনে আসবে, এক নতুন স্রোতে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যবে—এ কল্পনাতেও ছিল না। বন্দনার বয়েস তখন তেইশ। বিয়ের নামে কান পাতে না বলে দুই দাদা আর বউদি এখন ভীষণ বিরক্ত। তাছাড়া ব্যাঙ্কে ওর নামে বিয়ের জন্য বাবার রাখা টাকাও বন্দনা কিছু কিছু ভেঙে চলেছে। আরো বিরক্ত

ওর থিয়েটার নিয়ে। তখন গ্রুপ থিয়েটারে 'ঘোলা জলের দাগ' নামে অতি আধুনিক একটি নাটক জোর চলছে—নায়িকা বন্দনা মিত্র।

প্রায় রাতেই এ-বয়সের মেয়ের বাড়ি ফেরার সময়ও ঠিক থাকে না। তাদের বিরক্তি স্বাভাবিক।

বন্দনা কাগজে চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে। মোটামুটি স্বচ্ছন্দে থাকার মত একটা কাজ পেলে কোনো মেয়ে হোষ্টেলে চলে যাবে। ঠিক করেছে। নিজের ওপর প্রচুর আস্থা, দাদার খামোখা চিন্তা করে, ভাবে। কোনো চাকরি পছন্দ হলে কাগজে দাগ দিয়ে রাখে। কিন্তু দরখাস্ত করা আর হয়ে ওঠে না। তবু এ-জন্যেও উতলা নয় আদৌ। সে-ভাবে চেষ্টা করলে আর ইন্টারভিউ পেলে চাকরি একটা হয়েই যাবে—আয়নায় নিজের মুখ তো দেখে···।

এরই মধ্যে সেই অভাবিত যোগাযোগ। প্রদোষ খাসনবিশের ভবিষ্যৎ বাণী মিথ্যে হয়নি। সিনেমায় নামার জন্য সাহায্য করার প্রস্তাবে সে বলেছিল, তুমি চাইলে চান্স সেধে আসবে। সুযোগ সেধেই এসেছে।

রাত তখন পৌণে ন'টা। দশ মিনিট আগে 'ঘোলা জলের দাগ' শেষ হয়েছে। গ্রীন রুমে প্রসাধন তুলে বন্দনা সবে জামা কাপড় বদলেছে। পর্দার ওদিক থেকে বেয়ারা জানান দিল, এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান—এই তাঁর কার্ড।

পর্দার ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে কার্ডটা ধরল। ওটা নিয়ে বন্দনা দেখল, ওপরে বাড়ির ঠিকানা, মাঝখানে সুবীর রায় নাম, নিচে লেখা ডিরেক্টর। সবই ইংরেজীতে ছাপা। অভিনয়ের মেজাজের বা ক্লান্তির মধ্যে কে সুবীর রায় বা কোন কোম্পানির ডিরেক্টর হতে পারে মাথায় এলো না। তবে অবাক হল বটে। নিয়ে আসতে বলে সামনের আয়নার নিজেকে একটু দেখে নিল। কোনো রেসপেক্টেবল্ ফ্যান হওয়াই সম্ভব—অভিনয় দেখে অভিনন্দন জানাতে এসেছে।

কিন্তু একটু বাদে বিস্ময়ে বন্দনারই হাবুডুবু খাবার পালা।

যে এলো তার পরনে ধপধপে ধুতি পাঞ্জাবি? বেশ ঢ্যাঙা।

দোহারা। কালো ঠিক না হলেও ফর্সা বলা চলেই না, কিন্তু বেশ সুশ্রী সুপ্রতিভ মুখ। চোখে বুদ্ধির ছাপ, বছর ছত্রিশ সাঁইত্রিশ হবে বয়েস। ভিতরে এসে দু'হাত জুড়ে নমস্কার জানালো, তারপর কোন ভনিতা না করে বলল,কার্ডে আমার নাম দেখে চিনতে পেরেছেন কিনা জানি না—সুবীর রায়, ফিল্ম ডিরেক্টর, সিনেমা দেখার অভ্যাস থাকলে হয়তো আমার ছবিও দুই একটা দেখেছেন।

স্মার্ট মেয়ে বন্দনা বুকের তলায়ও হঠাৎ ধপ ধপ শব্দ। ডিরেক্টর বলতে ফিল্ম ডিরেক্টর হতে পারে ভাবেই নি। হ্যাঁ, এই লোকের নামও শুনেছে, তার ডিরেকশনেব ছবিও দেখেছে। কিছুদিন আগের দেখা তার শেষ ছবিটা একটুও ভাল লাগেনি। তাব আগের দুটো ছবি মোটামুটি ভালই লেগেছিন।

—ও...! বসুন বসুন। বিস্ময় ছোঁয়া সৌজন্যের এই সপ্রতিভ অভিব্যক্তিটুকু নিখুঁত।

সামনের কাঠের চেয়ারটায় বসেই সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। দ্বিতীয় চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, আপনি বসুন—

বন্দনা বসতে নিজেও আসন নিল।—আপনার এই নাটকটা আমি তিন বার দেখলাম, খুব ভাল লেগেছে···তার আগে আপনার য়ুনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ের নাটকও দুই একটা দেখেছি—তাও ভাল লেগেছিল—তবে এটার সঙ্গে সেগুলোর তুলনা হয় না। আপনার অভিনয়-গুণে গল্পটাকে ভারী বাস্তব মনে হয়েছে।

বন্দনার ঠোঁটে হাসি, কিন্তু চোখেব কোণে কৌতুক। য়ুনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ের নাটকও ভালো লেগেছিল বলল। কিন্তু য়ুনিভার্সিটিতে পড়া মেয়ে অভিনয় করছে এ নিশ্চয় কোনো প্রোগ্রামে লেখা ছিল না, কিন্তু ভদ্রলোক খবর রাখে।—

—থ্যাঙ্কস্।

সুবীর রায় ভনিতা বাদ দিয়ে সরাসরি প্রস্তাব পেশ করল। বলল, আপনি টায়ার্ড বুঝতে পারছি, আমি পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নেব না। ডাইরেক্টরদের মধ্যে আমি নতুন মুখ খুঁজে বেড়াই, ছবির

জন্য এবারে যে গল্পটা ঠিক হয়েছে সেটা আমার লেখা...ফ্র্যাংকলি বলি, গল্পটা লিখতে লিখতে ঠিক করেছিলাম হিরোইনের রোলে নতুন কাউকে নেব, তখন অনেকবার আপনার কথাই মনে হয়েছে...সেই জন্যেই আগে দু'বার আপনার 'ঘোলা জলের দাগ' দেখেছি, আজ থার্ডটাইম আমার প্রোডিউসারকে সঙ্গে করে দেখলাম। আপনাকে দেখে, আই মিন আপনার অভিনয় দেখে তিনিও খুশি হয়েছেন, তাঁর কাছে গ্রীন সিগন্যাল পেয়ে আমি অ্যাপ্রোচ করছি...আপনি রাজি থাকলে কথাবার্তা এগোতে পারে।

শোনামাত্র ভিতরটা খুশিতে উন্মুখ, কিন্তু সেটা বুঝতে দেবার মত বোকা মেয়ে নয় বন্দনা মিত্র। এটুকুর মধ্যেই এই লোকের আগ্রহ বোঝা গেছে, আর প্রোডিউসার সম্পর্কে মুখ ফসকে যা বলে ফেলেছিল তা-ও ঠিক না হয়ে পারে না—অভিনয় দেখে খুশি হয়েছে, ওকে দেখেও খুশি হয়েছে। নইলে একেবারে হিরোইনের রোলে অভিনয় করার জন্য নাটক দেখেই গ্রীন সিগন্যাল দিত না।

বিড়ম্বনার হাসিটুকু সুন্দর ফুটল মুখে।—ভয় পাইয়ে দিলেন দেখছি, আমি ছবিতে কখনো অভিনয় করিনি···

—আমার বিবেচনায় সেটা আপনার অ্যাডিশনাল কোয়ালিফিকেশন, আগে ফিল্মে অভিনয় করার অভিজ্ঞতা থাকলে সেটা ভুলে যেতে বলতাম। হাসল একটু—ফিল্মে অভিনয় আর্টিস্ট করে বটে, কিন্তু যেটুকু দরকার ডিরেক্টারই করিয়ে নেয়।...তাহলে আপনার আপত্তি নেই ?

বন্দনার মগজ দ্রুত কাজ করছে। এ-ভাবে প্রস্তাব যখন এসেছে, সময় চাইলে তা কেঁচে যাবার নয়, বরং কদর বাড়ার কথা। বিড়ম্বনায় অভিব্যক্তিটুকু মিষ্টি হাসির ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেল। বলল, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, একটু ভেবে নিই, আর বাড়িতেও বলে দেখি...

বলা বাহুল্য, ভদ্রলোক এই জবাব আশা করেনি মুখ দেখেই বোঝা গেল। কারণ, এমন লোভনীয় আমন্ত্রণ কম শিল্পীর ভাগ্যেই

জোটে। ফলে কদর একটু বাড়ল ঠিকই। নির্বোধের মত সুবীর রায় আর জোর করল না? তক্ষুনি চেয়ার ছেড়ে উঠল।—ঠিক আছে, আমার ইমিডিয়েট্‌লি সেট্‌ল করার দরকার, আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানাবেন—

কার্ডটা হাতে করে বন্দনাও উঠল। তারপর যা বলতে যাচ্ছিল সুবীর রায়ই সে-প্রসঙ্গ তুলল!—ওকে আমার বাড়ির অ্যাড্রেস আছে, আপনার ফোন থাকলে আমিই স্টুডিও থেকে ফোন করে খবর নিতে পারি—

সঙ্গে সঙ্গে বন্দনা জবাব দিল, তাহলে খুব ভাল হয়। 'ঘোলা জলের দাগ'-এর একটা প্রোগ্রামের নিচে বাড়ির ফোন নম্বর লিখে দিল। পরদিন বেলা তিনটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে ফোন করতে বলল। কারণ, দাদারা তখন অফিসে আর বউদির সেটা গাঢ় ঘুমের সময়।

সমস্ত রাতটাই আধা—ঘুম আর চাপা উত্তেজনার মধ্যে কাটল বন্দনার। কেউ তাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেনি। এই রাতে আরো একটু দেরি করে বাড়ি ফেরার দরুন দুই দাদা আর বউদি অন্য দিনের থেকে বেশি গম্ভীর। বন্দনার মজাই লাগছিল। সখের থিয়েটার করছে বলেই তাদের এই মেজাজ, ছবিতে নামার ব্যাপারে তারা কি করবে, না, বন্দনা কারো মেজাজের ধার ধারে না। কিন্তু পরদিন সোয়া তিনটে বেজে গেল, সাড়ে তিনটেও পার, কিন্তু ফোন আর আসেই না। বন্দনা একটু দমে গেল। ভাবল, গত কাল এত কদর না বাড়াতে গেলেই হত। তক্ষুনি নিজের ওপর বিরক্ত। না হলে না হবে, বুঝতে হবে অফারটাই জেনুইন নয়।

টেলিফোন বেজে উঠল পৌনে চারটেরও দু-তিন মিনিট বাদে। বন্দনা বার তিন চার বাজতে দিল। তারপর রিসিভার তুলল। সাড়া দিতে গলা শুনেই বুঝল কে।

—বন্দনা মিত্র?

—হ্যাঁ...

—সুবীর রায়। নমস্কার—

—ও, হ্যাঁ...নমস্কার, বলুন।

ওদিক থেকে অল্প হাসি।—বলবেন তো আপনি।

—ইয়ে...ঠিক আছে···কিন্তু গল্প তো শোনা হল না।

এবারে ওধারের ঈষৎ অন্তরঙ্গ গলার জোর বাড়ল একটু।—আপনাকে তো বলেছি, গল্পটা লিখতে লিখতে বারবার আপনার কথাই মনে হয়েছে। গল্প আপনার অপছন্দ হবে না—একটি সুন্দরী মেয়ের স্ট্র পার্সোনালিটির গল্প- যার জোরে সে অনেক বাধা-বিঘ্ন উতরেছে—আর শেষ পর্যন্ত নিজের ঘরের লোকেরও ভুল ভাঙাতে পেরেছে।

—বাঃ। প্রশংসার শব্দটা আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল।

ওদিকে খুশি।—তাহলে কাল রোববার আছে—কালই সকাল ন'টা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে আপনি আমার বাড়ি চলে আসুন—প্রোডিউসারের সঙ্গে দশটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখছি, আপনাকে নিয়ে যাব।...ও. কে'

এ-প্রস্তাব খুব মনঃপূত হল না। কিন্তু নায়িকা না হতেই নাম ডাকের নায়িকার মতো প্রোডিউসারকেই বাড়িতে নিয়ে আসতে বলতে পারে না। তাছাড়া কনট্রাক্ট না হওয়া পর্যন্ত বাড়ির লোকের কিছু না জানাই ভালো। বন্দনা রাজি হল। ভদ্রলোকের বাড়ির হদিস জেনে নিয়ে ফোন ছেড়ে দিল।

পরদিন সেজেগুজে বেরুনোর জন্য তৈরি হতে দেখে টিপ্পনীর সুরে বউদি জিগ্যেস করল, কোথায়? সকালেই এত সাজের ঘটা...

মুচকি হেসে বন্দনা জবাব দিল, চাকরির খোঁজে।

এবারে দাদা জিগ্যেস করল, কোথায়?

বন্দনা তেমনি জবাব দিল, পরে বলব।

রবিবারে কোথায় চাকরির খোঁজে চলল কেউ ভেবে পেল না। কিন্তু জবাবদিহি করার জন্য আর সামনে নেই, ততক্ষণে সে রাস্তায়।

বন্দনার সময়ের হিসেবে একটু ভুল হয়েছিল। ট্যাক্সিটা সুবীর

রায়ের বাড়ির গলির মুখে এসে দাঁড়াতে ঘড়ি দেখল—ন'টা বাজতে দশ। গলিটা গাড়ি ঢোকার মতো চওড়া নয়। তার আসার কথা ন'টা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে। গল্পটা একটু সবিস্তারে শোনার ইচ্ছেয় ঠিক ন'টায় পৌঁছতে চেয়েছিল।

টেলিফোনে জেনে নিয়েছিল এই গলির শেষের একতলা বাড়িটা সুবীর রায়ের। ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে পায়ে পায়ে এগুলো। উঠতি ডাইরেক্টারের বাড়িটাতে কিছুমাত্র জলুস নেই। বরং অনেক দিনের অযত্ন অবহেলার ছাপ স্পষ্ট। সামনের বন্ধ দরজা দুটোই রং উঠে বিবর্ণ। কলিং বেল-এর বোতাম দেখে টিপল।

বন্ধ দরজার ওধারে দুড়দাড় শব্দ। দরজা খুলল বছর দশেকের একটা ছেলে। ভারী সুন্দর দেখতে ছেলেটা। লম্বা, ধপধপে ফর্সা, একটু রোগা, এক মাথা কোঁকড়া চুল, টানা দুষ্টু দুষ্টু চোখ। পরণে হাফপ্যান্ট, আদুড় গা। দেখলেই মায়া পড়ে—সেই গোছের মুখ। তার পিছনে আরো একটা কচি ছেলে, তেমন ফর্সা নয়। দুষ্টু দুষ্টু! সাত-আট বছর বয়েস হবে, এরও মুখশ্রী বেশ মিষ্টি।

এ রকম আগন্তুক দেখে ছেলে দুটো কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল।

—এটা সুবীর রায়ের বাড়ি?

—হ্যাঁ। বড় ছেলেটার চটপট জবাব।—বাবা এই মাত্র চানে ঢুকল...আচ্ছা, আমি খবর দিচ্ছি। ঘুরে দু'পা ছুটেই আবার দাঁড়িয়ে গেল।—বাবাকে কি বলব?

—বলো, যার আসার কথা ছিল, এসেছে।

—এই দীপু, বসার ঘরে নিয়ে যা। ছোট ভাইয়ের উদ্দেশে হুকুম দিয়ে ছুটে চলে গেল।

বাচ্চা ছেলেটা সকৌতুকে নিরীক্ষণ করেছিল, হুকুম পেয়েই সোজা বন্দনার হাত ধরল।—এসো।

এ-রকম এক অভ্যর্থনার জন্য বন্দনা প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু খুব ভালো যে লাগছে সন্দেহ নেই।

হাত ধরে দু'পা বাড়িয়েই বাচ্চাটা জিগ্যেস করল, তুমি আমার বাবার কাছে কেন এসেছ ?

বন্দনার বিপাকে পড়ার দাখিল। হেসে বলল, দরকার আছে।...সুবীর বাবু বুঝি তোমার বাবা ?

—হ্যাঁ আমারও, দাদারও।

বলতে বলতে বসার ঘরে নিয়ে এলো। ঘরে সোফা সেটই আছে, কিন্তু যত্ন নেই। এক একটা এক-এক মুখো হয়ে আছে। বন্দনা বসতে গিয়েও থামকালো একটু, মনে হল ভাল শাড়িটাতে ধুলো লাগবে। সন্তর্পণে বসল। চারদিকে তাকাতে চোখ দুটো আরো ঘা খেল। দেয়ালে একটা আধছেঁড়া ক্যালেণ্ডার উল্টে আছে। দেয়ালের চার কোণায় ঝুল। টেবিলটা নোওরা।...ছেলে দুটোকে দেখে বন্দনার মনে হয়েছিল ভদ্রলোকের স্ত্রী-ভাগ্য ভাল...অবশ্য ভদ্রলোকও সুশ্রী বেশ, কিন্তু বড় ছেলের যা চেহারা স্ত্রীটির বেশ সুন্দরী হওয়ার কথা...আর ছোটটাও এমন মিষ্টি যে ধরে চটকাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ঘরের ছিরি দেখে ভদ্রলোকের স্ত্রীটিকে খুব সুগৃহিণী মনে হল না।

—তোমার নাম কি ? হেসে বন্দনা ছেলেটাকে কাছে টানল !

—আমার নাম দীপু, দাদার নাম বঙ্কি।

—বাঃ ! তুমি স্কুলে পড় ?

—আমি দাদা দুজনেই স্কুলে পড়ি।

—কি পড় ?

—আমি ক্লাস টুতে, দাদা ক্লাস ফাইভে।

—বন্দনা কৌতুক বোধ করল, এ-ছেলে দাদাকে বাদ দিয়ে কোন কথার জবাব দেয় না।

দাদা অর্থাৎ বঙ্কি ফিরল। গড়গড় করে জানান দিল, বাবা একটু দরকারি কাজে বেরিয়েছিল, ফিরতে দেরি হয়ে গেল, চান সেরে রেডি হয়ে আসছে, আপনাকে একটু বসতে বলল—। মুখের কথা শেষ করার আগেই শাসনের সুর, এই দীপু সরে দাঁড়া—ওঁর শাড়িতে তোর গায়ের ধুলো লেগে যাবে !

—না না, ধুলো লাগবে না। বন্দনা অপ্রস্তুত বাচ্চাটাকে দু'হাতে আরো একটু কাছে টেনে নিয়ে ওকেই ডাকল, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, তুমিও এসো না—

বড় ছেলেটা হাত চারেকের মধ্যে এসে দাঁড়াল। বন্দনা আর একবার ওকে ভাল করে দেখল। নাম বহ্নি। এ নাম যেন ঠিক এ এ-রকম ছেলেকেই মানায়। কিন্তু মনে মনে একটু অবাক হচ্ছে। ভদ্রলোক চানে ঢুকেছে, তার স্ত্রীর তো সৌজন্যের খাতিরে একবার এসে দাঁড়ানো উচিত।

দু'হাতে আগলানো দীপু সমনোযোগে তাকে দেখছে। ঠোঁটে মিটমিট হাসি।—তুমি খুব সুন্দর দেখতে, বাবার কাছে যারা আসে তাদের কেউ তোমার মত সুন্দর না।

সঙ্গে সঙ্গে দাদার শাসন।—এই দীপু! বলতে হয় না!

ভাল লাগার এ-রকম স্বাদ বন্দনার জানা ছিল না। নিজেদের বাড়িতে এখনো একটা বাচ্চা নেই। ছেলেটাকে এক হাতে জড়িয়ে রেখে মুখখানা নিজের দিকে তুলে ধরল।—তুমিও খুব সুন্দর দেখতে।

লজ্জা পেয়ে গেল!—ধেৎ! দাদা তো সুন্দর দেখতে। আমি দেখতে ভালো না বলে বাবা আমাকে কোলা ব্যাঙ বলে—

—খুব অন্যায়! হাসি সামলে বন্দনা বলল দাদা এক রকমের সুন্দর, তুমি আর এক রকমের সুন্দর।

দাদা অর্থাৎ বহ্নিরও ভাইয়ের মতো কাছে আসার ইচ্ছে, এই স্নেহের স্পর্শ ওদের কাছে যেন নতুন। কিন্তু এগনো হল না, একবার দরজার দিকে তাকিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেল। বন্দনা ঠিক শোনেনি, মনে হল ভেতর থেকে ডাক এসেছে। আধ-মিনিটের মধ্যে দেখা গেল বড় ছেলেটা কিছু একটা হাতে নিয়ে বাইরের দরজার দিকে ছুটল।

দীপু বলল, দাদা তোমার জন্য চা আনতে গেল।

এইবার বন্দনার খটকা লাগল, একটু ভেবে জিজ্ঞেস করল, বাড়িতে তোমরা দুজন আর বাবা ছাড়া আর কে আছে?

দীপু তখনো তাকে খুটিয়ে দেখছে। চটপট জবাব দিল আর ভোলাদা আছে, ভোলাদা বাজার করতে গেছে।

বন্দনার মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে এলো, আর তোমাদের মা ?

মা-তো সেই কবেই সগ্‌গে চলে গেছে। দাদা বলে আমার তখন চার বছর বয়েস—কিন্তু মাকে আমার খুব মনে আছে—দাদার থেকেও মা আমাকে বেশি আদর করত তো—আমি কাঁদতাম তাই বাবা মিথ্যে করে বলত মা আবার আসবে—কিন্তু এখন আমি জানি মা আর আসবে না—মরে গেলে কেউ আর আসে না।···ঠিক না ?

বুকের তলায় মোচড় পড়ল বন্দনার, ঘরে হঠাৎ বাতাস কম মনে হল বড় ছেলেটাকে এবার ফিরতে দেখল, হাতে কেটলি—তাই ছুটতে পারছে না। বন্দনা চুপ একেবারে, আদর করে যে কিছু বলবে তা ও পাবা গেল না।

দরজার কাছে এসেই সুবীর রায় তার নায়িকার কোলের কাছে ছেলেকে দেখে প্রায় আঁতকে উঠল, এ কি। তার পরেই ধমক এই বাঁদর—একেবারে গায়ের ওপর গিয়ে উঠেছিস। সব্ শীগ গির—

নতুন নায়িকা হতে চলেছে, সামনে ডাইরেক্টর, বন্দনার উঠে দাঁড়ানোর কথা। সপ্রতিভ হাসি মুখে নমস্কার জানানোর কথা। কিন্তু এই মুহূর্তে কি রকম যেন সব গণ্ডগোল হয়ে গেল, ও-সব কিছু মনেই এলো না। তার দিকে সোজা চেয়ে বলল, ওকে বকছেন কেন, দেখছেন তো আমিই ধরে রেখেছি—

সুবীর রায় অপ্রস্তুত একটু, মুখে বিব্রত হাসি।—না, এ ছুটো যে কি বিচ্ছু জানেন না, একটু লাই পেলে একেবারে কাঁধে উঠবে। সর্বদা বাড়ি মাথায় করে আছে। বলতে বলতে কাছে এসে এবারে মোলায়েম করেই ছেলেকে বলল, সকাল বেলা তো একটু বই-টই নিয়ে বসতে হয়, দীপু বাবু, যাও—

ছেলেটা গাল ফুলিয়ে যেতে যেতে বলে গেল, হুঁঃ, রবিবারে বই নিয়ে বসব। দাদা বলেছে পিস-বোর্ড কেটে আজ আমাকে একটা

এরোপ্লেন বানিয়ে দেবে—

সুবীর রায় তৈরি হয়েই এসেছে। এখন পরণে ট্রাউজার্স, গায়ে টেরিলিনের শার্ট। এতে আগের থেকেও সুশ্রী আর স্মার্ট দেখাচ্ছে। সামনের সোফায় বসে বলল, চানে ঢুকতেই দেরি হয়ে গেল, আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম।

দরজার দিকে চেয়ে হাঁক দিল, কই রে বঙ্কি, চায়েব কি হল…

বন্দনা বলল এই বাচ্চাটাকে দিয়ে আবাব চা আনানোর কি দবকার ছিল—

বলতে বলতে চায়ের পেয়ালা আব কেটলি হাতে বঙ্কি হাজিব। সামনেব ছোট টেবিলটায় ওগুলো রেখেই ছুটে বেরিয়ে গিয়ে ডিসে কবে খানকয়েক বিস্কুট নিয়ে এলো। তাবপব ব্যস্ত-সমস্ত মুখে কেটলিব দিকে হাত বাড়াতে বন্দনা বলল দাঁড়াও তুমি অনেক কবেছ, আব কিছু করতে হবে না।—এটুকু আমি করি—

কেটলিটা তুলে নিয়ে দুটো পেয়ালাতেই চা ঢালল। দোকানের চায়ের বং দেখেই বন্দনার হয়ে গেছে। সৌজন্য রক্ষার দায় সারবে কি করে ভাবছে। বঙ্কি কাছেই দাঁড়িয়ে, দীপু আবার দরজার কাছে। ডিসে মোট চাবটে বিস্কুট, দুটো তুলে নিয়ে ওর দিকে তাকালো— এদিকে এসো।

এটুকুও অপ্রত্যাশিত। আসবে কিনা ঠিক করতে না পেরে ছেলেটা তার বাপের দিকে তাকালো। বন্দনা আবার বলল, বাবা কিচ্ছু বলবেন না, আমি ডাকছি, তুমি এসো—

বলার ধবনে এমন কিছু ছিল যাতে বাবাও ছেলেকে আসতেই ইশারা করল। দীপু কাছে আসতে বন্দনা আবার এক হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, আমার হাতে খাও।

শিশুর চাউনিতে এমন ভাল লাগা বিস্ময় বন্দনা আর বুঝি দেখেনি। বড় ছেলেটা চেয়ে আছে দেখে বলল, ডিসের ওই বিস্কুট দুটো তোমার—

ছেলেটা এগুলো না, বিস্কুটও নিল না। ঠোঁটে টিপটিপ হাসি।

—তোমার চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

বন্দনা হেসে বলল, আমি একটু ঠাণ্ডা চা খাই—তোমার বিস্কুট মুড়িয়ে যাচ্ছে।

ছোট ছেলেটা হি হি হি হি করে হেসে উঠল। হাসছে সকলেই। বঙ্কিকেও এগিয়ে এসে বাকি বিস্কুট ছুটো নিতে হল।

গলির বাইরে বড় রাস্তার ওপর ছু'-তিনটে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। পিছনে সীটে ছুজনে পাশাপাশি বসতে ট্যাক্সি ছাড়ল। বন্দনা বলল, সকালবেলা প্রথমেই মনটা খারাপ হয়ে গেল।…আপনার স্ত্রী কত দিন আগে মারা গেছেন?

ভদ্রলোকের মুখে বিষাদের ছায়া পড়ল একটু। – তা তিন বছর… ও ছুটোকে নিয়ে কি যে মুশকিল আমার।

সমবেদনার সুরে বন্দনা বলল, মা নেই, মুশকিল তো হবেই… তবে আপনার ছুটো ছেলেই খুব ভাল।

সুবীর রায় হেসে উঠল।—খুব চিনেছেন তাহলে, ছুটোই ধানী লঙ্কা—ছোটটাকে যাও সামলানো যায়, বড়টা যেমন পাজী তেমনি বদরাগী—ওর বয়সী পাড়ার ছেলেদের বাপ খুড়োরা প্রায় এসে নালিশ করে—খেলতে গিয়ে মারামারি লেগেই আছে—এই চারদিন আগে একটা ছেলেকে ধাক্কা মেরে ফেলে হাতের ছুটো আঙুলের হাড় ভেঙে দিয়েছে—সমস্ত দিনের কাজকর্মের পর বাড়ি এসে এ-রকম নালিশ শুনলে মাথায় খুন চাপে কিনা বলুন—

বন্দনা সশঙ্কে ফিরে তাকালো।—আপনি ছেলেটাকে খুব শাসন করলেন বুঝি?

সুবীর রায় ঈষৎ থমকে একটু ঘুরে তাকালো। জবাব না দিয়ে আবার সামনের দিকে দৃষ্টি ফেরালো।…সকালের এটুকু সময়ের মধ্যে যা দেখল তা কোন নতুন আর্টিস্টের ডিরেক্টরকে তোয়াজের চেষ্টা নয়। যেটুকু অভিজ্ঞতা তার, সে-রকম হলে বুঝতে পারত। তফাৎটুকু

কেবল অনুভব করার মতো। বড় একটা নিশ্বাসের সঙ্গে প্রসঙ্গ বাতিল করে বলল, যাক, এক্ষুনি এসে যাব, কাজের কথাটা সেরে নিই—ফোনে যা কথা হল, একটা কাঁচা কনট্রাক্ট আজই হয়ে যাবে হয়তো, আপনার টার্মস সম্পর্কে কি বলব ?

একটু চুপ করে থেকে বন্দনা জবাব দিল, এ লাইনের আমি কিছুই জানি না, আমার পক্ষে যা ভাল হয় তাই বলবেন।

একটু দ্বিধার সুরে সুবীর বলল, তবু একটু আভাস যদি দিতেন আপনি লাইনে নতুন তাই বলে রাখি, বাইরে থেকে আপনারা শোনেন হিরো হিরোইনরা বহু টাকা পায়—নাম হয়ে গেলে তা পায় সত্যি কথাই—কিন্তু একেবারে নতুন আর্টিস্টরা যা পায় সেটা নামী দামী আর্টিস্টদের ধাবে কাছেও নয়।

বন্দনা সামান্য ঘুরে তাকালো। ঠোঁটে হাসির আভাস।—দেখুন, কি পাব না পাব তা নিয়ে আমি ভাবিইনি কিছু। কিন্তু ওভাবে কথাটা তুললেন বলেই বলতে ইচ্ছে করছে, আনকোরা নতুন আর্টিস্ট হলেও অফারটা আপনাদের কাছ থেকেই এসেছে—নামী আর্টিস্টদের তুলনায় খুব পিছনে পড়ে থাকব মনে হলে এ-ধরনের অফার আসত না। আরো একটু হাসল।—থাক, শুধু দেখবেন প্রাপ্যটা অনামী আর্টিস্ট-এর পক্ষেও যেন অপমানজনক না হয়।

বাড়িতে ছেলে ছুটোর সামনে যা দেখেছিল সেটা রমণীর শাশ্বত রূপের একটা দিক। স্ত্রী বিয়োগের পর সুবীর রায় এটুকু কমই দেখেছে বা দেখেইনি। এ-কথার পব তারই মধ্যে সত্তার একটা ঋজু দিক চোখে পড়ছে। এও নিঃসন্দেহে ভাল লাগার মতো, কিন্তু প্রোডিউসারের কথা ভেবেই হয়তো ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি একটু।

আর কিছু বলার অবকাশ হল না। গন্তব্য স্থান এসে গেল। সুবীর রায়ের কথা-মতো ট্যাক্সি ফটক পেরিয়ে বিশাল বাড়ির সিঁড়ির পাশে দাঁড়ালো। প্রোডিউসারটি বড় অবস্থার মানুষ বোঝাই যায়। নাম জগমোহন কোঠারি। মস্ত বাড়ির গাড়িবারান্দার নিচে দুটো ঝকঝকে গাড়ি। সামনের বসার ঘরটা বড-সড় হলের মতো। তার

আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম। পাশেরটাও বসার ঘর তবে ছোট। বন্দনাকে সামনের ঘরে বসিয়ে সুবীর রায় পাশের ঘরে ঢুকে গেল। ফিরল প্রায় আট-দশ মিনিট বাদে। দেরী দেখে বন্দনার মনে হল টার্মস সম্বন্ধে কথাবার্তা চলছে।

ফিরে এসে ওকে কাচের দরজা দিয়ে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। মালিকের গদীর চেয়ারে বসে জগমোহন কোঠাবি। অঢেল বিত্তের মানুষটির নামের মতো ভারিক্কি চেহারা নয় আদৌ। পাতলা ছিপছিপে মানুষ, বয়েস পঁয়তাল্লিশের মতো, পরনে মিহি ধুতি, গায়ে নেটের গেঞ্জির ওপর গিলে করা পাঞ্জাবী, হাতে সোনার ঘড়ি, আঙুলে গোটা তিনেক আংটি। সৌজন্যের ত্রুটি নেই, বন্দনা ঘরে ঢুকতে জগমোহন কোঠাবি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত জুড়ে নমস্কার কবল। পবিষ্কার বাংলায় বলল, বসুন মিস মিত্র, সুবীর বাবুর কাছে আপনাব সব পরিচয় শুনলাম, আপনাদের মত এডুকেটেড মেয়েরা এলে ইণ্ডাস্ট্রির উপকার হয়। ফিরে বসে টেবিলের বোতাম টিপতে ঝকঝকে পোশাকের বেয়ারা হাজির।—চায়ে ভেজো।

বন্দনার বাধা দেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সুবীর রায় কিছু বলল না দেখে চুপ করেই রইল।

জগমোহন কোঠারি একটু ঝুঁকে অন্তরঙ্গ আলাপের সুরে বলল, পরশু আপনার 'ঘোলা জলের দাগ' দেখলাম। কথার ফাঁকে ওকে নিরীক্ষণ করছে. পছন্দটাও বোঝা যাচ্ছে।—আপনার অ্যাকটিং খুব ভাল লাগল, বাট আই কুড'ণ্ট লাইক দ্যাট্ ক্রুয়েল রিয়েলিটি—আপনি সুবীর বাবুর স্টোরিটা পড়েছেন ?

সুবীর রায় আগ বাড়িয়ে জবাব দিল, ওঁর কি ধরনের রোল সেটা বলেছি, পছন্দও হয়েছে—

—স্ক্রিপ্ট্ শোনালে পারতেন।

—শোনাব তো নিশ্চয়।…একটা স্ক্রিপ্ট আপনার কাছে আর কপিটা স্টুডিওতে, এর মধ্যে আনার সময় পেলাম না। মুখে

আত্মপ্রত্যয়ের হাসি।—আপনি ও-জন্যে ভাববেন না।

চা এলো। সঙ্গে এক প্লেটে কাজু বাদাম, অন্য প্লেটে বরফি জাতীয় মিষ্টি। এ-রকম পেয়ালা দেখলে চা খেতে ইচ্ছে করে। জগমোহন কোঠারির অনুরোধে বন্দনা চায়ের সঙ্গে দুই একটা কাজু বাদাম দাঁতে কাটল শুধু।

কোঠারি তার ডাইরেক্টারের দিকে ফিরল।—কথা-বার্তা বলে এখন একটা লেটার অফ এগ্রিমেণ্ট করে নিন—আর অ্যাডভান্সের একটা স্ট্যাম্প রিসিট করে নিন।

সুবীর রায় এবারে সোৎসাহে বন্দনার দিকে ফিরল।—শুনুন, কোঠারিজি খুব জেনারাস অফার দিয়েছেন বলতেই হবে···উনি প্রথমে বিশ হাজার দেবেন ঠিক করেছিলেন, নতুন আর্টিস্টের পক্ষে সেটা কম নয়, তবু, আপনি ট্যাক্সিতে আমাকে যে-কথা বলেছিলেন তাই শুনে উনি সেটা পঁচিশ হাজার করেছেন—অবশ্য আপনার আর একটু বাড়তি লাভ আছে যে সুবিধে নতুন আর্টিস্টরা পায় না—ওই পঁচিশের মধ্যে আপনাকে হাজার সাতেক দু'নম্বরে দেবেন—

—দু'নম্বর কি? না বুঝে বন্দনা জানতে চাইল।

কোটারি হেসে উঠল।—ইউ আর এ রিয়েল ফ্রেশার।

সুবীর রায় বোঝালো, দু'নম্বর মানে আঠারো হাজার টাকায় কণ্ট্রাক্ট হবে, আর সাত হাজার আপনি ব্ল্যাক পাবেন, তাতে আপনার ইনকাম ট্যাক্স কিছু বাঁচবে।

বন্দনা কোঠারির দিকে চেয়ে হাসি মুখেই অল্প অল্প মাথা নাড়ল। অর্থাৎ এই ব্যবস্থায় সে রাজি নয়।

সুবীর রায়ের মুখ শুকালো। কোঠারিও বিস্মিত একটু। জিজ্ঞেস করল, আপনার ডিমাণ্ড আরো বেশি?

বন্দনা অল্প একটু হেসে জবাব দিল, তা না, যা দেবেন সব এক নম্বরেই দেবেন, লেট দি ফার্স্ট কণ্ট্রাক্ট অফ লাইফ বি অল ইন হোয়াইট—ইনকাম-ট্যাক্স যা দেবার দেব।

কোঠারি ঝানু ব্যবসায়ী। এ-রকম কমই শুনেছে। সত্যিকারের

খুশি। উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল।

বন্দনা নিজের হাত বাড়াতে সে ছুটো ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, ইট উইল বি অল হোয়াইট দেন, উইশ ইউ ভেরি ভেরি গুড লাক। আমি এক্ষুণি ব্যবস্থা করছি—

সই সাবুদ চুকিয়ে আধ-ঘণ্টার মধ্যে ছজনে এবার কোঠারির গাড়িতে। ভদ্রলোক নিজেই গাড়ি দিয়েছে। বন্দনার ছোট ভ্যানিটি ব্যাগে দশ হাজার এক টাকার চেক। এটা সাইনিং অ্যাডভান্স, চুক্তিতে লেখা শুটিং চলা কালে তিন কিস্তিতে আরো পনের হাজার টাকা দেওয়া হবে। প্রাপ্তি যোগ কিছু সুবীর রায়েরও হয়েছে, তাকেও একটা চেক পকেটে পুরতে দেখেছে। বন্দনা সব রেডি হবার ফাঁকে পাশের বসার ঘরে এসে সুবীর রায় খুশি মুখে বলছে, আগে আপনাকে চার হাজার অ্যাডভান্স হোয়াইট দেবার কথা ছিল, কোঠারিজি দশ হাজারই হোয়াইট অ্যাডভান্স করে দিচ্ছে—বাকিটা আপনি ছবি হতে হতে ইনস্টলমেণ্টে পাবেন—ভদ্রলোক আপনার ওপর খুব ইম্প্রেসড্...

অভিনয় জগতে কারো খুব ইম্প্রেসড হওয়ার ব্যাপারে একটু সজাগ থাকার দায়িত্ব আছে বন্দনা জানে। শুনে মৃদু হেসেছে শুধু। কিন্তু ভিতরে ভিতরে এভাবে দশ হাজার টাকা পাওয়ার কিছু রোমাঞ্চ অনুভব করছেই।

আসার সময় সুবীর রায় কোঠারির কাছ থেকে স্ক্রিপ্টটা চেয়ে এনেছিল। ওটা তার হাতে। বলল, আমার বাড়ি তো পথেই পড়বে, আপনি গাড়িতে ছু'মিনিট বসবেন, এটা রেখে আপনাকে আমি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি—

বন্দনা তক্ষুনি বাধা দিল, পৌঁছে দেওয়ার দরকার নেই, আপনি নেমে যাবেন, আমি চলে যাব।

—তা কি হয়, আপনি এখন আমার মেন আর্টিস্ট...এরপর শুটিং-এর দিন আপনাকে আনা-নেওয়ার দায়িত্বও প্রোডিউসারের। তাছাড়া আপনাকে পৌঁছে দিয়ে এই গাড়ি নিয়ে আমাকে চলে যেতে হবে স্টুডিওতে, সেখানে কতগুলো কাজ পাকা করে কোঠারিকে খবর

দিয়ে আমাব বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেলা তিনটে—ডাইরেক্টবের ওপব দিয়ে কত যে ধকল যায যদি জানতেন. এ তো সবে শুরু

বন্দনাব মুখ দিয়ে আপনি বেবিয়ে গেল তাহ'ল ছেলে ছুটোর দেখা-শুনা খাওয়া-দাওয়া ?

তাব ছেলে ছু'টাব জন্য এই উৎকণ্ঠা সুবীব বায়েব কত যে ভালো লাগল সে ই জানে। জবাব দিল, সে কি আব আমাব দেখা-শুনার সময় হয নাকি. যা পারে নিজেবাই কবে, একটা কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড-এব মতো আছে. তাব দয়া-দাক্ষিণ্যাব ওপর ভবসা ওদেব।

বন্দনা চুপ কবে বইল। আবাব ও বাড়িব দিকে যাচ্ছে বলেই বড ছেলেটাব আগুন-পানা মুখ আব ছোট ছেলেটাব তুষ্টু-তুষ্টু মিষ্টি চাউনি চোখে ভাসছ। এমন একটা কনট্রাক্ট হয়ে গেল কিন্তু আপাতত তবু সিনেমা মাথায নেই কি মনে পডতে হাসিই পেয়ে গেল বন্দনাব—তেমন ফর্সা না হলেও এমন মিষ্টি মুখ ছোটটাবও, অথচ বাবা নাকি ও ক কোলা ব্যাঙ বলে।

রাস্তাব একদিকেব দোকানগুলোব দিকে চোখ বেখে চলল। পাশের লোকেব কথা ভেবে যেটুকু দ্বিধা মনে এসেছিল ঝেড়ে ফেলল। বন্দনা মিত্র কাবো তোয়াজ তোষামোদেব ধার ধারে না সেটা এই লোক কাজ শুরু হলে বুঝবে।

যা খুঁজছে তা ওই সামনে।—গাড়িটা একটু দাঁড কবাতে বলুন তো ।

—নামবেন ?

—হঁ্যা আগে দাঁড়াতে বলুন—

বাস্তা ঘেঁষে গাড়িটা দাঁড়াতে বন্দনা দরজা খুলে নামতে নামতে বলল আপনি বসুন. আমি এক্ষুনি আসছি।

পাশাপাশি ছুটো বড দোকান একটা স্টেশনারিব, একটা মিষ্টিব। স্টেশনাবী দোকানে ঢুকে বন্দনা প্রথমে এক বাক্স দামী বিস্কু, আব ছুটো বড চকোলেট কিনল। বেরিয়ে এসে মিষ্টিব দোকান থেকে এক বাক্স সন্দেশ নিল।

আবার গাড়ি চলতে সুবীর রায় হেসে মন্তব্য করল, আজ আপনার সেলিব্রেট করার দিন খেয়াল ছিল না—

বন্দনার ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসি।

গাড়ি গলির মুখে থামতে স্ক্রুপ্ট ফাইল হাতে সুবীর রায় নামতে নামতে বলল, এক মিনিট বসুন, যাব আর আসব।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্দনাকেও নামতে দেখে অবাক। আরো অবাক সিটের পিছন থেকে কেনা জিনিসগুলো হাতে নিতে দেখে।—এ কি!...আপনি কি—

—যত কথা বলবেন ততো সময় নষ্ট, চলুন।

বন্দনা তার আগেই এগুলো। আর আগেই বাড়ির দরজায় পৌঁছুল। সুবীর রায় পিছন থেকে এসে তাড়াতাড়ি কলিং বেল টিপল। এবারে যে দরজা খুলল সে-ই বোধ হয় কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড ভোলা। তার পিছন থেকে দীপু লাফিয়ে এগিয়ে এলো। বাবার সঙ্গে বন্দনাকে দেখে এক মুখ হাসি।—তুমি আবার এসেছ?

বড় ছেলেটা অদূরে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসছে। ওদের বাবা বলল, শুধু আসা—তোদের জন্য কত কি এনেছেন ছাখ্—

বন্দনা সেই বসার ঘরেই এসে বসল। প্রথমে ঠোঙা থেকে চকোলেট ছুটো বার করে ছুজনের হাতে দিল।—এগুলো পরে খাবে। বিস্কুটের প্যাকেট খুলে ঝকমকে বাক্সটা বক্কির দিকে বাড়ালো।—এটা তোমাদের ছুজনের।

ছেলেটা কি করবে ভেবে না পেয়ে বাপের দিকে তাকালো।

পলকা ধমকের সুরে বন্দনা বলল, কথা বলছি আমি, ও-দিকে তাকাচ্ছ কি, ধরো।

নিল। দরজার আড়ালে কাজের লোকটা দাঁড়িয়ে। বন্দনা তাকে বলল, ছুটো ডিস আর ছু' গেলাস জল নিয়ে এসো তো।

সন্দেশের বাক্সর ফিতে খুলতে খুলতে ডিস গেলাস হাজির। সন্দেশের সাইজ দেখে দীপু বলেই উঠল, ওরে—ব্বাস্!

বন্দনা উঠে একটা গ্লাস নিয়ে পাশের জানালায় একটু হাত ধুয়ে

আবার বসল। ডিস দুটোয় দুটো সন্দেশ তুলে বলল, একটু বাদে ভাত খাওয়ার সময়, এখন একটা করে খাও। একটা ডিস বঙ্কির দিকে বাড়িয়ে দিল, এখানে বসে খাও—তার আগে হাত ধুয়ে নাও। দ্বিতীয় ডিসটা বাঁ-হাতে তুলে দীপুর দিকে তাকালো। এটা ?

ডগমগ মুখ করে ও হাত বাড়ালো।—এটা আমার।

ডিসটা নিজের আর একটু কাছে সরিয়ে নিয়ে বন্দনা হাসি মুখে ইশারায় আরো অনেক কাছে আসতে বলল। বাপের মুখে বিরক্তির ছায়া না দেখে দীপু একেবারে গা ঘেঁষেই দাঁড়ালো। বন্দনা ডিসটা কোলের ওপর রেখে বাঁ হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে সন্দেশ ভেঙে খাওয়াতে লাগল।

বন্দনার বুকের তলায় আবারও মোচড় পড়ছে। সকালে নিজের হাতে বিস্কুট খাওয়াবার সময় যেমন দেখেছিল, শিশুর চোখের সেই ভাল লাগা বিস্ময় এখন চারগুণ হয়ে উপছে পড়ছে। বন্দনা মুখ তুলে দেখল তার বাবা ছেলেটার দিকে চেয়ে আছে, তার চোখের দু'কোণ চিকচিক করছে।

সন্দেশ চিবুতে চিবুতে দীপু বলল, তুমি খু-উ-ব ভাল।

হাসি চেপে বন্দনা বলল, আমাকে তো কেউ ভাল বলে না।

বড় ছেলে বঙ্কির সন্দেশ খাওয়া থেমে গেল।—কে ভাল বলে না। তার নাম বলো—

ওর দিকে চেয়ে বন্দনা সত্যি অবাক। দশ বছরের ছেলের চোখের কোণে যেন আগুনের ঝিলিক। বাপ বলেছিল ছেলেটা বদ রাগী! কিন্তু এই মুখের দিকে চেয়ে বন্দনার মনে হল নাম জানলে ও তার মাথাটা ছিঁড়ে আনতে চেষ্টা করতে পারে।

দীপুর সন্দেশ ফুরিয়ে এসেছে, তার নজর এখন সন্দেশের বাক্সটার দিকে। বলেই ফেলল, আমি আর দাদা আধখানা করে আর একটা সন্দেশ খেতে পারি—

বন্দনা ভাবল ভাত না হয় কম খাবে, জিগ্যেস করল, আধখানা করে না একখানা করে ?

অনুমতির আশায় দীপু তার দাদার দিকে তাকালো। খাবার ইচ্ছে ওরও যে নেই মনে হল না বন্দনার। কিন্তু শাসনের সুরে আগে ভাইকে বলল, তুই একটা হ্যাংলা !···আধখানা করেই দিন—

বন্দনা তাই করল। ওদিকে দেরি হচ্ছে, কিন্তু এই ভাল লাগার স্বাদও জানা ছিল না।

—তুমি সন্দেশ খাবে না ? খেতে খেতে দীপুর প্রশ্ন।

—নাঃ, মিষ্টি খেতে আমার তেতো লাগে।

শুনে দীপু প্রথমে হাঁ, তারপর খিলখিল হাসি। মুখের কয়েক কণা সন্দেশ বন্দনার শাড়িতে ছিটে এলো। সঙ্গে সঙ্গে দাদার শাসন, এই দীপু—মুখেরটা গায়ে যাচ্ছে যে !

দীপু অপ্রস্তুত। গায়ের কোথায় লেগেছে না জেনেই বন্দনার কোলের কাছটা হাত দিয়ে দু'বার ঝেড়ে দিল। বাবাকে ঘরে ঢুকতে দেখে আবার জিগ্যেস করল, বাবা আর ভোলাদা সন্দেশ খাবে না ?

বন্দনার মনে পড়ল, কাজে বেরিয়ে ফিরতে বেলা তিনটে হবে বলেছিল। বিবেচনার দিকটা ভাবলে তাকেও এক ডিস সাজিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু পরক্ষণে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। বারো মাস যা অভ্যেস তাই করবে, ছেলে দুটোর মায়ায় যা করছে তা-ই বেশি। নির্লিপ্ত মুখ করে বলল, তোমাদের জিনিস তোমাদের ইচ্ছে হলে দেবে—

এই বাড়িতে এসে বাবাকে তেমন একটা পাত্তা দেয় না ছেলে দুটো এ-ও বোধ হয় এই প্রথম দেখল।

গাড়িতে বসে সুবীর রায় হেসে বলল, আপনি নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনলেন—বড়টা অন্য রকমের পাজি, কিন্তু কোন মেয়ে দেখতে শুনতে ভাল হলেই ছোটটা তার কাছ ছেড়ে নড়তে চায় না, আপনি তো দুটোকে একেবারে মাথায় তুলে দিয়ে এলেন।

আসার সময় দীপু সত্যি বন্দনার আঁচল ছাড়তে চায়নি, আবার শিগগীরই আসবে কথা দিতে তবে ছেড়েছে। বন্দনার রসিকতার জিভ সাধারণত কম ধারালো নয়। তেমন হৃদ্যতা থাকলে আলতো

করে জিগ্যেস করত, ছেলে তার বাপের গুণ পেয়েছে কিনা। কোণ ঘেঁষে চুপচাপ বসেই থাকল।

বাড়ির দরজায় প্রোডিউসারের অত বড় ঝকঝকে গাড়িটা এসে দাঁড়াতে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাদা বউদি দুজনেই দেখল। গাড়ি থেকে নেমেই বন্দনার দু'চোখ আপনা থেকেই দোতলার দিকে উঠেছিল।

সুবীর রায়ও গাড়ি থেকে না নেমে ভিতরে বসেই বিদায় নিলে বন্দনা স্বস্তি বোধ করত। কিন্তু ও নামার পর সে-ও হাসি মুখে নেমে দাঁড়ালো। বাড়িটা এক নজর দেখে নিতে গিয়ে তারও দোতলার বারান্দার দিকে চোখ গেল। এদিকে এক তলার বসার ঘরের দরজা খুলে নিভা নির্বাক বিস্ময়ে ঝক ঝকে মস্ত গাড়িটা আর সেই সঙ্গে গাড়ির মালিক ভেবে ভদ্রলোককেও ভালো করে দেখে নিচ্ছে।

বন্দনার মনে হল আপ্যায়ন জানালে এই অবেলাতেও ঘরে এসে দশ-বিশ মিনিট বসে যেতে আপত্তি করবে না। ডাকলে দাদা বউদির সঙ্গে আলাপ করতেও চাইতে পারে। কিন্তু বন্দনা এ-ভব্য-তার ধার দিয়েও গেল না। সহজ হাসি মুখেই দু'হাত জুড়ে নমস্কার জানিয়ে বলল, এত বেলায় আপনাকে আর আটকাবো না— এ দিকে বাড়ির লোকও আমার অপেক্ষায় বসে আছে দেখছি—

সুবীর রায় বলল, ঠিক আছে, আপনার সঙ্গে নেক্সট কবে দেখা হচ্ছে... ?

—বলুন ?

...স্ক্রিপ্টটা একবার ভালো করে শোনা দরকার আপনারও নতুন আইডিয়া কিছু মাথায় এলে বলবেন. আমার অবশ্য দিনকতক এখন নিশ্বাস ফেলার সময় থাকবে না. সতের ব্যাপারে ছোটাছুটি করতে হবে···তাহলেও গল্পটা আপনার মাথায় বসে যাওয়া দরকার...আপনি আমার ওখানে যাবেন না আমাকেই আসতে হবে ?

এ-ভাবে বলার একটাই অর্থ যে তার বাড়িতে বসেই স্ক্রিপ্ট শুনলে ভালো হয়। ফলে বন্দনারও জবাব দেবার সুবিধে হল। বলল,

এত ব্যস্ততার মধ্যে আপনি আবার আসবেন কেন, যেদিন বলবেন আমিই যাব—কবে যেতে হবে আপনি বরং একটা টেলিফোন করে জানিয়ে দেবেন।

—সেই ভালো, নমস্কার।

সুচারু ব্যস্ততায় গাড়িতে উঠে বসল। বন্দনা আর সেদিকে তাকাল না, দোতলার দিকেও না। ওকে এগোতে দেখেই নিভা সরে দাঁড়িয়েছে। বসার ঘরের ভিতর দিয়ে বন্দনা ধীরে সুস্থে দোতলায় উঠতে লাগল।

যা আশা করেছিল তাই। গ্রুপ থিয়েটারের লোক অনেক সময়েই ওর কাছে আসে এটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু তাদের দরিদ্র দশা বাড়ির কারো অজানা নয়। এখন যাদের সঙ্গে কাজ করছে তারা ওকে হাত খরচ বাবদ নাম মাত্র কিছু দেয়। থিয়েটারের নেশায় বন্দনার উল্টে তবিল থেকে কিছু খরচ হয়ে যায়। তবিল বলতে বাবার দেওয়া বিয়ের টাকা। তার চেক বই পাশ বই সব নিজের কাছেই। এর মধ্যে এতবড় একটা ঝকঝকে গাড়ি থেকে ওকে নামতে দেখে দাদা বউদি বেশ অবাক হবে তাতে আর সন্দেহ কি! বোববারে বেরুলো চাকরির খোঁজে আর ফিরল এ রকম একটা গাড়িতে। ফলে বউদি বারান্দা ছেড়ে ভিতরের বারান্দার সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে, দাদা তার ঘরের দরজার কাছে। ওদিকে ছোড়দাও তার ঘরে বসে ওই গাড়ি থেকে বোনকে নামতে দেখেছে হয়তো। সেও তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাছাড়া ছুটির দিনের দুপুরে সকলে একসঙ্গে খায়, ডাক পড়তে এত দেরি দেখেও বেরিয়ে এসে থাকতে পারে।

বন্দনা জানে সব থেকে বড় ফয়সলা এখনো বাকি। এই মুহূর্তে তবে আসর প্রস্তুত দেখে মনে মনে নিজেও প্রস্তুত। দোতলায় পা দিয়ে একটু বিব্রতভাব মুখে টেনে বউদিকে বলল, দেরি হয়ে গেল… আমার জন্য সবাই বসে আছ নাকি?

বউদি জবাব দিল, হ্যাঁ, এত দেরি দেখে সবাই ভাবছিল।..ত

কি ব্যাপার, রোববারে চাকরির খোঁজে বেরুলে আর অমন একখানা গাড়িতে করে ফিরলে...চাকরি-টাকরি দিয়ে একেবারে পৌঁছে দিয়ে গেল নাকি ?

বেশ খুশি মুখে বন্দনা জবাব দিল, একেবারে ঠিক ঠিক আঁচ করেছ, চাকরি হল, পৌঁছে দিল, আর তার আগে অ্যাডভান্সও দিয়ে দিল—

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে চেকটা বউদির সামনে ধরল। চেকটা হাতে নিয়ে টাকার অঙ্ক দেখে বউদির চোখ ঠিকরে পড়ার দাখিল। বিশ্বাস করবে কিনা ভেবে পাচ্ছে না। চেক হাতে ফ্যালফ্যাল করে বন্দনার দিকে তাকালো।—দশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স...কি ব্যাপার।

অতটাই অবাক না হলে চেক সইয়ের নিচে সিনে প্রোডাকশনের নামের সীল চোখে পড়ত। টাকার অঙ্ক শুনেই ছোড়দা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বউদির হাত থেকে চেকটা নিল। তারপর সে-ও ভীষণ অবাক।—এ তো ফিল্ম প্রোডাকশনের চেক দেখছি...তুই কোন ছবিতে নামতে যাচ্ছিস নাকি ?

বন্দনা জবাব দেবার ফুরসত পেল না। গম্ভীর মুখে এবারে দাদা এগিয়ে এসে ছোড়দার হাত থেকে চেকটা নিয়ে পড়ল। ভুরুর ওপর ভাঁজ পড়তে থাকল।—এ সব কি ব্যাপার ?

—একটা ছবির কনট্রাক্ট সই হল, এটা তার অ্যাডভান্স।

দাদা যত রেগে যায় তার গলার স্বর ততো শমে নামে কিন্তু ডবল মোটা হয়।—তুই তাহলে সিনেমায় নামতে যাচ্ছিস—কনট্রাক্ট সই করার আগে আমাদের মতামত জানারও দরকার মনে করিস না ?

বন্দনা বলতে পারত সে যথেষ্ট সাবালিকা হয়েছে, ওর নিজের মত বা বিবেচনাই যথেষ্ট। কিন্তু বলে লাভ কি, হেসেই জবাব দিল, থিয়েটার করলে আর সিনেমা করতে দোষ কি, এতে নাম করতে পারলে সব দিক থেকে লাভ।

রাগে দাদার মুখ লাল।—না দুটো এক জিনিস নয়, তোর থিয়েটার করাও আমরা পছন্দ করি না, সিনেমার লাইফ আরো

ইরেগুলার হতে বাধা, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুটিং হয়ে—আউট-ডোরের কাজে যখন তখন বাইরে যেতে হয় !

এবারে বন্দনা ঠাণ্ডা মুখে জবাব দিল, ফাস্ট লাইফ যে লিড করতে চায় সিনেমা থিয়েটার না করলেও তাকে ঠেকানো যায় না—তাছাড়া নাটকের নাম হলেও গ্রুপ থিয়েটারকেও দল নিয়ে বাইরে যেতে হয়।...তার থেকে আমার দায়িত্ব তোমরা যদি আমার ওপরেই ছেড়ে দাও দাদা তাহলে এই প্রথম কাজটা আমি ঠাণ্ডা মাথায় করতে পারি।

গম্ভীর মুখে দাদা এগিয়ে এসে চেকটা ওর হাতে দিল।—ঠিক আছে।—ঠিক আছে, আমরা বুঝে নিলাম আজ থেকে তোমার সম্পর্কে আর আমাদের কোনরকম দায়িত্ব থাকল না। কিন্তু একটা কথা জেনে রাখা দরকার এ বাড়িতে থেকে সিনেমা থিয়েটার করার ফলে আমরা কোনভাবে ডিসটারবড হতে রাজি নই।

থমথমে মুখে পর্দা ঠেলে নিজের ঘরে ঢুকে গেল। তার শেষের কথা ক'টা শোনামাত্র বন্দনা তেতে উঠেছিল একটু। বাবা কোনরকম উইল করে যায়নি যখন, এ-বাড়ির এক তৃতীয়াংশের মালিক সে-ও। কিন্তু দাদার কথা বন্দনা হজম করেই গেল। আপাতত কোন কারণে মাথা গরম করতে রাজি নয়। তক্ষুনি ঠিক করে ফেলল, সময় বুঝে এ-বাড়ি ছেড়ে চলেই যাবে। হাতে টাকার জোর থাকলে আজকাল আর মেয়েদের থাকার জায়গার অভাব হয় না।

দাদার পিছনে বউদিও চলে যেতে ছোড়দা পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে এলো।—কত টাকার কনট্রাক্ট রে এটা ?

—পঁচিশ হাজার। সোজা চোখে চোখ।—এবারে তুমি কিছু মতামত দেবে নাকি ?

—নাঃ, কনট্রাক্ট সই করে একেবারে অ্যাডভান্স নিয়ে এসেছিস যখন, মতামত দিয়ে আর কি লাভ।...তবে এ-লাইন আমারও পছন্দ নয়, বুঝে শুনে চলিস।

বন্দনা নিজের ঘরে এসে নিজের খাটে বসে একটু দম নেবার

আগেই নিভা আস্তে আস্তে পর্দা সরিয়ে উদ্ভাসিত মুখে ভিতরে এসে দাঁড়ালো।—দিদিমণি, তুমি সিনেমা করতে যাচ্ছ? দশ হাজার টাকা আগাম পেয়েছ তার জন্য?

রাজ্য জয় করে সিংহাসন পেয়েছে শুনলেও ওর মুখে এর থেকে বেশি চাপা উত্তেজনা দেখা যেত কিনা বলা যায় না। হাসি চেপে আর ভুরু কুঁচকে বন্দনা জিগ্যেস করল, এরই মধ্যে তোমাকে কে বলল?

—বাঃ! নিভার মুখ কাচ মাচু একটু।—সিঁড়ির বাঁকে দাঁড়িয়ে আমি সব শুনলাম যে!

বন্দনা হেসেই ফেলল।—বেরোও এখন ঘর থেকে!

—যাচ্ছি যাচ্ছি—আমাকে কিন্তু শুটিং দেখাতে হবে—তুমি কিচ্ছু ভেব না দিদিমণি—আমি ঠিক ঠিক সময়ে তোমার খাবার দাবার ব্যবস্থা আর সব গোছগাছ করে দেব—তুমি শুধু আগে থাকতে আমাকে হুকুম করবে।

আবারও দাবড়ানি খাবার আগে এক-রকম ছুটেই চলে গেল।

॥ তিন ॥

বন্দনা মিত্রর অভিনয় জীবন কিছু বর্ণালি চমকের মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিল, আর ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও কারো অনুজ্জ্বল মনে হয়নি। ফ্লোরে শুটিং-এর আগে প্রাক প্রচারের ঢাক-ঢোল সুবীর রায় আর তার সাগরেদরা চড়া মেজাজেই বাজিয়েছে। সিনেমার কাগজে ঢের আগে থাকতেই ছবি বেরিয়েছে, বলা বাহুল্য, সে-ছবি বন্দনার পছন্দ হয়নি। কিন্তু প্রচারের বহর দেখে কখনো মজা পেয়েছে, কখনো বিব্রত বোধ করেছে।

·· শুটিং শুরু হওয়ার দু'মাসের মধ্যে দাদাদের বিশেষ করে দাদার আর বউদির স্পষ্ট বিরক্তি দেখে বন্দনা একটা মোটামুটি ভাল হোটেলে একটা আলাদা ঘর ভাড়া নিয়ে চলে এলো। সকালে বেরুতে হয়, সন্ধ্যার পর ফেরে। দুপুরে স্টুডিওতেই খাওয়ার ব্যবস্থা। কোন দিন

আবার বিকেল তিনটেয় শুটিং শুরু হয়ে রাত দশটায় শেষ। কোম্পানি এ-জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করেছে। নিয়ে যায়, পৌঁছেও দেয়। কিন্তু তাইতেই ব্যাপারটা দিনকে দিন যেন অসহ্য হয়ে উঠছে তাদের কাছে। কোনো ঝগড়াঝাটি বা শাসনের বড় ব্যাপার ঘটার আগেই নিজের ব্যবস্থা করে নিল। বাড়ির এই আবহাওয়ার দরুণ তার নিবিষ্টতায় ছেদ পড়ছিল।

দাদা গম্ভীর মুখে শুনেছে, ভালো-মন্দ একটি কথাও না বলে গম্ভীর মুখেই সামনে থেকে চলে গেছে। ছোড়দাও তেমন জোরালো আপত্তি তোলেনি। তবে মুখে বলেছে, একেবারে বাড়ি ছেড়ে চললি—দাদা তো রেগেমেগে বলছে এর পর তোর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না—তোর চলেই যাবার মতো এমন কি হয়েছে?

কিন্তু দাদার যে এ কথা বলার অধিকার নেই, এ বাড়িতে ওরও সমান অংশ এ-কথা ছোড়দাও বলল না। কিন্তু বন্দনার মন এমনি স্থির আর আত্মবিশ্বাস এতই অটুট যে এ নিয়ে আর কোনো উত্তাপ সৃষ্টি করতে চাইল না। হেসেই জবাব দিল, কিছুই হয়নি, আমারই অসুবিধে হচ্ছিল....আর দাদার কথাও মনে রাখতেই চেষ্টা করব।

কিন্তু বন্দনা মুশকিলে পড়েছিল নিভাকে নিয়ে। সে কেঁদে-কেটে অস্থির। আর কেবল এক বায়না, ওকেও নিয়ে যেতে হবে, দিদিমণি সে-ও আর এ-বাড়িতে থাকবে না। বন্দনা অনেক বুঝিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করেছে। বলেছে, একজনের একটা ঘর মাত্র ভাড়া নেওয়া হয়েছে, সেখানে দু'জনের থাকা চলবে না। দেখেশুনে এরপর ভালো ব্যবস্থা কিছু করতে পারলে বন্দনা অবশ্যই তাকে ডেকে নেবে। কক্ষনো ভুলবে না।

তবু নিভা সঙ্গে এসে তার হোটেলের ঘর দেখে গেছে। আর বার বার করে কথা আদায় করেছে যত শিগগীর হোক তাকে ডেকে নেওয়া হবে। বন্দনা তাকে আশ্বাস দিয়েছে, এ ছবিটা শেষ হয়ে যাক, পরের ছবি কন্ট্রাক্ট হলেই সে-ব্যবস্থা হবে।

আর বাড়ি ছেড়ে হোটেলে ঘর নিতে দেখে অবাক হয়েছিল তার

পরিচালক সুবীর রায়।…বন্দনার ধারণা মনে মনে একটু খুশিও হয়েছিল। তবু জিগ্যেস করেছিল, আপনার দাদাদের অনুমতি নিয়েই তো এ-লাইনে এসেছেন, তাহলে বাড়ি ছাড়ার কি হল ?

বন্দনা হেসেই মাথা নেড়েছে।—অনুমতি নিয়ে নয়। আমার থিয়েটার করার ব্যাপারেও তাদের আপত্তি ছিল। তবে বাড়ি ছাড়তে আমাকে কেউ বলেনি, আমারই অসুবিধে হচ্ছিল।…সিনেমা লাইনে না এসে কোনো চাকরি করলেও স্বাধীনভাবে থাকার জন্য আমি বাড়ি ছাড়তাম।

এর পরে আর কথা কি। সুবীর রায় পরদিন শুটিংয়ের পরেই সঙ্গে এসে তার হোটেলের ঘর দেখে গেছে। খুব অপছন্দ হয়নি। এরই অনেক ভাড়া। তাছাড়া এখানে আরো অনেক অবাঙালী চাকুরে মেয়ে ঘর ভাড়া নিয়ে আছে। ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে সে আর একটু সুব্যবস্থা করে গেল। টেলিফোনের একটা এক্সটেনশন লাইন তার ঘরে দেবার ব্যবস্থা করল। এর খরচ খুব বেশি নয়, তবে কল্‌-চার্জ আলাদা। যতদিন ছবি চলবে টেলিফোনের সব চার্জ প্রোডাকশন অ্যাকাউন্টে যাবে শুনে বন্দনা আপত্তি করল না। তারপর হেসে আরো উৎসাহের কথা বলল সুবীর রায়।—এরই মধ্যে যে-রকম নজর কেড়েছেন সকলের, এ-ছবির পর এর থেকে ঢের ভালো হোটেলেই আপনি থাকতে পারবেন।

স্টুডিও মহলে বন্দনা নিজে অবশ্য কোন রকম চমক সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেনি। কিন্তু এই মহলটাই বোধ হয় চমক আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে। শুরু থেকে তার অতি সহজ সচ্ছন্দ আচরণের মধ্যেই সকলে চমক দেখেছে। 'ব্যক্তিত্ব' ছবির নায়িকার চলনে-বলনে হাসিতে চাউনিতে ব্যক্তিত্ব উপছে পড়তে দেখে অনেকে। তাছাড়া বিদ্যার সঙ্গে রূপের যোগ সর্বত্রই কিছু ব্যতিক্রম। এই মহলে সেটা সব থেকে বেশী। নামী এবং কিছু দামী অভিনেত্রী মনে মনে আঁচ করতে চেষ্টা করেছে এই একজন ভবিষ্যতে কতটা জায়গা জুড়ে বসতে পারে। অন্য প্রযোজক আর পরিচালকরাও যে পরোক্ষে লক্ষ্য রাখছে

বন্দনা তা-ও অনুভব করতে পারে। এ-মহলের এটাই রীতি। নামী অভিনেতাদেরও ওর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের মার্জিত তৎপরতাটুকুও বন্দনার উপভোগ্য মনে হয়েছে। তার বিপরীতে যে ভদ্রলোক অভিনয় করছে সে-ও মোটামুটি নামী অভিনেতাই। শুরু থেকেই তার ওকে সাহায্য করার আগ্রহ। প্রায়ই বলত, গোড়ায় পোড়ায় অনেক রকমের অসুবিধে হয়ই, কিছু ঘাবড়াবেন না।

কিন্তু সুবীর রায়ের তা চক্ষুশূল। একদিন ব্যঙ্গের হুল বিঁধিয়েই তার মুখ বন্ধ করেছে। বলেছে, নিশ্চিত হওয়া গেল, আমার তো মনে মনে ভয় ছিল, ওর সঙ্গে অভিনয় করতে গিয়ে আপনি না ঘাবড়ে যান।

কিন্তু যত দিন যায় বন্দনা মুশকিলে পড়তে লাগল তার পরিচালক সুবীর রায়কে নিয়েই। শুরু থেকেই বুঝেছে মানুষটা কিছুটা আত্মাভিমানী, গল্প নিয়ে কিছু সাজেশান দিতে গেলে আঁতে লাগে। বলে, দর্শক কি নেবে সেটা মাথায় রেখেই আমি সব করেছি, তোমার সাজেশন ভেবে দেখব, কিন্তু ও নিয়ে বেশি মাথা না ঘামিয়ে তুমি শুধু মনে-প্রাণে ওই ছবির নায়িকা হয়ে যাও—

তার ছেলে ভুটোর দৌলতে অনায়াসে সে আপনি থেকে তুমিতে চলে এসেছে। ওরা এখন ওকে মাসি বলে। বাপই শিখিয়ে দিয়ে থাকবে। ওদের টানে যেতে হয়, আবার অভিনয়ের বা স্ক্রিপ্ট অদল বদলের আলোচনা নিয়েও ডাক পড়ে। শুটিং না থাকলে ওর হোটেলে কোথাও থেকে ফোন করে।

মিউজিক ডাইরেক্টরের আসরও সুবীর রায়ের বাড়িতেই বসে। প্লেব্যাকের গায়িকারা আসে, তখনো ফোন যায়।—একবার এলে ভাল হয়, পর্দায় তো তোমার মুখেই গান হবে—কান রপ্ত হলে সুবিধে।

ওকে বাড়িতে ডাকার ব্যাপারে ঘন ঘন ফোনে তাগিদ দিতে বোধহয় একটু চক্ষু লজ্জাও হয়। তখন সে-কাজটা করে তার প্রধান সহকারী মাধব ঘোষ। এ লোকটাকে বন্দনা আবার একটুও পছন্দ

করে না। ছলে-বলে ওর সঙ্গে কথা-বার্তার চেষ্টা। গোড়ায় গোড়ায় সে-ও এই নতুন আর্টিস্টের সামনে সোনার ভবিষ্যতের ছবি তুলে ধরত। বলত, এ ছবির পর আপনাকে আমরা কোথায় তুলে নিয়ে যাই দেখুন না। কিন্তু বন্ধনার ব্যক্তিত্বের ফলেই হোক আর খুব একটা প্রশ্রয় না পাবার দরুন হোক অথবা স্বয়ং পরিচালকের এই নতুন আর্টিস্টের প্রতি আগ্রহ দেখে হোক—এখন তোয়াজ তোষামোদের পথটাই বেছে নিয়েছে। বন্দনাকে দেখলেই ম্যাডাম-ম্যাডাম করে, কোনো একটা শট্ শেষ হবার পর প্রশংসায় আর উচ্ছ্বাসে গদগদ হয়। সুবীর রায়ের আবার এই সহকারীটির ওপর খুব আস্থা। মাধব ঘোষ ও. কে. বললেই সেটা ও. কে.। কিন্তু হঠাৎ খেয়াল করলে বন্দনা লোকটার ভিতর দেখতে পায়। চাউনি দেখলে মনে হয় চোখ দিয়ে গা চাটছে।

কিন্তু বন্দনার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলেই সচকিত হয়। পরে ফাঁক পেলে তোষামোদের সুরে ফিরিস্তি দেয়, ইণ্ডাস্ট্রির কোন্-কোন্ শাঁসালো মক্কেল তাকে ওয়াচ করে যাচ্ছে, অথবা ওর কাছে তার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছে। সুবীর রায়ের পরোয়ানা পেলে সে-ও হোটেলে ফোন করে—ম্যাডাম শিগগীর দাদার এখানে চলে আসুন, আজ ওমুক সীনটা ঢেলে সাজানোর আলোচনা হবে—অথবা ওমুক গানের লিপ-মুভমেণ্ট রপ্ত করতে হবে।

বন্দনার এ-সবের থেকে বেশি আকর্ষণ ওই ছেলে দুটো। কারণ, শুটিং না থাকলেও কেন তাকে বাড়িতে ডাকা হয় সেটা অনায়াসেই আঁচ করতে পারে। আপত্তি করে না, কারণ নতুন আর্টিস্টের অন্তত এ-লাইনের ডাইরেক্টরকে চটানো দস্তুর নয় সেটা এরই মধ্যে বুঝেছে। তাছাড়া গেলে এতটুকু অশোভন আচরণ তো কেউ করে না, আর কিছু অভিজ্ঞতাও বাড়ে। আরো যায় কারণ, ও-বাড়ি গেলে ছোট ছেলেটা মাসি-মাসি করে অস্থির করে তোলে। খুব কাজের ব্যাপারে ডাক পড়লেও বার বার ঘরে এসে বাপের ধমক খেয়ে ফিরে যায়। আর বড়টার দুষ্টু বুদ্ধি। বাপের নোট বই থেকে হোটেলের ফোন

নম্বর টুকে রেখেছে। দিনকতক না গেলে গলির সামনের দোকানে এসে ফোন করে। বন্দনা সাড়া দিলে নিজে কথা না বলে ভাইকে ধরিয়ে দেয়। তার তাগিদে কবে আসবে দিন ক্ষণ বলে দিতে হয়।

ছেলেদের মুখে মাসি চালু হতে তাদের বাপেরও তুমি বলার অধিকার বর্তেছে।—ওদের যখন মাসি তখন আমি আর আপনি-আপনি করি কেন, তাছাড়াও বয়সেও অনেক বড়।

ক্রমশ এই অধিকার বিস্তারটাই বন্দনার কখনো বিরক্তি কখনো রাগের কারণ হয়ে উঠেছিল। ছবির রাজ্যে বন্দনাকে সে টেনেছে, তাই এই জগতের যাবতীয় অবাঞ্ছিত সম্ভাবনা থেকে তাকে আগলে রাখার দায়িত্ব যেন তার। এই জগৎটা সম্পর্কে অনেক লেকচার দিয়েছে, অনেক সতর্কতার কথা বলেছে। বলেছে, কেরিয়ার গড়তে চাও তো এক মনে যা করছ করে যাও, আজ যা করছ সেইটাই কালকের ভবিষ্যত, কাল যা করবে সেটাই পরশুর ভবিষ্যত—আজকের দিনটা ফাঁকে পড়ে গেলে সবটাই ফাঁকের মধ্যে পড়ে গেল।

ঠিক এই কথার উত্তরে বন্দনা বোকা মুখ করে জিগ্যেস করেছিল, এটা কি আপনার কথা?

অপ্রস্তুত হয়েও সুবীর রায় হেসে ফেলেছিল।—আমি বাংলায় অনার্স গ্র্যাজুয়েট, তুই একটা ভাল কথা বলতে পারি না?

—পারেন, তবে কে যেন বলেছিল, লিভ ইন এ ডে-টাইট কম্পার্টমেণ্ট....।

লোকটা নিরেট নয়। তেমনি হেসে জবাব দিয়েছে, তাহলে দেখ, ভাল কথা আর সত্যি কথা কি রকম মিলে যায়।

স্টুডিওতে সাময়িক ভাবে শুটিং অফ্ হলে বন্দনা সাধারণত নিজের ঘরে চলে আসে। হিরোইনের আলাদা ঘর থাকেই। আবার ভাল না লাগলে বন্দনা কখনো স্টুডিও চত্বরের এ-দিক সে-দিক ঘোরাঘুরিও করে। ফাঁক পেলে অন্য সেটের কোন নবীন অভিনেতার কথা-বার্তা বলা বা গল্প করার অভিলাষটা শুধু এ-লাইনের ব্যাপার নয়। বরং এটা সর্বক্ষেত্রের প্রাকৃতিক আকর্ষণ বলা যেতে পারে।

কিন্তু ওকে নিয়ে সুবীর রায়ের এমনি গুরুদায়িত্ব যে এটুকুও বরদাস্ত করতে তার আপত্তি। প্রায়ই বলে, শুটিং-এ ব্রেক পেলে চুপচাপ ঘরে বসে নিজেকে তুমি ছবির চরিত্রে ভাববে, পরের সীন্ চিন্তা করবে।

সেদিন এমনি একটু ব্রেক পেতে ঘরে ভাল লাগছিল না। ফ্লোরের বাইরে এসে গজ বিশেক দূরের একটা গাছতলায় বসে ছিল। পাশের সেটের হিরোর কিছু নাম-ডাক আছে। সে কাছাকাছি ঘুরছিল, এগিয়ে এলো। বন্দনার ছবি সম্পর্কেই দু-চার কথা জিগ্যেস করল। হাসি মুখেই জবাব দিতে দিতে বন্দনা সামনের ঘাস-বিছানো জায়গাটা দেখিয়ে বলল, এক্ষুনি ডাক না পড়ে তো বসুন না—

নায়কটি সানন্দেই বসে পড়ে বলল, আমার এখন প্রায় আধ ঘণ্টার মত অফ—

কিন্তু পাঁচ মিনিট না যেতে ডাক বন্দনারই পড়ল। হঠাৎ তাকিয়ে দেখে ফ্লোরের বাইরে সুবীর রায় দাঁড়িয়ে—চোখাচোখি হতেই একটা হাত তুলে ওকে ডাকল।

—এই যাঃ, আমারই ডাক পড়ে গেল দেখছি। বলে বন্দনা ধড়মড় করে উঠে এগিয়ে এলো।

কাছে যেতেই সুবীর রায় চাপা রাগে বলে উঠল, তোমার এর পরের সীন্টা ইমপর্ট্যান্ট, চুপচাপ নিজের ঘরে বসে ভাবো, এখন তোমার অন্যের সেটের লোকের সঙ্গে বাজে আড্ডা দেবার সময়—?

বন্দনার মুখ আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠছে। সোজা চোখে চোখ। ওই কয়েক পলকের মধ্যে বুঝিয়ে দিল, যাদের ডেকে এনে এ-ভাবে কথা বলা যেতে পারে সে তাদের একজন নয়। তারপর খুব ধীর মন্থর গতিতে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

দু' মিনিট বাদে গলা খাঁকারি দিয়ে সুবীর রায় ঢুকল। বন্দনা তখন ডেক-চেয়ারে আধ-শোয়া। তেমনিই থাকল। চাউনিটা শুধু তার মুখের ওপর।

—ইয়ে, তুমি রেগে গেলে দেখছি, কিছু মনে কোরো না, তোমার ভালর জন্যেই বলছি, স্টুডিওতে এলে আমি সব থেকে বেশি দেখতে চাই নিষ্ঠা। এটুকু দেখলেই আমি খুশি—

বন্দনার মুখে রাগ বিরাগের কোন চিহ্নই নেই। মুখের ওপর নির্লিপ্ত চাউনিটা শুধু অনড়। খুব সহজ গলায় বলল, না, আমি মোটেই রেগে যাইনি, আমি ভাবছিলাম এত নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করেন, অথচ শুটিং করতে করতে আপনি হঠাৎ সেট থেকে বাইরে এসেছিলেন কেন...।

—ইয়ে, লাইট অ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছিল, গরমের জন্য বেরিয়ে এসেছিলাম। কৈফিয়তটা দিয়ে ফেলেই সুবীর রায় আরো রেগে গিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। পরের সেটে ওর সঙ্গে একটিও কথা বলল না তার পরেও না।

মাঝে দু' সপ্তাহ আর শুটিং নেই। প্রথম সপ্তাহে হোটেলে কোন টেলিফোন এলো না। বন্দনা এখন আর অন্তত এই লোকের বিরাগের ধার ধারে না। সেদিন ওই কথা বলে ফেলার পর নিজে যেমন আত্মস্থ, ভিতরে ভিতরে সুবীর রায়কে তেমনি বিচলিত মনে হয়েছে। কিন্তু হাতে কাজ না থাকলে ছেলে দুটোর টানে আসতে ইচ্ছে করে। দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়ায় বঙ্কির মারফৎ ফোন এলো দীপুর। বঙ্কি এখন ফোনে দুই এক কথা বলেই ভাইকে ছেড়ে দেয়। দীপুর তাগিদ, কত দিন আসনি, আজই আসতে হবে, হবেই হবে।

এলো।

বাইরের ঘরের জানালা দিয়ে দেখে দুটো ছেলেই ছুটে এলো। দরজা খুলে দিতে দীপু এখন যা করে তাই করল। দু'হাতে তাকে জাপটে ধরল। বন্দনা হাসি মুখে বলল, কি রে, ফোনে অত ডাকাডাকি কিসের!

মুখ টিপে হেসে বঙ্কি বলল, আজ বাবাই আমাদের ফোন করে আসতে বলেছে।

বাবা যে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে জানে না। ছেলের কথা কানে

যেতেই মুহূর্তের জন্য তার ক্রুর মুখ দেখল বন্দনা। তার পরেই অবশ্য ভোল বদলাল। বলল, ছোটটা ক'দিন ধরে মাসি মাসি করে অস্থির হয়েছিল, তাই বললাম ফোনে কথা বল্‌গে যা।

বন্দনা লক্ষ্য করল, এ-কথা শুনেও বহ্নি বাপের দিকে চেয়ে হাসছে মিটিমিটি।

এলে ওদের জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসেই। আজও এনেছে। এই দিন প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বলতে গেলে ওদের নিয়েই কাটাল। ওদের বাবা এসে বসে খানিকক্ষণ, তারপর উঠে যায়, ঘুরে ফিরে দুই একবার আসে, দাঁড়ায়, আবার চলে যায়। এমনি এক ফাঁকে বন্দনা নিজেই চলে গেল।

এই সপ্তাহেরই শেষের দিকে গানের রিহার্সাল ছিল। খবর পেয়ে বন্দনা এসে দেখে জমজমাট ব্যাপার। মিউজিক ডাইরেক্টর তার অ্যাসিস্ট্যান্ট মাধব ঘোষ প্লে-ব্যাকের দুই গায়ক-গায়িকা, ছবির নায়ক —অনেকে উপস্থিত। কাজের থেকে আপাতত আড্ডাই মুখর। মুড়ি আর গরম সিঙাড়া চলছে। বন্দনাকে দেখে সকলের হৈ-হৈ আপ্যায়ণ। সব থেকে বেশি উল্লাস ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট মাধব ঘোষের। সুবীর রায়ও আজ মেজাজে আছে। বলল, এতক্ষণে এলে, আমাদের প্রায় শেষ।

বন্দনা বলল, গানের রিহার্সালও শেষ নাকি ?

মিউজিক ডাইরেক্টর বলল, সেটা এখনো শুরুই হয়নি, মুড়ি সিঙাড়ার ফার্স্ট প্রেফারেন্স, চায়ের সেকেণ্ড, গানের থার্ড।

একজন মুড়ি সিঙাড়ার থালা এগিয়ে দিতে বন্দনা এক মুঠো মুড়ি নিল শুধু। কিছুটা মুখে দিয়ে সুবীর রায়ের দিকে তাকালো।—ওরা পেয়েছে ?

ওরা বলতে কারা সুবীর রায় তক্ষুনি বুঝল। জবাব দিল, ভোলা এদিকে ব্যস্ত তাই বহ্নি চা আনতে গেছে, দীপুর মুখের কামাই নেই।

বন্দনা এক ফাঁকে উঠে এলো। পাশের ঘরের মেঝেতে দীপু পা ছড়িয়ে মুড়ির বাটি নিয়ে বসেছে। পিছন থেকে এগিয়ে বন্দনা ওর

চোখ টিপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে কচি ছেলেটার উদ্ভাসিত মুখ, মাসি—।

হাত তুলে নিয়ে বন্দনা ওর পাশে উবু হয়ে বসল।

—কখন এলে? আমি জানতেও পারিনি।

—এই তো....এত মুড়ি খাচ্ছিস?

—আর একটা সিঙাড়া এনে দেবে?

—ক'টা হয়েছে?

—তিনটে।

—তাহলে আর একটাও না।

উঠতে গিয়েই বাধা পড়ল। কি মনে পড়তে দীপু ওর হাঁটু চেপে ধরে একেবারে মুখের কাছে মুখ নিয়ে এলো। প্রায় ফিসফিস করে বলল, সেদিন না—বাবা দাদাকে মারতে মারতে একেবারে মাটিতে শুইয়ে ফেলেছিল—পিঠে স্যাণ্ডোলের এত্তোগুলো ছাপ পড়ে গেছল।

শুনে বন্দনার চোখ মুখ মুহূর্তে কুঁচকে উঠল।—কবে? কেন?

—ওই তো আগের দিন তুমি চলে যাওয়ার পরে—বাবা ফোন করতে বলেছিল আর তোমাকে দাদা সে-কথা বলে দিয়েছিল কি না—তাই। হেই গো মাসি বাবাকে কিচ্ছু বোলো না যেন, আমাকেও তাহলে খুব মারবে!

মুহূর্তে সমস্ত মুখ কঠিন বন্দনার। কিন্তু ছেলেটা ঘাবড়ে যাচ্ছে দেখে আশ্বাস দিল, কিছু বলব না, তুই যা....

দরজার বাইরে এলো। আর ওই ঘর-মুখো হতে ইচ্ছে করছে না। দাদার মার খাবার খবর চুপি চুপি দীপু আগে আরো কয়েকদিন দিয়েছে। ওই ছেলে অত মার খেয়েও কখনো কাঁদে না শুনেছে। বন্দনা রাগ করেই একদিন বলেছিল, ছেলেকে অত মার-ধোর করলে সে মানুষ হবে এ-বুদ্ধি আপনাকে কে দিয়েছে?

ওর বাবার জবাব, ও যে কি ভয়ংকর একরোখা পাজি, তোমার ধারণা নেই—সেদিনও হাতের টিপ দেখাতে গিয়ে একটা ছেলের মাথা ফাটিয়ে রক্ত বার করে দিয়েছে!

....কিন্তু ওই দিন ছেলেটা শুধুই সরলতার মাশুল দিয়েছে। ছেলের

কথায় তার থেকে যদি হেসে বন্দনাকে বলত, ধরা পড়ে গেলাম—তাহলেও কিছুটা পুরুষের মত শোনাতো। দুর্বলের নিষ্ঠুর রাগের প্রতি বন্দনার ভীষণ ঘৃণা।

চেষ্টা করেও বন্দনা যে-মুখ নিয়ে বেরিয়েছিল সেই মুখ নিয়ে ও-ঘরে ঢুকতে পারছে না। আবার দীপুর কাছেই চলে এলো। ঝুঁকে ওর বাটি থেকেই এক মুঠো মুড়ি তুলে নিয়ে বলল, আমাকে না দিয়ে খাচ্ছিস যে বড়!

দীপু বিগলিত।—তুমি এখানে বসে আমার সঙ্গে খাও না—তোমার জন্য কয়েকটা সিঙাড়া চেয়ে আনব?

—না।

মুড়ি চিবুতে চিবুতে বন্দনা এ-ঘরে ঢুকল। সুবীর রায়ের দিকে তাকালও না। মিউজিক ডাইরেক্টরকে বলল, আমার কিন্তু আজ আর বসার উপায় নেই—এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম, টুক করে হাজিরা দিয়ে গেলাম—

আগ বাড়িয়ে সুবীর রায়ই বলে উঠল, সে কি! এখন আবার তোমার কিসের তাড়া?

বন্দনা থমকে তাকালো। গম্ভীর।—প্রমথেশ বড়ুয়া ডেকে পাঠিয়েছে, তার নায়িকার রোলের কনট্রাক্ট সই করতে হবে।

সকলের হৈ-হৈ হাসি। বন্দনা ততক্ষণে বারান্দায়। পিছন থেকে নায়কের চিৎকার, ও-জগতে অ্যাক্টিং করতে গেলে আমাদের ইহ-জগতের কি হবে?

সুবীর রায় বাইরের দরজার কাছে এসে আবার ধরল ওকে। গলার স্বরে বিরক্তি চাপা থাকল না।—এখানকার কাজ ফেলে তোমার হঠাৎ কি এমন দরকার পড়ল?

বন্দনা ঘুরে দাঁড়াল। চোখে চোখ।—এখানে আমার কি কাজ? রেকর্ডিং হয়ে গেলে তাই শুনেও ঠোঁট মেলাতে পারব না সত্যিই ভাবেন নাকি?

চলে গেল।

এ-রকম শুনলে টনক নড়ে আর রাগ হয় জানে। তখন ডাইরেক্টারের মর্যাদা ঘা খায়। ওই ছেলেটার মার খাওয়ার ভয় না থাকলে ঘা কাকে বলে দেখিয়ে দিত!

বন্দনার বিরক্তি ক্রমে বেড়েই চলেছে। ছেলে দুটোর ওপর মায়া পড়েছে ঠিকই। তাদের আব্দার জুলুমও খারাপ লাগে না। কিন্তু তাদের বাপও যদি সেই মায়া আব্দার বা জুলুমের ভাগীদার হতে চায় সেটা বরদাস্ত করবে কি করে? ছেলেদের জোরটা যেন তারও কিছুটা জোরের দিক। সুবীর রায় মুখে বলে না, কিন্তু তার আচরণে প্রকাশ পায়। পাচ্ছে। স্টুডিওতে এলে পরিচালক হিসেবে বন্দনা কখনো তাকে অমান্য করে না। পছন্দ হোক বা না হোক যা বলে শোনে। করে। কিন্তু বাড়িতে তার ছেলেদের কাছে এলে বন্দনা তাকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে তার বাড়ি হলেও সে সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি। কিন্তু ওই লোকের যেন তাতে আরো বেশি আপত্তি। বন্দনা এ-বাড়ি আসাও কমিয়েছে এখন। একদিন নিজেই বলেছিল, বয়সে অনেক বড়। কম করে তেরো চোদ্দ বছরের বড় তো হবই, তবু ফাঁক পেলেই আমাকে তুমি অমান্য করো।

বড়র মহিমা দেখলে বন্দনা পা ছুঁতে পারে। কিন্তু এই বড়র শুধু গুমোর বাড়ছে, আর তার তলা দিয়ে অধিকার বিস্তারের লোভ বাড়ছে। বন্দনা তার আচরণ দেখে বুঝতে পারে, কর্তব্যের নামে কড়া মেজাজ দেখেও বুঝতে পারে। পুরুষের মুখের দিকে খানিক সোজা চেয়ে যে মেয়ে তার ভেতর দেখতে পায় না, বন্দনা তাকে বোকা ছাড়া আর কিছু ভাবে না। বন্দনা সে-রকম বোকা আদৌ নয়।

...পাঁচ মাস বাদে প্রায় পুরো ইউনিট দার্জিলিংএ এসেছে আউটডোর শুটিংএ। কলকাতায় গরম কিন্তু এখানে বড় বেশি ঠাণ্ডা। ফলে শুটিং-এর সময় বাদে ছোটাছুটি হুটোপুটির মধ্যে বেশ খোশ মেজাজে সময় কাটছিল সকলের। নায়কের ভূমিকায় যে অভিনয়

করছে তার অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠার চেষ্টাটা বন্দনা নিজেই লক্ষ্য করছে। বন্দনার এ নিয়ে কিছু মাত্র বিরক্তি নেই, উল্টে মজাই পাচ্ছে। কিন্তু মেজাজ বিগড়াচ্ছে পরিচালক সুবীর রায়ের। সেদিন বিকেল সাড়ে চারটের প্যাক্-আপ হতে নায়ক প্রস্তাব দিল, চলুন, একটু লেবং-এর দিকে নামি।

বন্দনা তক্ষুনি রাজি।—চলুন।

বেশ অনেকটাই নামার পর ওঠার পালা। নায়ক বলল, কে আগে উঠতে পারে দেখা যাক।

বন্দনা সায় দিল, দেখা যাক।

পাল্লা দিয়ে উঠছিল দুজনে। হাজার হোক পুরুষ মানুষ। সে খানিকটা এগিয়ে যেতে বন্দনা একটু ছুটে এসে তার হাত ধরে পিছন দিকে টেনে তর-তর করে কিছুটা এগিয়ে গেল। এর পর নায়কও তাই করল। বন্দনার হাত ধরে টেনে তাকে পিছনে ফেলে আবার এগিয়ে গেল। এ-রকম দুই একবার হবার পর নায়কটি আর বন্দনার হাত ছাড়ল না, বলল, একসঙ্গেই ওঠা যাক, কিন্তু কাছাকাছি গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ দিচ্ছি না।

হাসি মুখেই উঠে আসছে দুজনে। ম্যালের এক কোণের দিকে দাঁড়িয়ে সুবীর রায়। গম্ভীর মুখে এদের দুজনকেই দেখছে। দেখল বন্দনাও। কিন্তু তাকে দেখে হঠাৎ হাত ছাড়িয়ে নেওয়া বিসদৃশ হবে মনে হতে সে চেষ্টাও করল না।

রাত্রিতে হোটেলে এক সময় ওর ঘরে এসে গম্ভীর মুখে সুবীর রায় বলল, মস্ত হিরো মনে করে নিজেকে, ভাবে কেউ কিছু বলবে না, বাড়াবাড়ি দেখলে আমি ওকে ওয়ার্নিং দেব!

বন্দনার দু'চোখ তার মুখের ওপর স্থির একটু।—কি বাড়াবাড়ি দেখলেন?

—ও সকলের কনসেন্ট্রেশন নষ্ট করছে।

—সেট-এ না সেটের বাইরে?

সঙ্গে সঙ্গে থমথমে মুখ সুবীর রায়ের।—শোন, তোমার সঙ্গে আমি

তর্ক করতে চাই না, তবে একটা কথা জানিয়ে রাখা উচিত মনে করি, কলকাতায় এ-লাইনের দুটো বাজে মেয়ের সঙ্গে ওর অ্যাফেয়ার চলছে।

বন্দনার মুখ লাল হচ্ছে।— দার্জিলিং-এ এসে সেটা তিনে দাঁড়াচ্ছে ভাবছেন ?

—না, তোমাকে জানানো কর্তব্য মনে হল তাই বললাম।

এবারে বন্দনার ঠোঁটের ফাঁকে হাসির ফাটল একটু।—আচ্ছা সুবীরবাবু, এর আগে তো আপনি তিনটে ছবি করেছেন, কোনটার নায়িকা এক নয়—তাদের সকলের জন্যেও আপনার এ-রকম চিন্তা ভাবনা আর উদ্বেগ ছিল নাকি ?

—ছিল না, কারণ তারা এই লাইনটাকে জানে। রাগে মুখ কালো করে সুবীর রায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

যে ক'দিন এর পর দার্জিলিং-এ ছিল, বন্দনা ওই নায়কের সঙ্গে আরো বেশি মেলামেশা করেছে। মনে মনে জ্বলেছে। কিন্তু মুখে কিছু বলেনি। ভদ্রলোক পরে আবার ছবি করলে এই নায়ক যে বাতিল হবেই বন্দনার তাতে সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু পরের তিন চার মাসে ওর প্রতি সুবীর রায়ের দায়িত্ববোধের ফাঁক দিয়ে অধিকার বিস্তারের চেষ্টাটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। এত দিনে স্টুডিও মহলে বন্দনার আলাপ পরিচয়ের পরিধিও অনেকটাই বেড়েছে। এই লোকের সেটা চক্ষুশূল। ফলে সর্বদা গার্জেনের মতো কথা-বার্তা, গার্জেনের মতো উপদেশ। বন্দনা তাতেও এত বিরক্ত হত না যদি না গাম্ভীর্যের মুখোশের নীচে দুর্বল অভিলাষের দিকটা ওর চোখে প্রকট হয়ে উঠত। এক এক সময় এত রাগ হয় যে মুখের ওপর বলে দিতে ইচ্ছে করে অভিনয়-টভিনয় আর তার দ্বারা হবে না। আবার হাসিও পায়। মানুষের আশা জিনিসটা বোধ হয় রোগের মতো, নইলে এ-বয়সের মানুষটার এমন অসম্ভব দুরাশা কেন! এই লোকের পরিচালনায় পরের ছবি করার কথা ভাবতেও বন্দনার গায়ে জ্বর।

'ব্যক্তিত্ব' ছবির কাজ তখন প্রায় চোদ্দ আনা শেষ। এই সময়ে

একদিন হঠাৎই যা ঘটে গেল বন্দনার কাছে সেটা ভবিতব্যের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়ার মতই। নইলে অমন এক বিচ্ছেদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এমন ব্যাপারটা ঘটে গেল কি করে? যা ঘটে গেল তাতে ভবিষ্যতে এই লোকের সংশ্রবশুদ্ধ ছেঁটে দেবার কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হল উল্টো। অথচ এমন নয় যে বন্দনা তখন বিচার বুদ্ধি সব খুইয়ে বসেছিল।

....এই সময় মোটামুটি ভাল আর এক প্রোডিউসারের সঙ্গে বন্দনার যোগাযোগ হয়েছিল। সুবীর রায়ের অগোচরে তাদের পরের ছবিতে কাজ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে। সেই ছবির দুই নায়িকা। তারই একটি। অপরটির জন্য একজন খুব নামী অভিনেত্রীর সঙ্গে কনট্রাক্ট হয়ে গেছে। বন্দনার বিবেচনায় প্রথম আকর্ষণ ওই নাম-করা অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রায় সহ-ভূমিকায় কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে, দ্বিতীয় আকর্ষণ ও-ছবির পরিচালকও সুবীর রায়ের থেকে অনেক বেশী নামী। প্রস্তাবটা সাগ্রহে ওই পরিচালকই তাকে দিয়েছে। তাছাড়া গল্পও এক নাম-করা লেখকের। বন্দনা সবে বইটা পড়তে শুরু করেছে, যদি সত্যি ভাল রোল হয় তার আপত্তির কারণ নেই। সুবীর রায়ের ওপর বন্দনা তখন এত বিরক্ত যে তাকে জানানোও দরকার মনে করেনি। নইলে গোপন করারও কিছু নেই।

বেলা তখন সাড়ে এগারোটা। হোটেলে নিজের ঘরে বসে বেশ নিবিষ্ট মনেই বইটা পড়ছিল। এমন সময় ওই বইয়ের নামী পরিচালক স্বয়ং এসে হাজির। ক্ষুব্ধ মূর্তি। কোন ভনিতা না করে সোজা জিজ্ঞেস করল, 'ব্যক্তিত্ব' ছবির পরে আপনি পর পর আরো দুটো ছবি করবেন বলে সুবীর রায়ের মারফৎ মিস্টার কোঠারির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ আছেন?

বন্দনা বিমূঢ় প্রথম। আস্তে আস্তে মুখ লাল তারপর।—সুবীর রায় আপনাকে এ-কথা বলেছেন?

ভদ্রলোক জবাব দিল, তিনি শুধু আমাকে বলেননি, নিজে গিয়ে আমার প্রোডিউসারকেও এ-কথা বলে এসেছেন, যার জন্য তিনি

দস্তুরমত অসন্তুষ্ট আপনার ওপর।

রাগ সামলাতে সময় লাগল একটু। আর এই মুখ দেখেই পরিচালক যেটুকু বোঝার বুঝে নিল। খুব ঠাণ্ডা গলায় বন্দনা বলল, এমন চুক্তির কথা আমার জানা নেই, বইটা পড়ছি, পড়া হয়ে গেলে আপনাদের মতামত জানাব কথা ছিল, আপনি সেটাই বিশ্বাস করতে পারেন।

এবারে স্বর একটু নরম করে পরিচালক বলল, কি অন্যায় দেখুন, আপনি জানেনও না অথচ… যাক, বই আপনার ভাল লাগবে, আমার প্রোডিউসারকে তাহলে আমি জানাতে পারি যে সুবীর রায় বা মিস্টার কোঠারির সঙ্গে আপনার কোন চুক্তি নেই?

…জানাতে পারেন।

ভদ্রলোক চলে যাবার পর আর এক বর্ণও পড়া হল না। চান সকালেই সেরে নেয়, দুপুরের খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়ল। শুটিং না থাকলে দুপুরে দুটো আড়াইটে নাগাত সুবীর রায় এডিটিং দেখতে স্টুডিওতে যায় জানা ছিল। বন্দনা আশা করেছে এখন বাড়িতেই পাবে।

দুটোর আগেই পৌঁছুল। পেল। দীপু ছুটে এসে হাত ধরল। বঙ্কি পিছনে। ওদের আজ স্কুল নেই জানে না। তাদের বাবা তার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

বন্দনা সোজা তার দিকে তাকালো। তারপর দীপুকে বলল, তোমাদের বাবার সঙ্গে দরকারি কথা আছে।

যাকে শোনাবার সে-ই শুনেছে। বুঝেছেও নিশ্চয় কিছু। সুবীর রায়ের মুখ শুকনো তক্ষুনি। দীপুর হাত ছাড়িয়ে বন্দনা সোজা বসার ঘরে। পিছনে সুবীর রায়ও এলো। এর মধ্যে সামলেছে একটু, তার চোখে মুখে নিখাদ বিস্ময়।—কি ব্যাপার?

কিছু বলতে গিয়েও বন্দনা থমকালো। দরজার ওপাশে ছেলে দুটো দাঁড়িয়ে। বাপ তাড়া দিল, এই! তোরা ওদিকে যা—

ওরা সরে গেল। বন্দনা জিজ্ঞেস করল, আপনার ছবিতে আমার

আর ক'দিনের কাজ বাকি ?

—কেন বল তো ?

বন্দনা চেয়ে আছে। গলার স্বর অনুচ্চ কঠিন।—কেন আপনি জানেন না ? কিচ্ছু বুঝতে পারছেন না ?

সুবীর রায় স্মার্ট ভাবটুকু বজায় রাখার চেষ্টা।—তুমি খুব রেগে গেছ এটা শুধু বুঝতে পারছি।...ও, কাদের সঙ্গে তোমার একটা নতুন ছবি কণ্ট্রাক্টের কথা হচ্ছে সেই ব্যাপারে ? তাই নিয়ে আমি তো আজই তোমার সঙ্গে ফোনে কথা বলব ভাবছিলাম—

কি ভাবছিলেন আমি তা জানতে চাই না, আপনি তাদের বলেছেন আপনার মারফৎ কোঠারির সঙ্গে আমি পর পর দুটো ছবিতে চুক্তিবদ্ধ আছি—আর কোন ছবি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় ?

মুখে হাসি টানার চেষ্টা।—দুটো না হোক পরের ছবির কথা কোঠারির সঙ্গে আমার হয়েই আছে, আর এ-ব্যাপারটা নিয়ে আমি সত্যিই আজই তোমার সঙ্গে কথা বলতাম।

—তাদের কিছু বলার আগে আপনি আমার সঙ্গে কথা বলেননি কেন ? আপনার এই দুঃসাহস হয় কি করে ?

খুব আঘাত পেল এমনি মুখ।—দুঃসাহস ! এতদিনে তুমি এই বুঝলে ? আমি তোমার জন্যে যা করছি সেটা দুঃসাহস ?

বন্দনার চোখে পলক পড়ে না, কাপুরুষের বেসামাল অবস্থা দেখছে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার এতটুকু মায়া-দয়া নেই।—আর কি বোঝবার আছে ? আর কি বোঝাতে চান ?

সুবীর রায়ের চোখে মুখে করুণ আবেদন।—এই সামান্য ব্যাপারে তুমি এত রেগে যাবে ভাবতেই পারিনি, উল্টে আমার রাগ হচ্ছিল যে আমাকে না জানিয়ে তুমি....আচ্ছা, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নয়, ও-ঘরে এসো, আমার কি বলার আছে একটু ঠাণ্ডা হয়ে শোন—

নিজেই আগে দরজার কাছে চলে গেল, কিন্তু ওকে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অনুনয়ের সুরে বলল, ছেলে দুটো এ-দিক ও-দিক করছে, আর অবাক হচ্ছে, বন্দনা প্লীজ—

পায়ে পায়ে এগলো। এই লোকের কি বলার আছে শোনার জন্য নয়। তার মোহ এখনো ভেঙে না দিলে নয়, তাই নিরিবিলি একটু ওরও দরকার।

দু'ঘরের মাঝামাঝি বারান্দার দেয়াল ঘেঁষে বঙ্কি-একা দাঁড়িয়ে।

গম্ভীর মুখে বাপ ওকে বলল, তোরা এই ঘরে থাক। বন্দনাকে ডাকল, এসো—

নিজে আগে ঘরে ঢুকল।

এটা শোবার ঘর, আবার পরিচালক সুবীর রায়ের কাজকর্মের ঘরও। ইদানীং এলে বন্দনাকে সোজা এ-ঘরেই নিয়ে আসে। অভিনয়ের আলোচনা, ' স্ক্রপ্টের আলোচনা এখানে বসেই হয়ে থাকে। চেয়ার দুটো আর টেবিলটা সরিয়ে গানের আসরও এখানেই বসত।

অভ্যাসবশত পায়ের স্যাণ্ডেল দরজার কাছে রেখে বন্দনা ভিতরে এলো। সুবীর রায় চার-ছ' আঙুল ফাঁক রেখে দরজা দুটো ভেজিয়ে দিল। সে ফিরতেই বাতাসে ওটা যে আবার আধ হাতের ওপরে ফাঁক হয়ে গেল খেয়াল করল না। বন্দনার চাউনি সোজা তার মুখের ওপর।

চেয়ার দুটো নয়, খাটটা দেখিয়ে সুবীর রায় বলল, তোমার রাগ করার মতো কিছুই হয়নি, আগে আরাম করে বোসো।

বন্দনা খাটের পাশ ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে। কঠিন গলায় বলল, আমি বসতে আসিনি, আমি শুধু বলতে এসেছি এ-লাইনে এনেছেন বলে আপনি আমার অভিভাবক নন—আপনার অনেক নোঙরামি আমি সহ্য করেছি, এবারে আপনি মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন!

সুবীর রায়ের মুখ কালো।—নোঙরামি! তুমি এ-কথা বলতে পারলে?

বন্দনা অপলক চেয়ে আছে।

গলার স্বরে প্রায় আকুতি ঢেলে সুবীর রায় বলল, এই এক ব্যাপারে আমি কিছু মিছে কথা বলেছি সত্যি কথাই···ভেবেছিলাম পরে তোমাকে বুঝিয়ে বললেই বুঝবে—এই এক ছবিতে এসে এ-লাইনের

তুমি কতটুকু জানো—প্রথম ছবিতে হিরোইনের রোলে নেমে পরের ছবিতেই বাজে রোলে নামার কি বিপদ তুমি জানো না—ওরা মুখে বলছে দুজন হিরোইন—কিন্তু সমস্ত অ্যাডভান্টেজ আর স্কোপ ওই নামী আর্টিস্ট যাকে নিয়েছে তাকে দেবে—তুমি একেবারে সাইফার হয়ে থাকবে—না জেনে নিজের কত বড় সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলে তোমার ধারণাও নেই—

বন্দনার ফর্সা মুখে রক্তকণা জমাট বাঁধছে। চোখেও পলক পড়ছে না!—আমার জন্য আপনার এত মাথা ব্যথা কেন?....আমার সর্বনাশ বাঁচানোর তাড়নায় আপনি পুরুষ মানুষের চালচলন পর্যন্ত ভুলতে বসেছেন কেন?

মুখের ওপর চাবুকের ঘা পড়ল।—কি আশ্চর্য, আমি তোমাকে এ লাইনে নিয়ে এলাম, তোমার ভাল চাইব না—তোমার ভাল আশা করব না?

বন্দনার গলার স্বরও চড়ছে একটু একটু করে।—এই ভাল চাওয়া আর ভাল আশা করার ফলে আমার দিকের কৃতজ্ঞতা কোন্ পর্যন্ত গড়াতে পারে বলে আপনার ধারণা? আপনি নিজে কি চান? নিজে কি আশা করেন? নিজেকে আপনি খুব চালাক আর— এ কি! এ কি!

বন্দনা সভয়ে ছিটকে দু'পা সরে গেল, ধাক্কা লেগে চেয়ারটা মাটিতে উল্টে পড়ল। বন্দনা সত্রাসে প্রথমে খাটের কাছের মেঝের দিকে পরে নিজের পায়ের দিকে তাকালো! মনে হল, পায়ের ওপর সামান্য আঁচড় বসিয়ে বিছে-টিছে কিছু হেঁটে গেল।

বঙ্কি বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিল, চেয়ার পড়ার শব্দে দৌড়ে এসে আধা-ভেজানো দরজার এক পাট খুলে ভিতরে তাকাল।

ওদিকে অগ্নিবর্ষণের মাঝে হঠাৎ এই ব্যাপার দেখে সুবীর রায়ও বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। তার পরেই ঝুঁকে খাটের নিচে তাকালো। হাত বাড়িয়ে খাটের তলা থেকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এলো যাকে— সে দীপু। এক ঝটকা টানে বাপ তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল।

কয়েক মুহূর্ত, তারপরেই বন্দনা বঙ্কির সামনের দরজা ঠেলে হন হন করে সোজা বাইরের দিকে। পিছন থেকে বঙ্কি ছুটে এলো। প্রায় আর্তনাদের মতো শোনাল ওর কথাগুলো।—মাসি, তুমি এক্ষুনি -এক্ষুনি চলে যাচ্ছ? মাসি—!

বন্দনা ততক্ষণে গলিতে নেমে দশ গজ এগিয়ে গেছে। ফিরেও তাকালো না। গলির বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি ধরল। বেলা তখন দুটো মাত্র। কিন্তু পড়ন্ত বিকেলের মতো মনে হচ্ছে কেন বন্দনা খেয়াল করল না। মেঘে মেঘে আকাশ কালি বর্ণ। বন্দনার মাথায় তখনো আগুন জ্বলছে।

হোটেলে ফিরে সেই বইটাই পড়ছিল। কিন্তু পড়ায় আদৌ মন বসছে না। তবু চেষ্টা করছে পড়তে। বিকেল ছ'টা নাগাদ ঘরে টেলিফোন। বই রেখে বন্দনা ভুরু কুঁচকে তাকালো। নিচে বলে রাখা উচিত ছিল, কে ফোন করছে না জেনে যেন ঘরে লাইন না দেওয়া হয়। এখনো কি করবে জানে, ওই লোকই যদি হয়, কোন কথা না বলে ফোন রেখে দেবে।

—হ্যাঁলো।

ও-দিক থেকে এক ছেলের ঠাণ্ডা গলা ভেসে এলো, আমি বঙ্কি। দীপুর একশো পাঁচের কাছাকাছি জ্বর····ভোলাদা একটু আগে পাড়ার ডাক্তার ডেকে এনেছিল। তখন ভুল বকছিল····

—কেন? হঠাৎ এত জ্বর কেন? রাগ ভুলে বন্দনা উতলা।

—বাবা ওকে পাগলের মত মেরেছে মরেও যেতে পারত। গায়ের চামড়া ফেটে ফেটে গেছে—এক দেড় ঘণ্টার মধ্যেই ভীষণ জ্বর এসে গেছে। এখন কেবল মাসি-মাসি করে চিৎকার করছে। তোমাকে কিছু বলব না ভেবেছিলাম, ওর জন্য বলতে হল।

বন্দনা স্তব্ধ। পাথর।····এই বঙ্কি তখন কেন ও-ভাবে ছুটে এসেছিল, কেন অমন আর্তনাদ করে ফেরাতে চেষ্টা করেছিল এখন

বুঝতে পারছে। তার ভাই ও-ঘরে লুকিয়ে আছে জানত বলেই বহ্নি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। ধরা পড়লে তার ভাইয়ের অদৃষ্টে কি আছে বহ্নি জানত।

—মাসি? লাইন ছেড়ে দিয়েছ?

—না, তোর বাবা কোথায়?

—সেই বেরিয়েছে এখনো ফেরেনি।

—ছেড়ে দে! আমি যাচ্ছি।

এক দিকে ছেলেটার জন্য যত যন্ত্রণা, অন্য দিকে আর একজনের প্রতি ততো ঘৃণা, ততো বিদ্বেষ।

ফোন তুলে ম্যানেজারকে একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে দিতে বলল।

মিনিট পনেরোর মধ্যে ট্যাক্সিতে উঠল যখন, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। বন্দনা আগেও আকাশের দিকে লক্ষ্য করেনি, এখনো করল না। পাথর মূর্তির মতো বসে আছে। অর্ধেক রাস্তা আসার আগেই তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এ-রকম বৃষ্টি আধঘণ্টা হলে রাস্তায় জল জমে যাবে।

···ট্যাক্সি গলির মুখে এসে দাঁড়াল। কিন্তু নামা দায়। এত বৃষ্টিতে গলিটুকু পার হলে নেয়ে উঠতে হবে। তাছাড়া এরই মধ্যে গলিতে বেশ জল জমে গেছে। তার কথামত ট্যাক্সিঅলা উল্টোদিকের ফুটপাথ থেকে একটা রিকশা ডাকল। ট্যাক্সি থেকে নেমে রিকশায় উঠতেও কিছুটা ভিজতে হল।

গলিতে অল্পেতে জল জমে বলেই হয়তো ত্ু'ধার উঁচু বাঁধানো সিঁড়ি। তারপর দরজা। দরজা ত্ুটো ভেজানো ছিল। ঠেলতে খুলে গেল।

নিজের শাড়ির আঁচলে ভেজা মুখ মুছে, পায়ের ভেজা স্যাণ্ডেল ত্ুটো দেয়ালের এক পাশে রেখে বন্দনা আবার সেই ঘরে। দীপু সেই খাটে শোয়া, তার কপালে জলপটি দিচ্ছে ভোলা। বহ্নি খাটের পাশে দাঁড়িয়ে।

—দীপু কে এসেছে ছাখ—

দাদার ডাকে দীপু চোখ মেলে তাকালো। মাসিকে দেখে হাসতে গিয়ে কচি মুখ যন্ত্রণায় কুঁচকে গেল। নিচের ঠোঁটের এক দিক বিষম ফুলে আছে। বন্দনা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখল খানিক। সমস্ত মুখ কঠিন।—জ্বর কত এখন?

দীপু বলল, ভোলাদা একটু আগে থার্মোমিটার লাগিয়েছিল, জ্বর চারের ওপর বলল। ডাক্তার তিন পর্যন্ত জলপটি আর বাতাস দিতে বলেছে। দোকান থেকে ধারে ওষুধ এনে খাওয়ানো হয়েছে—এই যে প্রেসক্রপশন।

ভোলাকে উঠিয়ে বন্দনা দীপুর শিয়রের কাছে বসল। বহ্নি বলল, দীপু, মাসিকে পিঠটা দেখা একবার—

দীপু বলল, পারছি না, কষ্ট হচ্ছে।

বহ্নি মাসির দিকে তাকালো।—আমি তখনই জানতাম কি হবে····তাই তোমাকে যেতে বারণ করেছিলাম।

জ্বর নামানোর ওষুধ পড়েছে। খানিকক্ষণের মধ্যে নেমেও গেল। মাসির দিকে চোখ তুলে দীপু বলল, তোমরা ঝগড়া করছিলে, তোমার জন্য আমার ভয় করছিল, তাই খাটের নীচে থেকে পায়ে আঁচড় দিয়ে তোমাকে থামাতে চেষ্টা করেছিলাম।····তুমি কেন যে অত ভয় পেয়ে গেলে—

বন্দনা নির্বাক।

সমস্ত কলকাতা এক দেড় ঘণ্টার মধ্যে জলের তলায়। তার পরেও মুষলধারে বৃষ্টির বিরাম নেই। সেই সঙ্গে শোঁ-শোঁ বাতাস। ওষুধের প্রতিক্রিয়া কমতে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ জ্বর আবার বাড়তে লাগল। ভোলা জানালো চার ঘণ্টার আগে জ্বর নামানোর ওষুধ ফের দেওয়া যাবে না।

সাড়ে ন'টার মধ্যে আবার ধুম জ্বর। টুকটাক ভুল বকা শুরু হল।····গরম····চান করব····মাংস খাব।

বন্দনা আবার জলপটি নিয়ে বসল। কিন্তু জ্বরের ঘোরে দীপু ওটা ফেলে ফেলে দিচ্ছে। ভোলা বহ্নিকে খাবার জন্য টেনে নিয়ে

গেছে। ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। বৃষ্টির বিরাম নেই। অনেক জায়গায় এতক্ষণে হাঁটুর এক বিঘৎ ওপরে জল।

কলিং বেল বাজল। ভোলা ছুটে গেল। আবার তাকে ছুটে ফিরতেও দেখল। বন্দনার মনে হল, বেল শুনে শুধু দরজাই খুলে দিয়েছে, বাড়িতে যে ফিরল তাকে ও কিছুই বলেনি।

একটু বাদে দরজার কাছে এসে সুবীর রায় দাঁড়িয়ে গেল। দেখলেই বোঝা যায় জলে সাঁতার কেটে ফিরেছে। কিন্তু বন্দনা তা দেখছে না। কঠিন ছ'চোখ তার ভেজা মুখের ওপর বসে আছে।

সুবীর রায়ের জলে চুপসনো ঝোড়ো কাকের মূর্তি। ঘরের দৃশ্য দেখে বিবর্ণ পাংশু। ওই দুই চোখের ঘায়ে নিস্পন্দ।

বন্দনা চোখ নামালো। জলপটিতে মন দিল। একটু বাদে সুবীর রায় ভেজা ট্রাউজার জামা নিয়েই এক পা ছ'পা করে ভিতরে এলো। ছেলের মুখের দিকে তাকালো।

বন্দনা আবার মাথা তুলল আস্তে আস্তে। আবার চোখে চোখ। গলা একটুও না চড়িয়ে একটি একটি করে বলল, বঙ্কি বিকেলে ডাক্তার এনে দেখিয়েছে, রোগী দেখে ডাক্তার থানায় খবর দিতে বলেছে কিনা আমি জিগ্যেস করিনি, ওটা আমার করার ইচ্ছে আছে।

এত জলে ভেজার পরেও সুবীর রায়ের জিভ শুকিয়ে কাঠ। সে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে।

—আপনি আমার সমুখ থেকে সরে যান!

বেত্রাহতের মত পায়ে পায়ে চলে গেল।

একটু বাদে বঙ্কি খেয়ে ফিরল। বন্দনা ঘড়ি দেখল, দশটা বাজে। দীপুর গায়ে হাত দিল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। ওই বেহুঁশ অবস্থায় আবার জ্বর নামানোর ওষুধ দিল।

বঙ্কি বলল, রাস্তায় এখন এক কোমর জল, কাল সকালেও ট্রাম-বাস ট্যাক্সি চলবে কিনা সন্দেহ, তোমার আজ আর ফেরাই হবে না, ভোলা তোমার এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে—

বন্দনা তাকালো তার দিকে। খুব চাপা গলায় জবাব দিল,

ক্ষের খাবার কথা বললে তোদের সঙ্গেও আমার আর কোন সম্পর্ক থাকবে না। আমার জন্য ভাবতে হবে না, শুয়ে পড়গে যা—

বঙ্কি চুপ করে গেল বটে, কিন্তু এ ছেলের ধাত অন্য রকম। দু' চোখের কোণে কৌতুক চিকচক করছে।

রাত সাড়ে এগারোটা। বৃষ্টি থেমে গেছে। বসার ঘরে আলো জ্বলছে। বারান্দায়ও। বন্দনা এ ঘরের একটা সোফায় বসে। উঠল। বারান্দায় এলো। বাইরের দরজার দিকে এগলো। একটুও শব্দ না করে দরজার এক পাট ফাঁক করতেই ভিতরে খানিকটা জল ঢুকে গেল। গলির জল সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ওপরে উঠে এসেছে।

তেমনি নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে ফিরতেই দাঁড়িয়ে গেল।

বারান্দার ও-মাথার ঘরের সামনে সুবীর রায় দাঁড়িয়ে আছে। ওর দিকেই চেয়ে আছে।

বন্দনার সমস্ত মুখ তেমনি কঠিন। চাউনিটা খানিক তার হাড় পাঁজরে বিঁধিয়ে রেখে আস্তে আস্তে আবার বসার ঘরে ফিরল। সোফায় বসল। এমন বৃষ্টির ওপরেও বিষম ক্রুদ্ধ।

বোধ হয় পাঁচ মিনিটও নয়, আপনা থেকেই আবার দরজার দিকে চোখ গেল।

দোরগোড়ায় সুবীর রায়।

বন্দনা দু'চোখের কঠিন আঘাতেই আবার তাকে ফেরাতে চাইল। কিন্তু মানুষটা এবারে ফিরল না। উদভ্রান্ত চাউনি। চোখে চোখ পড়তে পায়ে পায়ে এগলো। কাছে, আরো কাছে, একেবারে বন্দনার পায়ের কাছে এসে থামল।

তারপর আচমকা যা করল তার জন্য বন্দনা এতটুকু প্রস্তুত ছিল না। পায়ের কাছে জানু পেতে বসে পড়ে মাথাটা ওর কোলে গুঁজে দিয়ে দু'দিক থেকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরল, মাথাটা কোলের ভিতরে আরো জোরে চেপে রাখল।

বন্দনা দিশেহারা কয়েক মুহূর্ত। তারপর ঈষৎ কঠিন স্বরে বলল,

ছাড়ুন—ছাড়ুন বলছি!

তেমনি আঁকড়ে ধরে কোলে-গোঁজা মাথাটা নাড়ল বার কয়েক। তারপর আর্তস্বরে বলে উঠল আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচতে দাও—আমার ছেলে দুটোকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচতে দাও—ওদের বাঁচতে দাও!

এবারে নির্বাক বিমূঢ় বন্দনাই।

লোকটা যা বলে চলেছে, কানের ভিতর দিয়ে সেটা কোথায় কোন্ দিকে যাচ্ছে ঠাওর করতে পারছে না।—তুমি ন'মাস ধরে যা দেখেছ যা বুঝেছ তার সব ঠিক—এক বর্ণও মিথ্যে নয়—সব ঠিক সব ঠিক। কিন্তু তার আগের খবর তুমি জানো না—তারও দু'বছর আগে থেকে তোমাকে দেখেছিলাম—দেখে চলেছিলাম, তারপর থেকে তোমার চিন্তায় বিভোর হয়ে আছি—তোমার প্রত্যেক অভিনয়ে আমি নিয়মিত যেতাম শুধু তোমাকে দেখব বলে—শেষে শুধু তোমাকে সামনে রেখেই এই ছবির গল্প লিখেছি, প্রোডিউসার যোগাড় করে তোমার কাছে গেছি—আমি জানি আমার এই বয়েস—দু-দুটো ছেলে—কাপুরুষের মতো নিজেকে প্রকাশ করতে পারলাম না, কাণ্ডজ্ঞান খোয়াতে লাগলাম—আর দিনে দিনে পাগল হতে লাগলাম।

জড়িয়ে ধরা হাত দুটো থর থর করে কাঁপছে বন্দনা টের পাচ্ছে। লোকটা আস্তে আস্তে মাথা তুলল। চুলের গোছা মুখে এসে পড়েছে। এক হাতের ঝাপটায় সরালো। নিনিমেষে দেখল বন্দনাকে। দু'চোখের কোণ চিকচিক করছে। চাউনি এখনো উদভ্রান্ত।—আজ আমি ঠিক করেছি হয় সুস্থ মানুষের মত বাঁচব নয়তো এ-যন্ত্রণা শেষ করব—আমি ছেলেদের নামে শপথ করছি তুমি সরে গেলে আর আমি তোমাকে বিরক্ত করব না—তুমি সরে গেলে সুবীর রায়ের নাম চিরদিনের মতো মুছে যাবে—এখন তুমি শুধু বলে দাও আমি বাঁচব না মরব—বলো—বলো—!

কোলে মুখ গুঁজে পাগলের মতো আবারও জোরে জোরে মাথা ঘষতে লাগল।

বন্দনা এত স্থির এত শান্ত হয়ে গেল কি করে নিজেও জানে না। ঘৃণা বিদ্বেষ রাগের ছিটে ফোঁটাও নেই আর। কিছু যেন আর চিন্তা করার নেই, ভাববারও না, ভেতরটা এমনি প্রশান্ত। একটা হাত তার মাথার ওপর উঠে এলো সামান্য ঠেলতেই মানুষটা আস্তে আস্তে মাথা তুলল। বন্দনা এবারে নিজের হাতে তার মাথার চুলগুলি কপালের ওপর থেকে সরিয়ে দিল।

দু'চোখে এবারে আশার অব্যক্ত আকুতি।—বলো—বলো—আমি বাঁচব ছেলে দুটো বাঁচবে?

চোখে চোখ, বন্দনার ঠোঁটে হাসির আভাস। দু'হাতে তার কানের দু'পাশ ধরা। মাথাটা আস্তে আস্তে কাছে টানল নিজে ঝুঁকল। শুকনো খরখরে দুই ঠোঁটে নিজের দুই অধরের নিবিড় স্পর্শে জানিয়ে দিল, বাঁচবে কি বাঁচবে না।

॥ চার ॥

'ব্যক্তিত্ব' ছবির মুক্তি আরো আট মাস বাদে।

প্রযোজক কোঠারি এই কারণে তার ডাইরেক্টারের প্রতি ক্ষুব্ধ। কারণ একটা মাস শুটিং বন্ধ ছিল। অবশ্য তাকে জানিয়েই পনেরো দিনের ছুটি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুরো এক মাসের আগে কেউ তার টিকির নাগাল পায়নি। তার সহকারী মাধব ঘোষ খোঁজ নিতে এসে দেখে বাড়ি তালা বন্ধ। তার পরেও ছবির বাকী দু'আনা কাজ শেষ করতে সুবীর রায় তিন মাস সময় নিয়েছে। বন্দনা উঠতে বসতে না ধমকালে তার মধ্যেও শেষ হত কিনা সন্দেহ। এরপর আনুসঙ্গিক যাবতীয় ব্যাপার শেষ হতে আরো দেড় মাস। রিলিজ চেন একবার বাতিল হবার ফলে নতুন চেন পেতে আরো আড়াই মাস। প্রযোজকের অসহিষ্ণু হয়ে ওঠা স্বাভাবিক।

স্টুডিওর পর্দায় রাশ প্রিন্ট এতবার করে দেখা হয়েছে যে সুবীর রায়ের গল্পের প্রতিটি খুঁটিনাটি আর প্রতিটি ডায়লগ মুখস্ত। সেই সঙ্গে

আনন্দের জোয়ারে মনের সর্বকূল কানায় কানায় ভরাট। এই সব কারণেই হয়তো ছবিতে সংগতির অভাবগুলো খুব চোখে পড়েনি। নায়িকার মুখ খুব একটা ভালো দেখাচ্ছে না, কিন্তু বাস্তবে যে মুখ সারাক্ষণ দেখছে তখন মনের চোখে তারই প্রভাব বেশি। ফলে ছবির নায়িকাকে দর্শকরা খুব একটা রূপসী না-ও ভাবতে পারে সে-চিন্তা মাথায় ঢোকেনি। কেবল মনে হয়েছে আরো একটু ভাল হলে ভাল হত। আর বা ইউনিটের কারো ডায়লগ বুঝতে অসুবিধে না হলেও সাউণ্ড তেমন ভাল হয়নি এ-ও মনে হয়েছে, কিন্তু স্টুডিও থেকে আশ্বাস পেয়েছে ফাইনাল প্রিণ্টে অনেকটাই ঠিক হয়ে যাবে।

রিলিজের আগে ছবিটা বন্দনাকে একবার দেখানোর ইচ্ছে ছিল সুবীর রায়ের। রাগত মুখে বন্দনা বলেছে, বেইমানি করে এখন বলতে লজ্জা করে না—এই মূর্তিতে এখন আমি চেনা জানা লোকগুলোর মধ্যে যাব!

মাথা চুলকে সুবীর রায় জবাব দিয়েছে, এতে লজ্জার কি আছে—বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েদের এই মূর্তি তো কখনো সখনো হবেই।

বন্দনা রাগ দেখিয়েছে, কিন্তু যথার্থই রাগ খুব হয়নি। অবশ্য লোকটাকে আগে থাকতে সতর্ক করেছিল। তাই রাগ দেখাতে সুবিধে। কিন্তু ভোগের দুর্বার তাড়নার মুহূর্তগুলিতে সে নিজেও অকরুণ হতে পারেনি। একটা মাস যেতেই ব্যতিক্রম অনুভব করেছে। তখন রাগারাগি করেছে, বকাবকি করেছে। আর তাই নিয়ে ছবিটাও শেষ করেছে। তারপর একটু একটু করে নিজের ভিতরে আর একজনের অস্তিত্ব অনুভব করেছে। ধীরে ধীরে দেহের ছাঁচ বদলাচ্ছে। কিন্তু সুন্দর মুখের সুষমা বাড়ছে।

ছেলে দুটো যে সত্যি এমন হাড় পাজি, বিশেষ করে বড়টা, বন্দনার ধারণা ছিল না যদিও ওদের বাপ বিয়ের আগে থেকে বলে আসছে বড়টা যেমন শয়তান তেমনি গোঁয়ার। বন্দনা এখন ছোটমা ওদের এই ছোট-মাকে একেবারে তাদের ঘরে পেয়ে দুজনেই খুশি খুব। বাপের শাসন বা মারধোর বহি এখন থেকেই কেয়ার

করে না। কিন্তু ছোটমা কিছু বললে শোনে। বন্দনা যদি বলে তোরা এত পাজি হলি কি করে? মিটিমিটি হেসে বঙ্কি জবাব দেয়, বাবার জন্যে। বাবার মারের হাত থেকে বাঁচালে দীপুটা এখনো ভালো হতে পারে। বারো পার হয়নি বঙ্কির, সেই ছেলে ইদানীং ছোট মায়ের দিকে চেয়ে থাকে আর অল্প-অল্প হাসে। এই হাসি আর দেখার অর্থ কয়েক দিনের মধ্যেই বোঝা গেছে। দীপু সরাসরি এসে তাকেই জিগ্যেস করেছে, ছোটমা, আমাদের ভাই হবে?

বন্দনা থমকে দাঁড়িয়েছে। ভ্রু কুঁচকে তাকিয়েছে ওর দিকে। মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পেরেছে এটা ওর কথা নয়।—তোকে কে বলল?

—দাদা যে বলল, ভাই হবে তাই তোমার শরীর বদলাচ্ছে, দেখতে আগের থেকেও অনেক সুন্দর হয়েছে—

দাদা অদূরে দাঁড়িয়ে টিপটিপ হাসছিল। বন্দনা সোজা ওর কাছে গিয়ে শক্ত হাতে কাঁধের কাছটা ধরল, একটা ছোট ঝাঁকুনি দিয়ে ধমকের সুরে বলল, তোকে এ সব কথা কে শিখিয়েছে?

জবাবে বঙ্কির চোখে মুখে সেই রকমই মজার হাসি। ভয়ের চিহ্নও নেই। ওদিকে ঘরের ভিতর থেকে ওদের বাবাও শুনছে, হাসছে।

বন্দনা এবারে কাঁধ আরো চেপে ধরে একটু জোরেই ঝাঁকুনি দিল, বল্ শিগগীর, নইলে আজ তোকে আমিই মারব!

মুখে হাসিটুকু তেমনি লেগে আছে, এবারে মুখ খুলল।—ছোটমা, আমার হাতের এক ধাক্কা খেলে তুমি উল্টে পড়ে যাবে—আমাকে বাবার মতো শাসন করতে এসো না।

বন্দনা রাগ দেখাচ্ছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে সত্যি রাগ হয়ে গেল। কাঁধ ছেড়ে বন্দনা আচমকা ফর্সা গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল।—দে ধাক্কা, দেখি কত সাহস···

দু'ভাইয়ের কেউ এটা আশা করেনি। দুজনেই হকচকিয়ে গেল। দু'জনেই ওরা হঠাৎ নতুন কাউকে দেখছে যেন। বঙ্কির টকটকে

গালে লাল দাগ পড়ে গেল। এদিকে ওদের বাবা ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে। সে বেরিয়ে এলো, তার হাতে বেতের ছড়ি।— ওতে হবে না, সরো—

বঙ্কিকে আগলাতে গিয়ে বন্দনা সেই মুহূর্তে ওইটুকু ছেলের চোখে কি দেখছে জানে না। নিজের ভিতরেই ছোট-খাটো ঝাঁকুনি একটা। বাপের দিকে চেয়ে বঙ্কির দু'চোখে আগুন ঠিকরোচ্ছে আর গলগল করে ঘৃণা ঠিকরোচ্ছে। দীপুর দিকেও তাকালো। ওর চোখেও আগুন যত না, ঘৃণা তার থেকে বেশি।

সুবীর রায় আবার ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, তুমি সরে এসো না, ও যা বোঝে তাই বুঝিয়ে দিচ্ছি!

এবার রাগে মুখ লাল বন্দনার। এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়ালো।— তুমি এখানে কেন? তোমাকে কে এখানে শাসন করতে ডেকেছে? শাসনের কিছু জানো তুমি? বেত হাতে নিলেই শাসন হয়? আমি কথা বলছি শাসন করছি দেখেও কেন তুমি বেরিয়ে এলে? যাও— ঘরে যাও বলছি!

ভ্যাবাচাকা খেয়ে সুবীর রায় দ্রুত ঘরে ফিরে গেল। এদিকে দু' ভাইই এই ক'টা মুহূর্তের মধ্যে ছোট মায়ের আবার এক নতুন মূর্তি দেখল যেন। তাকে আরো একটু দেখে নিয়ে বঙ্কি সরে গেল। দীপুর আট পেরিয়ে নয় চলছে, কিন্তু এখনো ফাঁক পেলে ছোটমাকে আগের মত জড়িয়ে ধরে। কাছে এসে তেমনি জড়িয়ে ধরে বলল, ছোটমা তুমি দাদাকে চড় মারলে কেন—দাদা খুব অন্যায় করেছে?

চড়টা মেরে বসার পর বন্দনার ভেতরে ভেতরে একটু দুঃখ হচ্ছে। গম্ভীর মুখেই জবাব দিল, হ্যাঁ। মাকে ধাক্কা মেরে উল্টে ফেলে দেবার কথা বলে খুব অন্যায় করেছে।

—আমি দাদাকে বলে দেব, তুমি দাদার ওপর রাগ কোর না ছোটমা—আমি জানি দাদা তোমাকে খু-উ-ব ভালবাসে।

হয়তো দাদার খোঁজেই ছুটল সে। এবারে আস্তে আস্তে নিভা বন্দনার কাছে এগিয়ে এলো। হোটেলে থাকতেই দিদিমণির কাছে

থাকার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। বিয়ের খবর পেয়ে সেই যে এসে হাজির হয়েছে আর ওকে নড়ানো যায়নি। অবশ্য ও চলে আসাতে বন্দনার সুবিধেই হয়েছে।

কাছে এসে চাপা ত্রাসে বলল, দিদিমণি, কক্ষনো তুমি ওদের গায়ে হাত তুলো না, বিশেষ করে ওটুকু বয়সে বড় ছেলেটা যেভাবে তাকায়, দেখে হাসে---আমার ভয়ই করে গো!

বন্দনা বিরক্ত। ঈষৎ ঝাঁঝালো গলায় জবাব দিয়েছে, ওরা একটুও খারাপ না---তোমার ভয়ের কি আছে!

এই বক্তির ওপরেই আবার একদিন আর এক ধরণের রাগ বন্দনার। সেদিনও ইচ্ছে করেছিল ঠাস করে গালে এক থাপ্পড় বসিয়ে দেয়। দেয়নি কারণ দিলে সেটা নিজের গালেই থাপ্পড় বসানোর মতো হত।

সকাল থেকেই একটু চাপা উত্তেজনার মধ্যে কাটছিল। বন্দনার আর সুবীর রায়ের তো বটেই---নিভারও। আজ তিনটের সময় কলকাতার তিন বড় হলে আর মফঃস্বলের অনেক জায়গায় 'ব্যক্তিত্ব' ছবির রিলিজ। আজই ছবিটা দেখে আসার জন্য অনেক বার বায়না করে নিভা হতাশ হয়েছে। বন্দনা বলেছে, আগে একটু পুরনো হোক, একদিন রাতের শোয়ে এক-গলা ঘোমটা টেনে তোমাতে আমাতে দেখে আসব।

আজ সকালের সমস্ত কাগজে নতুন ছবি রিলিজের খবরের সঙ্গে বন্দনার ছবিও ছাপা হয়েছে। কোনো কাগজই কিনতে বাকি ছিল না। কিন্তু নিজের একটা ছবিও পছন্দ হয়নি বন্দনার।

ছবির ব্যস্তসমস্ত পরিচালক খেয়ে-দেয়ে বারোটার সময় বেরিয়ে গেছে---ম্যাটিনি আর ইভনিং দুটো শোয়ের পরে বাড়ি ফিরবে বলে গেছে। গত দু'দিন যাবত সুবীর রায়ের নাওয়া খাওয়ার ফুরসত মেলেনি।

বিকেলে দীপু একা স্কুল থেকে ফিরল। ঘুরে ফিরে বন্দনা তখনো ছবিটার কথাই ভাবছিল। এখন সাড়ে চারটে···প্রথম শোয়ের

মাঝামাঝি। এ-সময়ে কোন্ জায়গাটা হচ্ছে মনে করতে চেষ্টা করছে। স্কুল থেকে ফেরা মাত্র দীপুর পেটে আগুন জ্বলে। ওকে দেখে বন্দনা বিমনা হয়েই জিজ্ঞেস করল, বঙ্কি কোথায় ?

দীপু সাদাসাপটা জবাব দিল, দাদা তো টিফিনের পরেই স্কুল থেকে পালিয়েছে—খোঁজ করতে দাদার ক্লাসের ছেলেরা বলে দিল। যে-ভাবে বলল যেন দাদার স্কুল পালানোটা নতুন কিছুই না।

বন্দনার মাথা থেকে ছবি সরল।—দাদা স্কুল পালায় ?

বেফাঁস বলে ফেলে দীপু সাবধান হল। তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল। —বেশি না, কখনো-সখনো ইচ্ছে হলে পালায়—দাদার ইচ্ছে হলে কে আর তাকে আটকে রাখবে।

খুব গর্বের কথা যেন। শুনে বন্দনা রীতিমত বিরক্ত। ভাবল, এটা বন্ধ করতে না পারলে দাদাগত-প্রাণ ছোটটারও মাথা খাওয়া হবে। বড়টাকে নিয়ে বন্দনার দুশ্চিন্তা বেড়েই চলেছে।

বঙ্কি ফিরল সন্ধ্যার একটু আগে। বন্দনা তখন নিজের ঘরে। এখনো ছবির কথাই ভাবছিল। বইখাতা ফেলেই বঙ্কি হাসি মুখে ঘরে হাজির। পিছনে দীপু।—ছোটমা, তোমার ছবি দেখে এলাম।

বন্দনা শুনেই ধড়ফড় করে উঠল একটু।—স্কুল পালিয়ে তুই ছবি দেখে এলি !

—বাঃ, বাবার ডিরেকশন, তোমার ছবি—আমি প্রথম দিন দেখব না তো কে দেখবে !

স্কুল পালানো ছেলেকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি কেমন হয়েছে জিজ্ঞেস করা গেল না। বন্দনার তক্ষুনি অন্য চিন্তা।—আজ গিয়ে তুই আজই টিকিট পেয়ে গেলি !

যেমন হাসে।—তা কখনো পাওয়া যায়, হাউস ফুল, টিকিট ব্ল্যাক হচ্ছে—আমি কি অত বোকা, আজ টিকিট পাওয়া যাবে না বলে যেদিন বুকিং শুরু সেদিনই লাইন দিয়ে ম্যানেজ করে রেখেছিলাম।

হাউসফুল আর টিকিট ব্ল্যাক হচ্ছে শুনে বন্দনা সন্তর্পণে একটা হালকা নিশ্বাস ফেলল। একটা দুশ্চিন্তার বোঝা সরে যাচ্ছিল, কিন্তু

তার মুখের দিকে চেয়ে দুষ্টু দুষ্টু হেসে এবারে বঙ্কি বলল, ছবিটা বাবা একদম বাজে করে ফেলেছে, হলসুদ্ধ চিৎকার চেঁচামিচি গালাগাল—কথা বোঝা যায় না—আর তোমার চেহারাও ততো ভাল ওঠেনি—ভাল কথা-বার্তা শোনা যায় না—বিচ্ছিরি! সবাই বলাবলি করছে এই ছবি দাঁড়িয়ে মার খাবে।

তখনই থাপ্পড়টা বসিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল বন্দনার।···কিন্তু একটুও বাড়িয়ে বলেনি। এক সপ্তাহের মধ্যেই ছবির ভবিষ্যত বোঝা গেছে। দেখে বন্দনাও শুধু হতাশ হয়নি, অবাকও হয়েছে। ছবির এত ক্রুটি মানুষটার চোখে পড়ল না কি করে ভেবে পায়নি। মুখ কালো করে সুবীর রায় বাড়িতে বসে ফুঁসেছে।--রাসকেলগুলো সব ষড়যন্ত্র করে ডুবিয়েছে আমাকে—পরের ছবিতে আমি সব ক'টা টেকনিশিয়ানকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়াব! মাধব ঘোষ পর্যন্ত বুক ফুলিয়ে বার বার বলেছে, এ-ছবির মার নেই। কেবল কথা আর কথা, কাজের নামে সব অষ্টরম্ভা।

কাগজের সমালোচনায় গল্পের নিন্দে, লাইট সাউণ্ড মিউজিকের নিন্দে, সব থেকে বেশি পরিচালকের নিন্দে—প্রশংসা যা কেবল একটু নবাগত নায়িকার ভূমিকায় বন্দনা রায়ের অভিনয়ের—ভাল পরিচালকের হাতে পড়লে ভবিষ্যতে তার প্রতিশ্রুতির সম্ভাবনাও দেখেছে কেউ কেউ। কাগজের সমালোচনা পড়ে সুবীর রায় নিষ্ফল আক্রোশে গজরেছে কেবল।

সন্তান এসেছে। মেয়ে। বন্দনা বা সুবীর রায় কেউ অখুশি নয় তাতে। আর সব থেকে ফুর্তি ছেলে দুটোর। তিন মাস না যেতে মেয়ে কোলে নেবার মতো বেড়ে উঠতে তারা জ্যান্ত পুতুলের ডেলা পেয়েছে একটা। মুখের সামনে মুখ আনলে শব্দ করে হাসে। তাই দেখে আর শুনে দীপু হাত তালি দিয়ে ওঠে। বঙ্কি দেখে আর মিটি মিটি হাসে। মেয়েটা আসার পর বড় ছেলে অর্থাৎ বঙ্কিরই

বেশি পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে বন্দনা। স্কুল থেকে ফিরে কোনরকমে মুখে-হাতে জল দিয়েই ছুটে এসে বোনের কাছে বসবে, কোলে নেবে, দোলাবে আর মুখের দিকে চেয়ে টিপটিপ হাসবে। তার মুখে কথা বেশি নেই সবই হাতে। আবার ভাইকে উপদেশ দেবে, এই ভাবে নে, এই ভাবে ধর—দেখিস না কত নরম! কান্না শুনলেই পড়া ফেলে বা খাওয়া ফেলে বঙ্কি সবার আগে ছুটে আসবে। নিভাকে ধমকাবে, কেন কাঁদে বুঝতে চেষ্টা করতে পারো না?

বন্দনা মেয়ের নাম রাখল মধুমিতা। ডাকা হবে মিতা। কিন্তু বঙ্কির আদরের নাম মধু। ওই নামে বোনের সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা। আর টিপটিপ হাসি।—তুই মধু। তোর হাসি মধু। তোর কান্না মধু। তোর হাত-পা ছোঁড়া মধু। তুই একখানা মধুর ডেলা—বুঝলি? হেসে দে তো?

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরও ফিকফিক হাসি।

চার মাসের মধ্যে এমন হল, যে বঙ্কিকে দেখলেই হাত ছুঁড়ে পা ছুঁড়ে মুখ দিয়ে নানা রকম শব্দ বার করে মেয়ে ওর কাছে যাবার জন্য অস্থির। ওকে দেখলে মায়ের কোলও আর পছন্দ নয়। ছেলেটার অন্য দুষ্টুমি একটুও কমেনি, বরং আরো বেপরোয়া হয়ে উঠছে। কিন্তু কেবল বোনের কাছে আসতে দেওয়া হবে না বা বোনকে ধরতে দেওয়া হবে না বললে বেশ দমে যায়। বন্দনা এই দুরন্ত ছেলেকে কিছুটা বশে আনার একটা রাস্তা পেয়েছে।

মধুমিতার জন্মের আগে দু'আড়াই মাস আর পরের এই চার মাস ধরে বাড়ির খুশির হাওয়ায় টান ধরেছে অন্য কারণে। সুধীর রায়ের মন মেজাজ ক্রমে খিটখিটে হয়ে উঠছে। সকালে বেরোয়, দুপুরে ফেরে। খেয়ে দেয়ে আবার বেরোয়, রাতে ফেরে। বন্দনা একদিনও কিছু জিগ্যেস করে না। মুখ দেখেই বুঝতে পারে খবর দেবার মতো কিছু নেই। প্রথম প্রথম তার সঙ্গে আলোচনায় বসত, পরামর্শ করত। এখন তা-ও করে না। মানুষটা মনের দিক থেকে তেমন সবল হলে বন্দনা কিছু মাত্র ভাবত না। তা নয় বলেই আরও

দুশ্চিন্তা। ছবিটা এভাবে মার খাওয়ার দায় থেকে বন্দনা নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেখে না। যদিও গল্পের আর অন্য যে-সব ত্রুটির কথা তার মনে এসেছিল ওই লোক সে-সব শোধরালেও ছবি এতটা খারাপ হত না হয়তো। তাছাড়া লাইট আর সাউণ্ড এত খারাপ হওয়া সত্ত্বেও এদের সেটা চোখে পড়ল না কেন ভেবে অবাক লাগে। এত খারাপ তো সুবীর রায়ের আর কোনো ছবি হয়নি। কিন্তু দুঃখ পাবে বলেই বন্দনা আলোচনা এড়িয়ে চলে।

....এরই মধ্যে অনটনের ছায়া পড়ছে। এ-রকমটা হতে পারে সুবীর রায় ভাবেনি বলেই বন্দনাও ভাবেনি। লোকটার খরচের দরাজ হাত। বিয়ের পর সেই হাত আরো খুলে গেছল। বেড়াতে বেরিয়ে মনের আনন্দে খরচ করেছে, ওর জন্য দামী দামী শাড়ি কিনেছে, কিছু গয়নাও জোর করেই গড়িয়ে দিয়েছে। নিত্যি ভাল হোটেল রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতে চেয়েছে। এদিকে বন্দনাও ছবির পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করে ফেলেছে অন্যভাবে। প্রথমেই বাড়িটার শ্রী ফেরানোর দিকে মন দিয়েছিল। ভিতরের কাঁচা উঠোন বাঁধিয়ে পাকা করেছে। রান্নাঘর বাথরুমের ভোল বদলে দিয়েছে। বাড়িতে নতুন রঙের কাজ হয়েছে, দরজা গুলোয় তেল রঙের কাজ। বসার ঘরটা সংস্কার করে নতুন আসবাবপত্রে তকতকে করে সাজিয়েছে। নিজেদের শোবার ঘরের দেয়াল কেটে বক্স-রুম করা হয়েছে। কোন আধুনিক বেড-রুমে লেপ-বালিশ-টালিশ খাটে পড়ে থাকে না, বক্স-রুমে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু ওই বক্স-রুম আবার সোজাসুজি চোখে পড়লে বিচ্ছিরি। বেড়াতে বেরিয়ে বন্দনা ভারী সুন্দর কাজ করা একটা শৌখিন ওয়াল ম্যাট্রেস কিনে এনেছিল। বক্স-রুমের ওপর দিয়ে সেটা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে ঘরের শোভা বেড়েছে, ওটা না সরালে বক্সরুমও চোখে পড়ে না। এই সব করতে বন্দনার সিনেমার পাওয়া টাকা অন্তত শেষ। আর অন্য জনের জমানো টাকা তো ডানা মেলে উড়েছে।

বন্দনা নিশ্চেষ্ট বসে আছে দেখেও সুবীর রায় বিরক্ত।—তোমার

স্বাস্থ্য চর্চা এখনো শেষ হয়নি? মেয়ের তো চার মাস বয়েস হল, নিভার কাছে বেশ থাকতে পারে।

মুখের দিকে চেয়ে বন্দনা কি বলতে চায় বুঝতে চেষ্টা করে।—আমি তোমার পার্টি যোগাড়ের চেষ্টায় বেরুব নাকি?

সুবীর রায় তেতে ওঠে, আমার-তোমার কি আছে— ইণ্ডাস্ট্রির সঙ্গে একটু যোগাযোগ রাখতে হয়— কারোই ঘরে বসে থাকলে চলে না—তাছাড়া এখনো বলতে গেলে নতুন আর্টিস্ট তুমি, এক ছবিতে যারা মাত করে দেয় তোমার সেই বরাতও নয়—পার্টি কি ঘরে এসে ডেকে নিয়ে যাবে? এক ছবি করেই যে তুমি ফুরিয়ে যাওনি তা-ও লোকের জানা দরকার—তা ছাড়া যে-লাইনের যা দস্তুর, একটু দহরম-মহরম সকলেই চায়, তাতে কাজও হয়।

কি বলতে চায় বন্দনার বুঝতে সময় লাগেনি। প্রথমে রাগ হয়েছে, পরে হাসি পেয়েছে। আর শেষে চিন্তিতও একটু হয়েছে। রাগ হয়েছে কারণ, এই দহরমের অর্থ সোজা। এই জন্যেই লোকটা ইদানীং মাঝে মাঝে ওকে বেশ যাচাইয়ের চোখে লক্ষ্য করে। মেয়ে আসার দরুণ স্বাস্থ্য কোন দিনই ভেঙে পড়েনি। এখন তো মেয়ের মা কেউ বলবেই না, ঠিক আগের মতই। নিভার বিবেচনায় আগের থেকেও ভাল। ওরও খুব ইচ্ছে দিদিমণি আবার অভিনয়ে নামুক। তাই বলে, আগের থেকেও তোমাকে এখন কাঁচা আর সুন্দর লাগে দিদিমণি, এখন ছবি করতে চাইলে তোমাকে লুফে নেবে। নামী-নামী মেয়েগুলোরও বেশির ভাগ চেহারার যা ছিরি—কেউ প্যাকাটি কেউ ধুমসি, অথচ মেক-আপ আর ছবি তোলার কায়দার দৌলতে সব উতরে যাচ্ছে—তুমি ওদের থেকে ঢের সুন্দর।

নিজেকে আয়নায় দেখে না বন্দনা এমন নয়। আর ভবিষ্যত চিন্তা আছে বলেই খেয়ে ঘুমিয়ে দিন কাটায় না। স্বাস্থ্য তাজা রাখার জন্য যেটুকু করা দরকার সকলের অগোচরে তা-ও করে। সুন্দরী মেয়ে সহচরী হলে পুরুষের দরবারে অনেক সময় যে সুবিধে হয়, ইণ্ডাস্ট্রিতে বেরুনোর নামে এখন সেই সুবিধের দিকেই মানুষটার চোখ গেছে।

সেই জন্যেই বন্দনার রাগ আর হাসি। আর লোকটা এ-ভাবে নিজের ওপর আস্থা খুইয়ে বসছে দেখে চিন্তাও। আগের ছবি যেমনই হোক বন্দনার মনের জোর একটুও কমেনি। নিজের এই জোরের দিকটার ওপর বরাবর অটুট আস্থা।

মেয়ে হবার পর বন্দনার এই রূপের প্রথম সমজদার সুবীর রায়ের প্রথম অ্যাসিস্ট্যান্ট মাধব ঘোষ। ডিরেক্টার বাতিল তাই তারও কাজ নেই। মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় দুঃসময় চলছে।

এক দুপুরে হঠাৎই বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। সুবীর রায় বাড়ি নেই। ছেলে দুটো স্কুলে। নিভা ঘুমে অচেতন। ঘন ঘন কড়া নাড়ার শব্দ শুনে বন্দনা ভাবল কোনো কারণে স্কুল ছুটি হয়ে গেছে, ছেলে দুটো বাড়ি ফিরে এত জোরে কড়া নাড়ছে। বিরক্ত মুখে উঠল। বেরিয়ে এসে দরজা খুলল।

সামনে বিকশিত বদন মাধব ঘোষ।

তাকে দেখে বন্দনা বেশ অবাক।—কি ব্যাপার, এ-সময়ে ?

জবাব দিতে ভুলে গিয়ে মাধব ঘোষ তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। এমনটা দেখবে আশা করেনি। পরণে আটপৌরে সাদা লাল ডুরে শাড়ি, খোলা চুল পিঠে ছড়ানো। তা সত্ত্বেও মাধব ঘোষের মনে হল সর্ব অঙ্গ দিয়ে রূপ ঠিকরে পড়ছে।

বন্দনা গম্ভীর একটু। এই লোকের লুব্ধ চাউনি কম দেখেনি। জিগ্যেস করল, এ-সময়ে···কি ব্যাপার ?

দরজার সামনে থেকে সরে যায়নি, তাকে ভিতরে আসতেও আপ্যায়ণ করেনি। মাধব ঘোষের পান-খাওয়া ঠোঁটে হাসি চুয়ে পড়ছে। জবাব দিল, ব্যাপার কি এখানে দাঁড়িয়েই বলতে হবে, ভিতরে ঢুকতেও দেবেন না নাকি।···দাদা এখন স্টুডিওতে নিশ্চয় ?

জবাব না দিয়ে বন্দনা এবার সরে দাঁড়াল।—আসুন।

নিজে আগে বসার ঘরের দিকে চলল। পিছনে মাধব ঘোষ। ফিরে না তাকিয়েও বন্দনা অনুভব করছে, দুটো পিচ্ছিল চোখ তার গায়ের সঙ্গে আটকে আছে। আর এও নিশ্চিত জানে দাদা এ-সময়

সাধারণত বাড়ি থাকে না জেনেই এসেছে। কেন এসেছে তা [illegible] অনুমান করতে পারছে না।

মাধব ঘোষ একটা সোফায় আরাম করে বসল বন্দনা সামনে দাঁড়িয়ে। লোকটা আর এক-দফা তাকে দেখে নিয়ে তরল গলায় বলে উঠল, বাড়িতে বিশ্রাম পেয়ে পেয়ে আপনি তো খাসা আছেন দেখছি বউদি—

আগে ম্যাডাম বলত। আজকের অন্তরঙ্গতায় সেটা বউদিতে দাঁড়িয়েছে। বন্দনার ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসির ফাটল দেখা দিল কি দিল না। দিনে কোনদিন ঘুমোয় না, তবু বলল, আপনি কি এই দেখার জন্য ভর দুপুরে এসে আমার ঘুম ভাঙালেন নাকি?

লুব্ধ চাউনি মুখের ওপর থেকে নড়তে চায় না, তবু অপ্রস্তুত ভাব দেখানোর চেষ্টা —না, আমি একটা অফার নিয়েই এসেছি ও কি, আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন—

কথা না বাড়িয়ে বন্দনা সামনের সোফায় বসল মাধব ঘোষ ফোঁস করে একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, দাদা বেকার, ফলে আমিও। পার্টির খোঁজে দাদা হন্যে হয়ে ঘুরছে, আমিও বসে নেই। এখন একটা পার্টির সঙ্গে আমার কিছু কথা-বার্তা এগিয়েছে, তেমন বড় পার্টি নয় টাকার জোরও খুব একটা নেই—তাইতেই অবশ্য আমাদের একটু সুবিধে হয়েছে—স্টার হিরোইনের খাঁই জানে, সেই জন্যেই আপনাকে নায়িকার ভূমিকায় নিতে রাজি—এখন আপনার আপত্তি না হলে আর অল্প টাকায় রাজি হলে আমি কথা-বার্তায় এগোতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে মুখে চটুল হাসি, আপনাকে দেখলে তারা একেবারে খুব কম টাকা দেবে না এ অবশ্য আজ আপনাকে দেখার পর আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।

এই সব লোকের কাছ থেকে বন্দনা খুব একটা সুশালীন কথা-বার্তা আশা করে না, তবু ভুরুর মাঝে ভাঁজ পড়ল একটু। বলল, তা এ-সব কথা আপনার দাদার সঙ্গে না বলে আমার সঙ্গে কেন?

মাধব ঘোষ চক্ষু লজ্জার ধার ধারে না। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল,

কারণটা বুঝতেই তো পারছেন--ডিরেক্টার হিসেবে তারা দাদাকে নিতে রাজি নয়, তাদের অন্য ডিরেক্টর ঠিক করা আছে। প্রোফেসন্যাল হিসেবে আপনি যদি এ লাইনে আসেন তাহলে কেবল দাদার ছবিতেই অভিনয় করতে হবে এমন কি কথা।

ঘরের লোকের অনুপস্থিতিতে কেন আসা সেটা স্পষ্টই বোঝা গেল। বন্দনা জবাব দিল, এ আলোচনাও তো আপনি দাদার সঙ্গে করলেই পারতেন, তাঁর অমতে তো আমি কোথাও কাজ করতে পারব না।

এবারে ইতস্তত করে মাধব ঘোষ বলল, তাঁর মত নেবার দরকার হলে সেটা আপনিই নিন, আমি তাঁকে বাদ দিয়ে বলতে গেলে দুঃখু পাবেন। আমাকে তো উনি খুবই ভালবাসেন।

—ঠিক আছে। জিগ্যেস করে রাখব।

আবারও দ্বিধাগ্রস্ত মুখ মাধব ঘোষের।—তাহলে একটা কথা, এই অফার আমি এনেছি আপনি যেন বলবেন না- উনি রাজি হলে পরে তো জানতেই পারবেন, রাজি না হলে মিছিমিছি আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন।

বন্দনা এবারে ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, এ অফারের কথা তাহলে বলবই না—পার্টিকে আপনি অন্য হিরোইন দেখতে বলুন।

এবারে মাধব ঘোষের কথার স্বর বাঁকা।—আপনি রাজি না হলে তাই বলব।... কিন্তু আপনার হল গিয়ে অভিনয়ের কেরিয়ার আর দাদার ডিরেকশনের—দুটোকে এক করে ফেললে আপনার দিক থেকে অন্তত সুবিধে হবে না এটা জেনে রাখতে পারেন, এ-লাইনে আমি অনেক তো দেখলাম- -তাহলে ভেবে দেখুন, আমি উঠি—

—হ্যাঁ আসুন। বন্দনা আগেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

দরজার কাছে এসে মাধব ঘোষ আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে পান-খাওয়া লালচে দাঁত বার করে হাসল।—তা বলে আপনাকে আর দাদাকে নিয়েও পার্টির খোঁজে নেই এ যেন ভাববেন না—আমি চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছি।

না, বন্দনা পরেও ঘরের লোককে মাধব ঘোষের অঙ্কার সম্পর্কে কিছুই বলল না, মাঝখান থেকে তিক্ততা সৃষ্টি হবে, কিছুই লাভ হবে না।

আরো মাস দেড়েক বাদে মানুষটার নিষ্প্রভ মুখে একটু আশার আলো দেখল বন্দনা। রাতে হাসিমুখে বাড়ি ফিরে ওকে বলল, কাল সকাল সাড়ে ন'টার সময় কোঠারির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট—আমাদের আগের ছবির প্রোডিউসার জগমোহন কোঠারি—তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছে।

—ছবি করবে ?

—ছবি তো একের পর এক করেই চলেছে, এখন আমাদের নিয়ে যাতে করে সেই চেষ্টা করছিলাম—এত দিনে ডেকেছে।

পরদিন ঠিক সময় ধরে দুজনে কোঠারির বাড়ি গেছে। কিন্তু বন্দনা লক্ষ্য করল, ওকে পাশের ঘরে বসিয়ে এদিন আর এই লোক পাশের ঘরে চলে গেল না। নিজেও বসে বেয়ারার হাতে স্লিপ পাঠালো। মানুষটার আড়ষ্ট ভাব বন্দনার নজর এড়ালো না। একটু বাদে সেক্রেটারি বেরিয়ে এসে বন্দনাকে ডাকল, আপনি আসুন—

বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে সুবীর রায়ও উঠে দাঁড়িয়েছিল। সেক্রেটারি তাকে বলল, আপনি বসুন—মিস্টার কোঠারি শুধু একেই ডেকেছেন।

অপ্রস্তুত হয়ে বসে পড়ল। তার পরেই সামলে নিয়ে হেসে বন্দনাকে বলল, ঠিক আছে, তুমি আগে যাও—গল্পের কথা উঠলে শেষের ওই সোশাল গল্পটার কথা বোলো—উনি সীরিয়াস গল্প পছন্দ করেন। সেক্রেটারি আগে এগিয়ে যেতেই পলকে চোখের ইশারায় যা বোঝালো তার সাদা অর্থ, লোকটাকে ঘায়েল করা চাই।

বাড়িতে বসে এখন অনেক রকম গল্পেরই ছক কেটে রাখা হয়। যে-গল্পটার কথা প্রোডিউসারকে বলতে বলা হল সেটা অন্তত বন্দনারও খারাপ লাগেনি। ছবি হলে আরো কি করা উচিত না উচিত পরামর্শ দিতে পারে। কিন্তু, সঙ্গের লোককে বাদ দিকে তাকে একা কেন ডাকা হল বুঝতে না পেরে একটু অস্বস্তি নিয়েই ঘরে ঢুকল।

কোঠারির মুখে সেই আগের মতোই সৌজন্যের হাসি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দু'হাত জুড়ে নমস্কার করে বলল, কেমন আছেন ?

লাইনের দস্তুর অনুযায়ী সহজ হৃদ্যতার দিকটাই বেছে নিল বন্দনা। হেসে জিগ্যেস করল, কেমন দেখছেন ?

কোঠারির হাসি-ছোঁয়া চাউনি তার মুখের ওপর থমকালো একটু। পলকের জন্য একটু হয়তো ওঠা-নামা করল। এই দেখার মধ্যে ব্যবসায়ীর সহজ ভদ্র যাচাইয়ের দিকটুকুই স্পষ্ট। প্রসন্ন সুরে জবাব দিল, ফাইন, ইউ লুক রিয়েলি ওয়াণ্ডারফুল। বসুন—আপনার মেয়ে ভাল আছে ?

—হ্যাঁ, থ্যাংকস···। বসল।

নিজের চেয়ারে বসে কোঠারি হাতে পেন্সিলটা টেবিলে ঠুকল দুই একবার। কি বলবে চিন্তা করে নিল বোধহয়। তারপর বেশ ভদ্র আর অমায়িক সুরেই বলল, সুবীর বাবু আমার সেক্রেটারির সঙ্গে এর মধ্যে অনেকবার দেখা করেছেন আর হাতে কাজকর্ম না থাকায় খুব অসুবিধের মধ্যে আছেন জানিয়েছেন। ···আই অ্যাম রিয়েলি সরি ফর হিম। সেইজন্যেই আপনাকে একবার দেখা করতে বলেছিলাম। আপনার প্রথম ছবির পারফরম্যান্স আমার ভালই লেগেছিল, দো ইওর ফেস্ কুড হ্যাভ বিন মাচ ইমপ্রুভড্···বাট ফর আদার ক্যালাসনেস অফ ইওর হাসব্যাণ্ড। ইউ আর রিয়েলি বিউটিফুল, ফেস ফোটোজিনিক সকলের হয় না—না হলেও ভাল ক্যামেরাম্যান নিয়ে নানা অ্যাঙ্গেল থেকে ট্রায়েল দিয়ে অনেকটা কভার করা যেত, ডাইরেক্টর হ্যাড অল্ দি লিবার্টি আই গেভ হিম ফ্রি-হ্যাণ্ড। হ্যাড টু সাফার এ বিগ্ লস্ ইউ নো—সে-যাক, আই অ্যাম নো মোর ইন্টারেস্টেড ইন হিম অর ইন হিজ ডাইরেকশন। আমার পরের ছবিতে আমি আপনাকে নিতে পারি, নট্ এগজ্যাক্টলি ইন হিরোইন্স রোল, বাট দ্যাট উইল বি অ্যান ইম্পর্টট্যান্ট রোল আই ক্যান্ অ্যাসিওর ইউ।

মার্জিত বক্তব্যের সুর এমনই স্পষ্ট যে এর ওপর আর কোন কথা চলে না। পরে জানাবে বলে বন্দনা ধন্যবাদ দিয়ে উঠে এলো। এখাই

মধ্যে তাকে চলে আসতে দেখে সুবীর রায়ের শুকনো মুখ। বন্দনা এ দিকে না এসে সোজা বেরুনোর দরজার এগোতে সেও উঠে সঙ্গ নিল। বাইরে পা দিয়েই উদগ্রীব, আমাকে ডাকলই না মোটে তাহলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার দরকার কি ছিল?

বন্দনা ফিরে তাকালো একবার। তারপর চলতে চলতেই জিগ্যেস করল, অ্যাপয়েন্টমেন্ট কি তোমার সঙ্গে করা হয়েছিল ··না শুধু আমার সঙ্গে?

থতমত খেয়ে সুবীর রায় জবাব দিল, সেক্রেটারি তোমাকে নিয়ে আসতে বলেছিল···। বলেই থমকালো, স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে কিছু বুঝেও নিল।···ও, তা কি কথা হল? কোঠারি তোমাকে কি বলল?

—বলল, তোমার ডিরেকশনে তার কোন ইন্টারেস্ট নেই, তোমার জন্যেই আগের ছবিতে তার বিরাট লোকসান হয়ে গেছে—পরের ছবিতে হিরোইন না হোক, ইম্পরট্যান্ট রোলে আমাকে চান্স দিতে পারে।

—স্কাউণ্ড্রেল! এই বলেছে তোমাকে? আসলে তোমার দিকে চোখ, তোমার ওপর লোভ—এটা বুঝতে পারছ?

ততক্ষণে বাড়ি পেরিয়ে দু'জনে রাস্তায়। পথে নামলে আশপাশের লোক একটু তাকায়ই, বন্দনা সেটা আজ থেকে দেখছে না। এখনো অদূরের ট্রাম স্টপে দাঁড়িয়ে কেউ কেউ তাকাচ্ছে। তার পাশের লোকের উগ্রমূর্তিও দেখছে। অসহিষ্ণু গলায়ও কানে না যাবার কথা নয়। ঠাণ্ডা গলায় বলল, রাস্তায় আর একটা কথা নয়।

বাড়ি ফিরেও একই মূর্তি, এক রকমই উষ্মা। —এত যখন পছন্দ তোমাকে, সেই সুযোগ নিয়ে আমাকে একবার যাতে ডাকে সেই ব্যবস্থা করতে পারলে না? না কি সে যা বলেছে তুমিও তাই বিশ্বাস করেছ—আমার গল্পটার কথা বলে একটু বোঝাতে চেষ্টা করেছিলে না তাও পারোনি?

বিতৃষ্ণায় ভিতরটা ছেয়ে যাচ্ছিল কেন নিজেও জানে না। বন্দনা ঝাঁঝালো জবাব দিল, না, আমি কিছুই পারিনি।

মানুষটার হতাশা বুঝতে পারে, দুশ্চিন্তাও হয়। কিন্তু এ-রকম অশালীন কথা বরদাস্ত করা বন্দনার স্বভাবে নেই। নিজের আত্মবিশ্বাস খুইয়ে ওর ওপর এখন এ-ভাবে নির্ভর করছে তা আরো বিরক্তিকর কিন্তু বাস্তব চিন্তা বন্দনারও মাথায় আছেই। দুজনেরই রোজগার বন্ধ অনেক দিন।···স্ক্রিপ্ট বা ডায়লগ লেখানোর জন্য দুই একটা পার্টি আসে, ভাল ডায়লগ লেখার কিছু সুনাম আছে লোকটার, আর মাথা খাটিয়ে বা যত্ন নিয়ে বসলে স্ক্রিপ্টও মন্দ করে না। কিন্তু প্রবল আত্মভিমান আঁকড়ে আছে এখনো মানুষটা। অমন পার্টি এলে ক্ষুব্ধ সুবীর রায় তাদের সোজা বিদেয় করে দেয়। এখনো এটা তার আত্মসম্মানের প্রশ্ন। অথচ দুটো ছেলে একটা শিশু মেয়ে নিয়ে সংসার কিভাবে চলছে একবারও জিগ্যেস করে না।···সংসার চলছে বন্দনার বাবার দেওয়া টাকায়। বিয়ের জন্য বাবা পঞ্চাশ হাজার টাকা রেখে গেছল, বিয়ের অনেক আগেই তার থেকে বিশ হাজার টাকার গয়না গড়িয়েছিল বন্দনা। বাকিটা ব্যাঙ্কে জমা ছিল। সেই টাকায় টান পড়ছে। এরপর গয়নায়ও টান পড়বে।

দিন দুই যেতে বন্দনা একলাই স্টুডিওতে বেরুতে লাগল। কয়েকজন প্রোডিউসারের সঙ্গেও দেখা করল। কয়েকজন ডাইরেক্টরের সঙ্গেও। সামনে গিয়ে দাঁড়ালে কেউ ছেঁটে দেয় না। উল্টে খাতিরই করে। প্রথম ছবি মার খাবার জন্য কেউ তাকে দায়ী করে না। একজন ডিরেক্টর তো নায়িকার ভূমিকাতেই তাকে নিতে পারে বলেছে। অন্যরাও মোটামুটি ভাল রোলেই প্রতিশ্রুতি দেয়। প্রোডিউসাররাও তার প্রতি নিরুৎসুক নয়। কিন্তু সুবীর রায় সম্পর্কে কারো এতটুকু আগ্রহ নেই। উল্টে নীরব বিতৃষ্ণা। জীবনের দোসর হিসেবে যাকে বেছে নেওয়া হয়েছে তার জন্য হয়তো অনুকম্পাও। বন্দনা বাইরে থেকে ঘুরে এলে লোকটা তাও অনুভব করতে পারে। মানুষটার আগ্রহ কমছে, রাগ বাড়ছে।

এর মধ্যে এক সন্ধ্যায় বাইরে থেকে ফিরে বন্দনা একটু তিক্ত সুরেই বলল, সংসারের খরচ আসছে কোথা থেকে তুমি তো দেখি সে-খোঁজ

নেওয়ার ও দরকার মনে করো না।

প্রথমে রাগ, তারপর চাউনিতে শ্লেষ।—আসছে তোমার কাছ থেকে সেটা জানি, তোমার আসছে কোথা থেকে সেটা জানি না।··· কিন্তু বাইরে থেকে ফিরেই হঠাৎ এ-কথা কেন?

এ রকম শুনলে বন্দনাও মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না।—ইতরের মতো কথা বোলো না, এখন পর্যন্ত আমার কোথা থেকে আসছে তুমি ভাল করেই জানো! কিন্তু তা-ও আর বেশী দিন আসবে না—বাবার দেওয়া জমা টাকার বেশির ভাগই শেষ হয়ে এসেছে। শোন--আমি যদি অন্য লোকের ডিরেকশনে ছবি করি তোমার খুব আপত্তি হবে?

—নাঃ, আপত্তি কিসের! লোকটার ভিতরের অসহিষ্ণু রাগ বিকৃত শ্লেষ হয়ে চোখে ঝরছে। মুখের হাসিও তেমনি।—দেখ বন্দনা, স্টুডিওর খবর বাতাসে ফেরে, এই মুহূর্তে কোন্ কোন্ ডাইরেক্টর আর কোন্ কোন্ প্রোডিউসার তোমার প্রতি ইন্টারেস্টেড আমি জানি···এমন কিছু নামী আর্টিস্ট নও তুমি কোন্ লোভে তারা তোমাকে তবু ডাকে তুমিও ভালই জানো—ঠেকে পড়লে একটু-আধটু প্রশ্রয় দেবে না এমন শুকনো নীতিজ্ঞানও আমার নয়—কিন্তু সেই ফাঁকে কোনো প্রোডিউসারকে ধরে আমার মতো এই ইতরজনকে তুমি একটু উৎরে দিতে পারছ না—নাকি এই পরিচালককে আর তোমারও পছন্দ নয়?

বন্দনা রাগে স্তব্ধ খানিকক্ষণ। সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেও বিতৃষ্ণা। চলে এসেছে। প্রথমে ঠিক করেছে, এ লাইনে আর নয়, রোজগারের অন্য চেষ্টা দেখবে। এম. এ-টা পাশ করা আছে যখন রোজগারের কিছু ব্যবস্থা হবে এ বিশ্বাস আছে। কিন্তু মাথা একটু ঠাণ্ডা হতে আবার ভেবেছে, তা না হয় হল, চিন্তা নিজেকে নিয়ে নয়—এই মানুষটাকে এ রকম হতাশা থেকে টেনে তুলবে কেমন করে? অভাবে দুশ্চিন্তায় লোকটার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে?

এর দিন কতক বাদে একটু আশার সম্ভাবনা দেখা দিল। আর তাতেই সুবীর রায়ের দেহে মনে প্রাণের জোয়ার এলো। কিন্তু সুখবর বলার প্রথম ছিরিতেই বন্দনা ধাক্কা খেল একটু।—শোন, দারুণ ব্যাপার,

এত দিনের চেষ্টায় মাধব ঘোষ এক বিরাট মক্কেল গেঁথেছে, মস্ত বিজনেস ম্যাগনেট—এ লাইনের লোক নয়—এ-লাইনের সব তো হাড়-হারামজাদা—এখন আমাদের খুব মাথা খাটিয়ে নামতে হবে—এমন পার্টি ফসকালে আর কোন আশা নেই।

মাধব ঘোষের নাম শুনেই বন্দনার উৎসাহে টান ধরল। সেদিনের সেই তুপুরের কথা বন্দনা তাকে আজও বলেনি। আরো বলেনি বিতৃষ্ণায়, কারণ, সেদিন তার চোখের লুব্ধ ভাষা একটুও অস্পষ্ট ছিল না। উৎফুল্ল মুখে বলেছিল, তাকে দেখলেই প্রোডিউসার আরো বেশি টাকা দিতে রাজি হয়ে যাবে। কি দেখলে বন্দনা সেটা তার চোখেই দেখেছিল। আগেও এই লোককে পছন্দ করত না। বিয়ের পরেও বিরক্ত হয়ে একদিন বলেই ফেলেছিল, ফার্স্ট আসিস্ট্যান্ট হিসেবে এই লোকটাকে তুমি জোটালে কি করে?

সুবীর রায়ের আবার এই লোককেই দারুণ পছন্দ। জবাব দিয়েছিল মাধব ঘোষ কি-রকম চৌকস যোগাড়ে ছেলে তুমি জানো না।

সেই যোগাড় এটা—শুনে বন্দনা যেমন খুশি হওয়া দূরে থাক, খুব একটা আশাও করতে পারল না।

এর পর বিস্তারিত শুনল। বিজনেস ম্যাগনেটের নাম বি. কে বনার্জী—পুরো নাম নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, বি-কে বা শুধু বনার্জি বললেই ব্যবসায়ী মহল তাকে চেনে। বিরাট হার্ডঅয়্যার মার্চেন্ট। কলকাতায় তিনটে আর বাইরে নানা জায়গায় চারটে বাড়ি। কোম্পানির আর নিজের মিলিয়ে গাড়িও আধ ডজন। নিজে বিলিতি গাড়িতে চড়ে। মোট কথা কয়েক কোটি টাকার মালিক। তার মধ্যেই কালো টাকার পাহাড়। সেই টাকার কিছু সগতি করার ইচ্ছেয় ছবি করার ঝোঁক হয়েছে। এটা নতুন কিছু নয়, টাকা উপচে উঠতে থাকলে এমন ঝোঁক অনেকেরই হয়। এই করেই অনেক নতুন প্রোডিউসার ইন্‌ডাস্ট্রিতে আসে। খবর পেয়েই মাধব ঘোষ তার পিছনে লেগে ছিল। ওর কথাবার্তার চটকে ভদ্রলোক রাজি হতে গত সপ্তাহে সুবীর রায়কে তার কাছে নিয়ে গেছল। আর আজও এই

মাত্র তার ওখান থেকেই এলো। ভদ্রলোকের লাইট রোমান্টিক গল্প পছন্দ। সুবীর তার 'তিন দফা' গল্পটা নিয়ে সেই ভাবেই তৈরি হয়ে গেছল। শুনে খুব খুশি, কথা-বার্তাও এক-রকম পাকা। পরশু শনিবারে বন্দনাকে নিয়ে যেতে বলেছে—শনিবার বিকেল থেকে ভদ্রলোক ফ্রি থাকে।

'তিন দফা' বলতে বার-বার তিনবারের চেষ্টায় একটি ছেলে কেমন করে এক মেয়ের মন জয়ে সফল হল। এমন একটা হাল্কা গল্পের ছবি হতে যাচ্ছে শুনে বন্দনা আবার দমে গেল। বরাবরই গল্পটা খেলো মনে হয়েছে তার। সুসময় হলে সোজা বলে দিত এ-ছবি করা আমার দ্বারা হবে না। এখন শুধু বলল, এ-গল্পে আমার কি এমন করার আছে—

সুবীর রায় একটু অধীর হয়ে জবাব দিল, ভাল আর্টিস্ট সব রোলেই কাজ দেখাতে পারে—তাছাড়া করার স্কোপ বাড়ানো তো আমার হাতে। একবার রস পেলে এই এক ছবি করেই তো কোটিপতি মানুষটা থেমে যাচ্ছে না—তখন দেখবে তুমি, মানে আমরা যা বলব তাই হবে। তারপরেই হাসি, তুমি হবে এর মেন্ অ্যাট্রাকশন্, বুঝলে, ভদ্রলোকের ডিমাণ্ড নায়িকার রোলে খুব সুন্দরী মেয়ে চাই—আর মাধব ঘোষ তাকে বলেছে শনিবারে যে আসছে ছবির রাজ্যে অত রূপ অত গুণ আর কারো নেই। বাড়ানো কথা নয়, মাধব নিজেও তা বিশ্বাস করে-বুঝলে? কবে নাকি তোমায় দেখেছে। আমাকে বলেছে মেয়ে হবার পর বউদির বয়স যেমন কমেছে রূপ তেমনি বেড়েছে। আর বনার্জিকে আরো কি যে বলেছে, বুঝতেই পারছ। যাকগে, এ-সব বিজনেসম্যান এ-রকম শুনলেই অর্ধেক কাত।

বন্দনা একটুও স্বস্তি বোধ করেনি। কিন্তু লোকটার চাপা উল্লাস দেখে কিছু বলেওনি। শনিবার এলো। বন্দনা সাজসজ্জা করে রেডি হতে সুবীর রায় গলা দিয়ে খুশির শব্দ বার করল একটা।—বাঃ, আমিই যে ঘায়েল হয়ে গেলাম গো!

বন্দনারও লঘু ভ্রূকুটি।—আবার নতুন করে?

রসিকতায় তারিফ করে সুবীর রায় হা হা হা হা করে হাসতে লাগল। অনেক দিনের মধ্যে এই লোকের মুখে বন্দনা এত হাসি দেখেনি। তার লক্ষ্য করার মন ছিল না। নইলে মনে হত লোকটার হাসি যত তরল ততো সরল নয়।

ঘড়ি ধরে গলির বাইরে বনার্জি সাহেবের গাড়ি হাজির। আর এই গাড়ি দেখেই বোঝা গেল ভদ্রলোকের টাকার জোর কত। ফরেন গাড়ি, এয়ার কণ্ডিশণ্ড। এত ঝকঝকে যে সামনে দাঁড়ালে আয়নার মতো নিজের মুখ দেখা যায়। দু'পাশের জানলায় ব্রাউন কাচ। তারা বেরিয়ে আসতে ঝকমকে পোশাক পরা ড্রাইভার সেলাম ঠুকে দরজা খুলে দিল।

গাড়ি হাওয়ায় ভেসে চলল। ড্রাইভারের বাংলা বোঝার ভয় নেই, তবু গলা খাটো করে সুবীর রায় ডগমগ মুখ করে বলল, বি-কে'র কাছে মাধব ঘোষ তোমার প্রেস্টিজ কেমন বাড়িয়ে রেখেছে দেখ—যেন এ-রকম গাড়ি ছাড়া তুমি চড়ই না।

একটু বাদে আবার কাঁধে আঙুলের খোঁচা। ঝুঁকে কাছে মুখ এনে আবার বলল, শনিবারটা বনার্জির রেস্ট ডে, গিয়ে হয়তো দেখব ড্রিংক নিয়ে বসেছে, ছবির লাইনে তো সব ওতে গড়াগড়ি খায় জানোই—এ সেদিক থেকে বরং ঢের ভাল, কেবল শনি-রোববারে আনন্দ করে, নিজেকে রিল্যাক্স করে—তবে মেয়ে পি-এ বা স্টেনো-গ্রাফারদের এরা ঘাড়ে কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলতে অভ্যস্ত, সে রকম কিছু করলে তুমি যেন একটুতেই আবার বেচাল ভেবে বিগড়ে যেও না।

এরকম একটু আভাস বিকেলেও দিয়েছিল। বন্দনা চোখের ধমকেই ঠেলে সরালো তাকে। পুরুষের লোভ যেমন চেনে নিজের ওপর ততখানিই আস্থা বলে খুব একটা পরোয়া করে না। কিন্তু এই লোকের দুর্বল ভয় কোথায় নেমে এসেছে ভেবে হাসিও পায় আবার কষ্টও হয়। যেভাবে বলেছে তাতে সাদা অর্থ, এ-পার্টি, বন্দনার মেজাজের ধাক্কায় কোনরকমে না ফস্কায়।

দেয়াল ঘেরা কম্পাউণ্ডের মধ্যে পুরনো ধাঁচের মস্ত বাড়ি। বাড়িটা অবশ্যই বিশাল। বন্দনা শুনল, এর একতলা দোতলায় অফিস, তিনতলাটা নাকি বনাজির ছুটির দিনের বিশ্রামের স্যুইট। এখানে তার খাওয়া-দাওয়া ঘুমানোর সমস্ত ব্যবস্থা আছে। শনিবারের রেস্ট ডে-তে ইচ্ছে হলে বাড়ি ফেরে, না হলে ফেরে না। এখানেই থেকে যায়। একতলা দোতলা এখন নিঝুম, কেবল কোনো কোনো ঘরে আলো জ্বলছে। নিচে দরোয়ান-টরোয়ার গোছের কয়েকটা লোক জটলা করছে।

অটো লিফ্‌ট-এ বন্দনাকে নিয়ে সুবীর রায় তিনতলায় উঠে গেল। সামনের বড় হলঘর পেরিয়ে ওদিকের আর একটা প্রায় তেমনি বড় ঘরে নিয়ে এলো। আসর সেই ঘরেই বসেছে। সামনের দিকে বিশজন বসতে পারে এমনি একটা ঝকঝকে টেবিলের দুদিকে মোট পাঁচজন মাত্র বসে। এক দিকে চারজন, আর উল্টো দিকে একজন। ওদিকের দেয়াল ঘেঁষে একটা শৌখিন খাটে শৌখিন শয্যা, পায়ের দিকে অ্যাটাচ্‌ড বাথ। এই ঘরের মাঝামাঝি দরজা দিয়ে পিছনের আর একটা ছোট ঘরেও আলো জ্বলছে। মাঝে শৌখিন পর্দা। টেবিলের পাঁচজনের মধ্যমণি বি কে বনাজি কোন্ জন বন্দনা একবার তাকিয়েই বুঝল। সব চেয়ারই গদি-মোড়া তার মধ্যেও একটা স্পেশাল আকারের। বছর পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ হতে পারে ভদ্রলোকের বয়স। সুশ্রী লাল্‌চে মুখ, তেল না পড়া প্রায় বাদামী পাতলা চুল, সুস্বাস্থ্য। ওই রঙিন জলের দৌলতেই সম্ভবত সামান্য মোটার দিক ঘেঁষা। গায়ে দুধের ফ্যানার মত ধপধপে আর নীচের নেটের গেঞ্জির প্রতিটি ছিদ্র চোখে পড়ার মত পাঞ্জাবী, পরণে তেমনি সাদা পা-আঁটা পাজামা। তার ডাইনে দুজন বাঁয়ে একজন। আর উল্টো দিকের চেয়ারে তখন পর্যন্ত শুধু মাধব ঘোষ বসে। সকলের সামনেই ড্রিংক্-এর গেলাস, বড় ডিসে মস্ত সাইজের কাটলেট আর চিলি চিকেন। দূরের এককোণে লম্বা সাদা কোর্তা পরা বয়, তার পাশের ছোট টেবিলে বোতল, সোডার

বোতল, আর আনুসাঙ্গিক যা কিছু।

বন্দনা ঘরে পা দিয়ে দু'হাত বুকের কাছে জুড়ে একটু এগোতেই প্রথমে বি. কে. বনার্জি আর তার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উঠে দাঁড়াল। সপ্রতিভ হাসি মুখে বন্দনা লক্ষ্য করল আরো কাছে আসা এবং টেবিলের উল্টো দিকে দাঁড়ানোর ফাঁকে বি. কে. বনার্জির দুটো আয়েসী চোখ তার আপাদমস্তকে ওঠা নামা করল। মাধব ঘোষ তড়বড় করে পরিচয় পর্ব শুরু করার আগেই ভদ্রলোক একটা হাত সামান্য তুলতে থেমে গেল। দু'চোখ তখনো বন্দনার মুখের ওপর, ঠোঁটে হাসির রেখা। এটুকু তার পছন্দের ভাষা তো বটেই। তারপর অন্তরঙ্গ আপ্যায়ণের ভঙ্গিতে নিজের দু'হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

বন্দনার দু'হাত তখনো বুকের কাছে জোড়া। এবারে নামিয়ে ডান হাতখানা তার দিকে বাড়িয়ে দিতে হল। দু'হাতে সেই হাত নিয়ে ইঞ্চিখানেক ঝুঁকে ভদ্রলোক সবিনয়ে নিজের পরিচয় দিল, আমার নাম বটোকেষ্ট বনার্জি···নামটা সুক্তোর কবাব গোছের।

শুধু বন্দনা আর যে বলল সে ছাড়া সকলের জোর হাসি। বন্দনার ডান হাত ভদ্রলোকের দু'হাতে, স্মিত মুখে নিজের পরিচয় দিল, বন্দনা রায়···।

হাতে সামান্য নাড়া পড়ল, সো গ্লাড টু মিট ইউ। হাত ছেড়ে দিল, বসুন—

—থ্যাংক ইউ।

যে যার আসন নিল। বন্দনার এক পাশে মাধব ঘোষ অন্য পাশে সুবীর রায়। দু'জনের দু'জোড়া চোখ বি. কে বনার্জির মুখের ওপরে। কতটা খুশি হল ওজন করছে।

খুশি যে হয়েছে সন্দেহ নেই। হাসি মুখে ভদ্রলোক এবারে অন্যদের পরিচয় পর্ব শেষ করল। ডাইনের দুজন বন্ধু, ওমুক বোস আর ওমুক দত্ত। বাঁয়ে বন্ধু এবং সেক্রেটারি ওমুক চ্যাটার্জী। কিন্তু একটু আগের হাসি দেখেই বন্দনার মনে হয়েছে সাদা কথায় এরা মোসায়েব।

বেয়ারা সোডা হুইস্কি নিয়ে এলো। প্রথমে সুবীর রায়কে দিল। এর আগেও বন্দনা সিনেমা-অলাদের দুই একটা পার্টিতে গেছে। ঘরের লোক দুই একটা খেলে আপত্তি করে না, কিন্তু তার বেশি হলে সকলের অগোচরে ভ্রুকুটি করে আপত্তি জানায়—আর রাতেও কাছে ঘেঁষতে দেয় না। কিন্তু সুবীর রায় মদের আসরে ইচ্ছে করেই স্ত্রীর চোখ এড়িয়ে যায়।

বয় তার কাছে আসতে সামান্য মাথা নেড়ে জানালো—চলে না। মাধব ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে অনুনয়, রিয়েল স্কচ ম্যাডাম, আমাদের কম্পানি দেবার জন্যে একটু নিয়ে বসুন।

জবাবে বন্দনা শুধু ঠাণ্ডা চোখে একবার তাকালো তার দিকে। তাইতেই সে মিইয়ে গেল। অনুরোধ নাকচের এই নিঃশব্দ ব্যাপারটুকু বনার্জি যেন বেশ উপভোগ করল। হাঁসি ছোঁয়া চাউনি বন্দনার মুখের ওপর থেকে মাধব ঘোষের দিকে। মোলায়েম অনুযোগের সুরে বাধা দিল, হোয়াই ইন্‌সিস্ট···এমন কি জিনিস। বয়কে হুকুম করল, মেম সাহেবকে সফ্‌ট্‌ ড্রিংক দাও।

তার জন্য সফ্‌ট্‌ ড্রিংক এলো ফেরার আগে বয় তার আর সুবীর রায়ের ডিস উল্টে কাঁটা চামচ রেখে গেল। এই ডিস দুটোই শুধু খালি ছিল। দু'হাতে ফিস ফ্রাই আর চিলি চিকেনের বোল নিয়ে আবার এসে পাশে দাঁড়ালো। সুবীর রায় একটা ফ্রাই আর বেশ খানিকটা চিলি চিকেন তুলে নিল। বন্দনা শুধু এক টুকরো চিলি চিকেন।

বনার্জি বন্দনার দিকেই চেয়ে আছে। তার গেলাসে একটা ছোট চুমুক দিয়ে জিগ্যেস করল, আপনি ডায়েটিং করেন?

মৃদু হেসে বন্দনা জবাব দিল, যতটা পারি করি।

আয়েসী দু'চোখ বেশ স্বচ্ছন্দে তার মুখে বুকে দুই বাহুতে বিচরণ করল একপ্রস্থ। খুঁটিয়ে ডায়েটিংএর সুফল দেখছ। সমঝদারের মত সামান্য মাথা নাড়ল। তারপর বলল, ডাক্তারের হুকুম মানলে আমারও ডায়েটিং করার কথা, কিন্তু লোভেই গেলাম।

তোষামোদের সুরে মাধব ঘোষ বলে উঠল, ডাক্তারের হুকুম আপনি শুনতে যাবেন কেন মিষ্টার বনার্জি, আপনাকে দেখে তো মনে হয় না আপনার কোথাও এক গ্রামও ফ্যাট আছে।

হাসি হাসি মুখে ভদ্রলোক তার দিক থেকে সুবীর রায়ের দিকে তাকালো—আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টরের তো চোখ বলে কিছু আছে মনে হয় না।

চাউনির মত ভদ্রলোকের কথাবার্তাও ঢিমেতালের। জবাবে সকলেই হাসল শুধু। মোক্ষম জব্দ হওয়ার মতো করে সব থেকে বেশি হাসল মাধব ঘোষ।

বয় সকলের ড্রিংক এর খালি গেলাস ভর্তি করে দিয়ে গেল। বটোকেষ্ট বনার্জির হাসি-মাখা অলস দৃষ্টি বন্দনার বুক থেকে আবার মুখের ওপর উঠে এলো। দ্বিধা সংকোচের লেশমাত্র নেই তার হাব-ভাব আর প্রশংসার ধরনও অন্যরকম। টেনে টেনে বলল, এঁদের মুখে আগের ছবিতে আপনার ম্যাগনিফিসেন্ট পারফরম্যান্সের কথা শুনলাম, বোধ হয় তখন বাইরে ছিলাম বলে মিস করেছি আই নাও রিপেন্ট।

এই খেদের অর্থ এত সহজ অথচ এমনই স্পষ্ট যে হাসা ছাড়া আর কোন জবাব হয় না। সহাস্যে বনার্জির নিজস্ব সঙ্গীরাও হেসে সমর্থন জানালো, অর্থাৎ ছবিটা দেখেনি বলে তাদেরও একই মত। সুবীর রায়ও সেই হাসিতে হাসি মিলিয়ে স্ত্রীর দিকে ফিরে বলল, ওঁর ছবিতে তুমি আরো বেটার পারফরম্যান্স পেমিস করতে পারো

—ও শিওর! বনার্জি যেন সেটা ধরেই নিল।—মিষ্টার রায়ের ওই গল্প আর নায়িকার রোল আপনার পছন্দ তো?

—ভালই তো···। এতবার করে গায়ে মুখে চোখ বোলানোর দাম কিছু মেলে কিনা সাহস করে বন্দনা এবার সে-চেষ্টায় এগোল সুচারু দ্বিধা কাটিয়ে বলল, তবে ওঁর লেখা ভাল একটা সীরিয়াস স্টোরি আছে—তাতে আমার স্কোপ অনেক বেশি ছিল।···সেটা শুনেছেন?

চোখ মুখ সামান্য কুঁচকে বনজি আস্তে আস্তে বার দুই মাথা নাড়ল।—লাইফ ইটসেল্‌ফ ইজ সীরিয়াস এনাফ ম্যাডাম, আই ডোণ্ট লাইক এনি হার্ড থিং ইন মিউজিক। সুবীর রায়ের দিকে ফিরল।—সীরিয়াস গল্প আমার পছন্দ নয়, কিন্তু এ-গল্পে এঁরই স্কোপ কম হলে চলবে কি করে?

স্ত্রীর বোকামিতে সুবীর রায় ভিতরে ক্ষুব্ধ, মুখে হাসি—স্কোপ কত বাড়বে ওঁর ধারণা নেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আর সব দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিন—সি উইল বি ফুল্‌লি ইউটিলাইজ্‌ড্‌।

ফুল্‌লি ইউটিলাইজড্‌ হলে কি হতে পারে ড্রিংক-এর আমেজে নায়িকার দিকে চেয়ে চেয়ে খানিক সেই পর্যবেক্ষণ চলল বনাজির।—আপনার নিজস্ব চয়েস কি···আই মিন্‌ আপনার অপোজিট রোলে কাকে পছন্দ করেন?

এবারে বন্দনা সোজা দু'চোখ তার মুখের ওপর রেখে বুঝিয়ে দিতে চাইল দৃষ্টিবাণে বিধ্বস্ত হবার মতো একজন নয় সে। ঠোঁটের হাসি চোখের দিকে উঠছে। একটা আঙুল বেঁকিয়ে সুবীর রায়কে দেখিয়ে দিল।—ওকে।

সকলের একযোগে সরব হাসি। কেবল বনাজি আর বন্দনা বাদে। ভদ্রলোক অন্যভাবে জবাবটার তারিফ করল। ঠোঁটের সঙ্গে বটোকেষ্ট বনাজির আয়েসী চোখ দুটোও হাসিতে ভরাট।—দ্যাটস্‌ কোয়াইট আণ্ডারস্টু্‌ড্‌, কিন্তু ছবিতে উনি তো নেপথ্যে থাকছেন, স্ক্রীনের ভাগ্যবানটি কে?

হেসেই বন্দনা তখুনি জবাব দিল, তা নিয়ে আমার কোন ব্যক্তিগত চয়েস নেই, সেটা আপনার আর ডাইরেক্টারের বিবেচনা।

এ-কথার মধ্যেও কৌতুকের রসদ পেল বনাজি। বার দুই ঢিলে-তালে মাথা নেড়ে বলল, এখন পর্যন্ত এ-লাইনে আমার বিবেচনার দৌড় খুব বেশি নয়। সুবীর রায়কে জিগেস করল, আপনি স্ক্রিপ্ট লেখা শুরু করেছেন?

—আপনি গ্রিন সিগন্যাল দিলেই বসে যাব, ও দিন পনেরোর

বেশি লাগবে না। আমি আর ঘোষ ছক কেটেই রেখেছি।

বলা মাত্র বক্তব্য বুঝল।—ইওর টার্মস আর ও-কে ফর মি, ইউ গো আহেড। ইতিমধ্যে কোম্পানির নাম ঠিক হোক আর লেটারহেড-টেডগুলো রেডি হয়ে আসুক। পাশে ঝুঁকে সেক্রেটারিকে দু'কথায় কিছু নির্দেশ দিতে সে উঠে পিছনের ঘরের দিকে চলল। বনার্জি ঘুরে বসে তাকে বলল, আপনি এঁর সঙ্গে যান।

সুবীর রায় এটুকুরই প্রতীক্ষায় ছিল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে সেক্রেটারির পিছনে পর্দা ঠেলে ছোট ঘরটায় ঢুকে গেল।

আলাপ আলোচনা এ-দিনের মতো এখানেই শেষ। সুবীর রায়ের ফিরতে পাঁচ সাত মিনিটও লাগল না। বন্দনার কাছে এটুকু সময়ও অবশ্য লম্বা লাগছিল। নতুন প্রোডিউসার বটোকেষ্ট বনার্জি আর কথা না বলে মাঝে মাঝে তার গেলাস তুলে নিচ্ছিল, শিথিল চাউনি তার নায়িকার মুখে বুকে আর দুই বাহুর উপর ঘোরা ফেরা করছিল।

মাধব ঘোষ সেটুকু লক্ষ্য করে আনন্দ পাচ্ছে। আবার কাজ না শুরু হওয়া পর্যন্ত তার প্রাপ্তি যোগ নেই বলেই বোধহয় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছে।

ফেরার গাড়িতে বনার্জির বন্ধুদের একজন সঙ্গ নিয়েছে। তার বাড়ি সুবীর রায়ের বাড়ি ছাড়িয়ে আরো অনেক দূরে। তাই গাড়িতে সকলেই চুপ। কিন্তু থেকে থেকে কাঁধে আর পায়ের দিকে চাপ পড়তে ঘরের লোকের আনন্দ বন্দনা বেশ টের পাচ্ছে।

ঘরে এসেই উদ্ভাসিত মুখ। নিভা সরে যেতে বন্দনা ঘুমন্ত মেয়ের পাশে বসে একটু আদর করল। সুবীর রায় ততক্ষণে পকেট থেকে নোটের তাড়া বার করে গোনা শুরু করেছে। চক্ষু-লজ্জায় ওখানে আর এটা পেরে ওঠেনি। বন্দনা ঘুরে বসে চুপচাপ তার মুখখানা দেখতে লাগল।

—এই নাও, ছ'হাজার আছে এখানে, আমার গল্পের দশ হাজারের চার হাজার আর স্ক্রপ্ট্-এর পাঁচ হাজারের দু'হাজার টাকা অ্যাডভান্স চেয়েছিলাম, তাই দিয়েছে। টাকার ব্যাপারে লোকটার হাত টান

নেই বোঝা গেল—

বন্দনা টাকাটা হাতে নিয়ে তেমনি চেয়ে আছে।

আনন্দে ডগমগ সুবীর রায় বলল, টার্মস কি ঠিক হয়েছে তুমি তো কিছুই জানো না। আমার ডিরেকশনের জন্য চল্লিশ হাজার, আর তোমার অভিনয়ের জন্য তিরিশ হাজার—এই মোট সত্তর হাজারের এর মধ্যে পঁয়ত্রিশ হাজারর ব্ল্যাক—তারও তো কালো টাকা চালানো চাই।...ইস। সাহস করে তোমার চল্লিশ হাজার বললেও ঠিক পেয়ে যেতাম—ভদ্রলোকের তোমাকে দারুণ দা—রুণ পছন্দ হয়েছে—আর হবে না-ই বা কেন? একটা চোখ বার দুই টিপে হাসতে লাগল।

বন্দনা চেয়েই আছে। তার ঠোঁটেও হাসি ছড়াচ্ছে। অনেক দিনের উপোসী মানুষের সামনে ভুরিভোজের অব্যর্থ সন্ধানের আনন্দে দেখছে। আলতো করে জিগ্যেস করল ভদ্রলোকের কতটা পছন্দ হলে তোমার বরদাস্ত হবে?

ভারী রসিকতার কথা যেন। সুবীর রায় জোরেই হেসে উঠল। —মাইরি বলছি, তোমার আমার মনের বোঝাবুঝি যদি থাকে তাহলে কার পছন্দ কতটা এগোল তা নিয়ে আমি থোড়াই মাথা ঘামাই—সুখের দিনে একবার জাঁকিয়ে বসতে পারলে কোন কিছুরই আর দাগ থাকে না—দেখলাম তো কত! হাসি একেবারে উছলে উছলে পড়ছে।—তখন তো কুকুর ঠ্যাঙানো মুগুর তোমার হাতে গো!

আবারও হেসে আটখানা।

বন্দনা ভেতরে ভেতরে ধাক্কা খেয়েছে, কিন্তু পরে নিজেই আবার সেটা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে।...সে-রকম হতাশায় ডুবতে বসেছিল বলেই এখন এমন উচ্ছ্বাস। নইলে 'ব্যক্তিত্ব' ছবির নায়কের ওপর লোকটার সেই রাগ আর হিংসাও মনে পড়ছে।

পরের শনিবারে আবার বন্দনাকে বনার্জির বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার তাগিদ। বন্দনা আপত্তি করতেই অসহিষ্ণু মুখ।—ভদ্রলোকের রেস্ট ডে-তে আলোচনা হবার কথা, তার মধ্যে তুমি

থাকবে না এ হয় নাকি? শুধু এই শনিবারে কেন, এখন থেকে প্রত্যেক শনিবারেই তো আমাদের যেতে হবে, ছবিটা শুরু হওয়া পর্যন্ত তার মর্জিমাফিক চলতেই হবে।

এরপর বন্দনা আর আপত্তি করেনি। যে দুঃসময়ে পড়া গেছে, প্রোডিউসারদের মন বুঝে না চলে উপায় কি। গেছে। সেই একই আসর। একই ব্যাপার। মাঝে মাঝে অন্যান্য আর্টিস্ট নেওয়া সম্পর্কে কিছু কথা। কিন্তু আসলে দু'ঘণ্টা ঠায় বসে থেকে বন্দনার চোখে মুখে সপ্রতিভ হাসি ছড়িয়ে একজনের সুস্থির অনায়াস পর্যবেক্ষণ-কলার রসদ জোগানো। এইদিনে এটুকু করতে আরো খারাপ লেগেছে আর অস্বস্তিও বোধ করেছে। পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টি অনেক দেখেছে। তা গায়ে না মাখার মতো সহজাত জোর নিজের মধ্যেই পেয়েছে। কিন্তু বিজনেস ম্যাগনেট বটোকেষ্ট বনার্জিকে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম মনে হয়েছে তার। শিকার একেবারে নাগালের মধ্যে জেনে হিংস্র পশু যেমন আমেজের চোখে তাকে দেখে আর মজা পায়, অনেকটা সেই, রকম।

মাধব ঘোষের হঠাৎ মনে পড়ল কিছু। সুধীর রায়ের দিকে সাগ্রহে ফিরল।—ভালো কথা দাদা, আপনারা আসার আগে নাচ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। বনর্জি সাহেব বলছিলেন, হিরোইনের যেন অন্তত দুটো লং ড্যান্স সিকোয়েন্স থাকে।

বন্দনা ভিতরে ভিতরে আঁতকেই উঠল প্রায়। সুধীর রায় কিছু মন্তব্য করার আগে সে-ই বলে উঠল, হিরোইন তো বরাবর রিজার্ভড্ থাকবে আর হিরোকে বার বার ফেরাবে—এই গল্পে নাচের স্কোপ কোথায়! সব কিছুই তাহলে খেলো হয়ে যাবে।

সুধীর রায় কি বলবে ভেবে পেল না নায়িকার কথা শুনে বনার্জীর বন্ধুরাও কিছুটা আশাহত—মনে হল। কিন্তু বনার্জির ঠোঁটে অল্প অল্প হাসি। বন্দনার মুখের ওপর অপলক অথচ মদিরালস চাউনি। বলল, খেলো হলে আর স্ক্রপ্ট্ রাইটারের বাহাদুরি কি—তাছাড়া খেলো হবেই বা কেন, রিজারভড্ বলে কি নায়িকার নিজস্ব

খুশির জগৎ নেই, আর চ্যারিটি সোস্যাল পারফরম্যান্স-এ অ্যাকমপ্লিশড্ নায়িকা যদি নাচে আর তার অজান্তে সেই নাচ থেকে নায়ক যদি ডবল মুগ্ধ হয় তাহলে আর অসুবিধে কি ?

বনার্জির বন্ধুরা ঘন ঘন মাথা নেড়ে সায় দিল। মাধব ঘোষ সোল্লাসে বলে উঠল, দারুণ—দারুণ আইডিয়া—তাহলে আর একটুও লাইট হবে না।

বন্দনার চোখ এড়িয়ে সুবীর রায় মন্তব্য করল, কাজটাকে বড় করে তুললে লাইট হবার কোন কারণ নেই—

বন্দনা এবারে একটু জোর দিয়েই বলল, সেটা ভালো হবে না—নাচ যদি রাখতেই হয় তো নামী কোনো ড্যান্সার দিয়ে নাচের সিকোয়েন্স করা যেতে পারে—

হাসি-ছোঁয়া মুখে বনার্জি অল্প অল্প মাথা দুলিয়ে আপত্তি জানাতেই স্ত্রীর ওপর সুবীর রায়ের মেজাজ বিগড়বার উপক্রম।—দেখো আমি যেখানে ডাইরেক্টর, সেখানে তুমি—

শেষ করতে পারল না, তার আগেই একটা হাত তুলে বনার্জি তাকে থামিয়ে দিল। মজা লাগা দু'চোখ বন্দনার মুখের ওপর।—আগের ছবিতে আপনার ডান্স ছিল না ?

বন্দনা মাথা নাড়ল, ছিল না।

—পিটি ! অন্য ড্যান্সার দিয়ে প্রোগ্রাম করলে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো হবে—আই ডোণ্ট্ লাইট ছাট।···আপনি এত ভালো নাচতে পারেন শুনেছি, হোয়াই ডিপ্রাইভ ইওর ফ্যান্স ?

বন্দনা কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ়। তারপরেই সামলে নিয়ে সপ্রতিভ হাসি মুখে জিগ্যেস করল, আমি ভালো নাচতে পারি আপনাকে কে বলল ?

মদ পেটে পড়লেও প্রাণের দায়ে সুবীর রায়ের কান খাড়া। বনার্জি জবাব দেবার আগেই গুণের গোপন রহস্য ফাঁস করে দেবার মতো করে সে বলে উঠল, কেন স্কুল জীবনে নেচে তুমি কাপ মেডেল পাওনি ?

বন্দনার ভিতরে ভিতরে বিরক্তি জমাট বাঁধছে। ছেলে

বেলায় নাচ গান দুইই করেছে সত্যি কথাই, কিন্তু এই লোককে কখনো সে-কথা বলেনি। আর নাচ-গানে কাপ মেডেল জীবনেও পায়নি। তার দিকে চেয়ে মিষ্টি ধমকের সুরেই বন্দনা বলল, স্কুলের নাচ ছবিতে চলবে—নাকি তার জন্য প্র্যাকটিসও দরকার নেই?

—হুঁঃ, তুমিও যেমন—সেরকম ড্যান্স ডাইরেক্টরের হাতে পড়লে তোমার কাছে সব ডান্সই জল-ভাত হয়ে যাবে দেখো। আজ পর্যন্ত কি হিন্দি কি বাংলা কোন বড় আর্টিস্টকে কোনো না কোনো ছবিতে নাচতে হয়েছে? আপনি কিছু ভাববেন না মিস্টার বনার্জি—ভেবে চিন্তে আমি খুব মোক্ষম নাচের সিকোয়েন্সই আনব।

মাধব ঘোষ তাল ঠুকল, ম্যাডামের মতো আর্টিস্টের কাছে এ আবার একটা সমস্যা!

ফয়সলা হয়ে গেল বলে বনার্জির সঙ্গীরাও খুশি। প্রত্যেকের হাতে মদের গেলাস, আর জোড়া জোড়া চোখ বন্দনার মুখের ওপর।

ফেরার সময় কোন মিউজিক ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা বলার জন্য সুধীর রায় আর মাধব ঘোষ মাঝ রাস্তায় নেমে গেল। বন্দনার ড্রাইভার গলির মুখে ছেড়ে দিল।

আগের শনিবারও ছোট-মাকে এত সাজসজ্জা করে বাবার সঙ্গে ঝকঝকে একটা গাড়িতে বেরুতে দেখে বঙ্কি আর দীপু কৌতূহল চাপতে পারেনি। বঙ্কি শুধু লক্ষ্য করে দেখেছে আর দীপু জিগ্যেস করে বসেছিল, এত চমৎকার সেজে তুমি কোথায় গেছলে ছোট-মা?

ওদের বাবা একটা দাবড়ানি দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু বন্দনা দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরতে চুপ করে গেছিল, বন্দনা হেসে বলেছিল তোদের ফেলে নেমন্তন্ন খেয়ে এলাম।

আজ তাকে একলা ফিরতে দেখে দীপু হাসতে হাসতে ছুটে এসে বলল, এত সেজে বাবার সঙ্গে তুমি কোথায় যাও আমি জানি—

আজ আর বন্দনার মেজাজ আদৌ ভালো ছিল না। নাচের ব্যাপার নিয়ে ভিতরটা এখনো বিগড়ে আছে। ছেলেটার কথা শুনে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েও থেমে গেল। হাত দশেক তফাতে

দাঁড়িয়ে বঙ্কি তার দিকেই চেয়ে আছে আর শয়তানী ভরা চোখে ঠোঁট টিপে হাসছে। একটু ভুরু কুঁচকে বন্দনা দীপুকেই জিগ্যেস করল, কি জানিস, কোথায় যাই?

—তুমি আবার সিনেমা করবে

ধমকের সুরে বন্দনা আবার জিগ্যেস করল, তোকে এ কথা কে বলল?

দীপু একটু ঘাবড়ে ঘুরে তার দাদার দিকে তাকালো। তাইতেই বোঝা গেল কে বলেছে। বঙ্কির ঠোঁটের ফাঁকে মিটি মিটি হাসি ওই মুখের দিকে চেয়ে বন্দনা কিছুই বলতে পারল না কেবল রাগ দেখিয়ে নিজের ঘরে চলে এলো ওই ছেলে ব্যাপারটা বুঝল কি করে ভেবে পেল না। ভিতরে ভিতরে বন্দনার কি এক অস্বস্তি হয়তো আবার তারা টাকার মুখ দেখতে চলেছে, কিন্তু ছেলে ছুটোর কথা ভেবেই উৎসাহে টান ধরছে।

ঘণ্টাখানেক বাদে সুবীর রায় ফিরল। তার মেজাজ ভারী প্রসন্ন এখন। টাকার টনিকের সঙ্গে বিলিতি মদ—হবে না কেন। তাকে দেখামাত্র বন্দনার ভিতরটা দ্বিগুণ বিরূপ —শোনো, ছবিতে আমার নাচ ঢোকানো বাদ দিতে হবে, তা না হলে অন্য আর্টিস্ট—নাও আমাকে দিয়ে হবে না।

—কি আশ্চর্য, স্ত্রীর অবুঝপনা দেখে সুবীর রায় প্রায় হতাশ, তোমার মাথায় এখনো সেই নাচ ঘুরছে। এটা কোন প্রবলেম হল—

—হ্যাঁ, আমার কাছে খুব প্রবলেম—কি দরকার ছিল তোমার অত মিথ্যে কথা বলার—নাচের কাপ মেডেলের ছড়াছড়ি আমার—না?

—আঃ, বনার্জি নাচের কথা তুলল বলেই তো তাকে কখনো বলা যায় অত বড় আর্টিস্ট নাচ জানে না। আর তার জন্য তোমার এত ভাবনার কি হল?

—ভাবনার আছে। বন্দনা ধমকেই উঠল—তোমার আগের ছবির রিলিজ ডে'র প্রথম শো'তে তোমার বড় ছেলে স্কুল পালিয়ে সেটা দেখে

এসেছিল—তাকে তুমি ঠেকাতে পারবে—না কি হাঁ করে বসে সে তার মায়ের ফুর্তির নাচ দেখবে ?

এ-কথার ফলে মদের নেশার বিপরীত প্রতিক্রিয়া। যেন বড় ছেলের সদ্য কোনো অপরাধ এটা। গর্জে উঠল, ওকে আজ খুনই করে ফেলব আমি, বঙ্কি—।

জবাবে বন্দনার চাপা গর্জন।—থামো! মদ গিলে এসে আর মেজাজ দেখাতে হবে না? তুমি স্পষ্ট জেনে রাখ নাচ ঢোকালে আমি তার মধ্যেই নেই।

পাল্টা ধমক খেয়ে সুবীর রায়ের আপোসের চেষ্টা।—আচ্ছা, আচ্ছা, এ নিয়ে আর মেজাজ খারাপ কোরো না, আর দোহাই তোমার এখনই এসব আপত্তি তুলে বনাজিকে বিগড়ে দিও না। তাকে পথে আসতে দাও শুরু হতে দাও—তারপরে তো সবই আমার হাতে—তখন অন্য ড্যান্সার দিয়ে না-হয় নাচের সিকোয়েন্স করে নেব।

বন্দনা আর তর্ক বাড়ালো না।

তৃতীয় সপ্তাহে আবার যাবার কথা উঠতে বন্দনা বেঁকেই বসল।—ওখানে গিয়ে ও রকম সঙের মত বসে থাকতে আমার ভাল লাগে না—কাজ নেই কর্ম নেই বসে বসে কেবল মদ গেলা দেখো··· তাছাড়া তোমার ওই বিজনেস ম্যাগনেট সাংঘাতিক লোক জেনে রেখো—এ লাইনের প্রোডিউসারদের মতো নয়।

ছেলেমানুষি কথা শুনে সুবীর রায় অবাক যেন।—লাইনের প্রোডিউসারদের মতো হলে আমি অন্তত পাত্তা পেতাম না···আর মেনে নিলাম তোমার মতে লোকটা সাংঘাতিক, কিন্তু এমন এক শাঁসালো সাংঘাতিক লোককে যদি বশ না করতে পারো তাহলে তোমার আর বাহাদুরি কি?·· প্লীজ বন্দনা, ছবিটা শুরু না হওয়া পর্যন্ত কোন বাজে চিন্তা মাথায় এনো না তাছাড়া স্টুডিওর ব্যবস্থা পত্র করার জন্য আজ ডাইরেক্টর হিসেবে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাব আশা করছি, পেলে হাজার দশেক অন্তত অ্যাডভান্স করবে আর তোমার জন্যেও কয়েক হাজার আগাম দেবে আশা করছি·

এ-সপ্তাহে না করলেও পরের সপ্তাহে স্ক্রিপ্ট্ শোনানোর পর করবেই।

নিজে বিকেলেই বেরিয়ে গেল। তার কি নিশ্বাস ফেলার সময় আছে? বলে গেল, কয়েকটা কাজ সেরে সে সোজা বনার্জির ওখানে চলে যাবে—গাড়ি এলে যেন বন্দনা চলে যায়।

বন্দনা সময় মত রেডি। আধ-হাত চওড়া গাঢ় লাল নক্সাপাড়ের ধপধপে সাদা সিল্কের শাড়ি পরেছে, গায়ে আঁচলের সঙ্গে ম্যাচ করে লাল ভেলভেটের ব্লাউস—এক হাতে চারগাছা সোনার কাজ করা সরু পলার চুড়ি, অন্য হাতে ঘড়ি, আঙুলে একটা বড় পলার আঙটি, গলায় সোনার হারে পলার গোট। পায়ে লাল ভেলভেটের স্যাণ্ডেল। তার এই সাজ ঘরের লোকের সব থেকে পছন্দ—আগের শনিবারেও এই সাজের কথা বলেছিল। বেরুবার আগে বার বার অনুরোধ করেছিল আজ যেন এই পোশাকে সেজে যায়।

রাত পৌনে আটটা পর্যন্ত গাড়ি এলো না দেখে মনে মনে বন্দনা একটু স্বস্তি বোধ করছিল। ভাবল, তার আপত্তি দেখেই হয়তো আজকের যাওয়াটা বাতিল করতে পেরেছে। কিন্তু তার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কলিং বেল বাজল। নিভা দরজা খুলতে ড্রাইভার মুখ দেখালো। ড্রাইভারকে এত দেরিতে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করার কোনো মানে হয় না।

বন্দনা একলা, তাই ড্রাইভারই নেমে তাকে লিফ্ট-এ করে তিন-তলায় পৌঁছে দিল।

হল পেরিয়েই বন্দনা থমকে দাঁড়াল একটু। আজ আর জমাট আসর বসেনি। টেবিলের একদিকে নিজের চেয়ারে বনার্জি। তার দু'-পাশের চেয়ারগুলো শূন্য। উল্টোদিকে মাধব ঘোষ আর সুধীর রায়। আর কেউই নেই। বয় পর্যন্ত না। টেবিলে মদের বোতল, গোটা-কতক খালি সোডার বোতল আর যার যার গ্লাসে ড্রিংক।

বটোকেষ্ট বনার্জিই প্রথম দেখল তাকে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দু'পা এগিয়ে গেল। দাঁড়াল। ঠোঁটে হাসি টেনে বন্দনা পায়ে পায়ে কাছে

আসতে অন্য দিনের মতই দু'হাত বাড়িয়ে তার একখানা হাত নিল তারপরেও সেখানেই দাঁড়িয়ে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল। হাতে সামান্য চাপ পড়ল। একটা হাত বন্দনার কাঁধে উঠে এলো। এই গোষ্ঠের হৃদাতা আজই প্রথম পরম সমাদরে তাকে এনে টেবিলের দু'দিকের মাঝামাঝি সামনের চেয়ারটায় বসিয়ে দিল। আজ তার বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র আসন।

বন্দনা তখুনি কারণ বুঝল। একেবারে পাশে বসালে বার বার ঘাড়ে ফেরাতে হয়, পর্যবেক্ষণের আয়েসী ভোজে তাতে অসুবিধে আবার ওই দু'জনের পাশেই এনে বসাবে এই লোক এমন বেরসিকও নয়। মাধব ঘোষের ঘোলাটে চোখে তারিফ উছলে পড়ছে। সে সঙ্গে লুব্ধ বাসনাও সুবীর রায়ও দু'চোখ টান টান করে সাজের বাহার দেখছে আর বনার্জীর মুণ্ড কতটা ঘুরল লক্ষ্য করছে। বন্দনার মুখে হাসি, ভিতরে অস্বাস্ত।

বটকেষ্ট বনার্জী তখনো তার পাশে দাঁড়িয়ে।—পরিতুষ্ট আনন্দে সাজ দেখছে, যৌবন দেখছে বন্দনা মুখ তুলে তাকাতে হেসে বলল, লেট মি সার্ভ ইউ এ ড্রিংক

মাধব ঘোষ তখুনি উঠতে গেল।—সে কি কথা—আপনি বসুন, আমি এনে দিচ্ছি—

নো। ভারী গলার ছোট্ট ধমকের মতো শোনালো। মাধব ঘোষ আধা-ওঠা থেকে ধুপ করে বসে পড়ল আবার। বনার্জি সোজা পা ফেলে কোণের ছোট টেবিলটার কাছে চলে গেল। যত যাই খাক তার হাঁটা-চলায় কখনো এতটুকু ব্যতিক্রম চোখে পড়েনি বন্দনার সফ্‌ট ড্রিংক-এর বোতল খুলল। গেলাস ঢালল। নিয়ে এলো।

সৌজন্যের দায়ে বন্দনা চোখ মেলালো, ঠোঁটে হাসি থ্যাংকস্...

বনার্জি সামান্য মাথা নেড়ে হৃষ্ট বদনে নিজের চেয়ারের দিকে এগোতে গিয়েও আবার দাঁড়িয়ে পড়ল টেবিলের দু'টো সোডার বোতলই খালি। আর স্কচের বোতলের পদার্থও একেবারে তলায় এসে ঠেকেছে। দু'হাতে সোডার বোতলগুলো তুলে নিয়ে সে

আবার কোণের টেবিলের দিকে চলল।

মাধব ঘোষের এবারও সাহায্যের জন্য ওঠার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কোটিপতি বটোকেষ্ট বনার্জীর মেজাজ পত্র আজ একটু অন্যরকম দেখছে। ধমকের ভয়ে বসেই রইল। তারপর সুবীর রায়ের দিকে ঝুঁকে টেনে টেনে তারিফ করল, এত খেয়েও লোকটা কেমন স্টেডি দেখেছ দাদা?

দাদার বিগলিত বদন। ঢুলু ঢুলু চোখে মাথা নাড়ল—স্টেডি লা-ই-ক্ এ-র-ক্। তোদের ম্যাডামকে আজ কেমন দেখছিস? আজকের সাজ লক্ষ্য করেছিস?

সুযোগ পেয়ে দু'চোখ টান করে বন্দনার দিকে ফেরাল। লক্ষ্য করা নয়তো, গায়ে লোভের হুল ফোটানো। সোল্লাসে মন্তব্য করল, হুঁ। আ ব্রেইজিং লেডি—মারভেলাস।

বন্দনা আগেই বুঝেছে দুজনেই আজ মাত্রা ছাড়িয়েছে। খুব চাপা গলায় ধমকে উঠল, এই—কত খাচ্ছ?

সুবীর রায়ের কানেও ঢুকল না। তেলতেলে মুখে হাসি চুঁইয়ে পড়ছে।—ব্রেইজিং লেডি দা-রু-ণ বলেছিস তো।

এক হাতে তিনটে সোডা অন্য হাতে আস্ত আর একটা হুইস্কির বোতল নিয়ে বটোকেষ্ট বনার্জি ফিরল। তার মধ্যে এদের দুজনের গেলাস শেষ। ওগুলো টেবিলে রেখে বনার্জী ধীরে সুস্থে নিজের চেয়ারে বসল। নতুন বোতলটা খুলে নিজের গেলাসে ঢেলে নিয়ে অন্য দুজনের দিকে এগিয়ে দিল। দামী বিলাতী জিনিস হলেও ভদ্রলোকের উদার হাত।

মাধব ঘোষ তক্ষুনি বোতলটা নিয়ে কাঁপা হাতে আগে নিজের গেলাসে ঢালল, তারপর পাশের গেলাসে। দুটো গেলাসেরই পরিমাণ দেখে বন্দনার চক্ষু-স্থির। আগে আরো ক'দফা হয়ে গেছে জানে না। তার চোখে চোখ পড়তে বিরক্ত বোঝানোর জন্য সামান্য ভুরু কোঁচকালে। সুবীর রায় রসিকতা করে উঠল, দেখছেন মিস্টা-র বনা-আ-র্জি, আজ আনন্দে একটু বেশি খাচ্ছি বলে আপনার হিরোইন রা-গ- করছে।

গেলাসে সোডা ঢালতে ঢালতে মাধব ঘোষও রসিকতায় যোগ দিল, একটু আগে আমি ম্যাডামকে ব্লেজিং লেডির মতো দেখাচ্ছে বলছিলাম—এর ওপর রেগে গেলে আমাদের গেলাসগুলোতেও আগুন লেগে যাবে—ম্যাডাম প্লি-জ্ !

বটোকেষ্ট বনার্জী সোডা ছাড়াই গেলাসে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে। মাধব ঘোষের কথায় একটু আড় হয়ে গদির চেয়ারে হেলান দিয়ে সে-ও নতুন করে ব্লেজিং লেডি দেখেছে। কিন্তু এই দেখাটা কেন যেন আগের আয়েসী দেখার মতো লাগছে না বন্দনার।

নিজের সফ্‌ট ড্রিংক-এর গেলাস অর্ধেকটা খালি করে পাশে রাখল। সহজ হবার তাড়নায় সোজা তার দিকেই তাকালো। হালকা সুরে বলল, আজ আপনার আসর এত ফাঁকা যে ?

ও-পাশ থেকে মাধব ঘোষ তড়বড় করে উঠল, আজ মি-স্টার বনার্জি সে-রকম মুডে নেই।

—ননসেন্স আই আম ইন ওয়ান অফ মাই রেয়ার মুড্‌স। বটোকেষ্ট বনার্জির এই বিরক্তি যার উদ্দেশ্য তার দিকে ফিরেও তাকালো না। সে তার দ্রষ্টব্য দেখছে। চোখ দুটো আজ হাসির আভাসে চিকচিক করছে, রমণী দেহের ওপর ওঠা-নামা করছে। মুখে তারপর আর কথা নেই, মাঝে মাঝে গেলাসে চুমুক দিচ্ছে।

বন্দনা হঠাৎ দারুন অস্বস্তি বোধ করছে। নিজের গেলাস তুলে একটা বড় চুমুক দিল। তার মনে হল, শিকার নাগালের মধ্যে জেনে হিংস্র পশু আয়েসের চোখে শুধু তাকে দেখেই না, শুধু মজাই পায় না—আলস্য ঝেড়ে এক সময় তৎপরও হয়। এই লোকের যেন তেমনি তৎপর হবার দিন এটা।...আজ লোক এত কম কেন ? এই দুজন আজ এত মদই বা খেয়ে চলেছে কেন ?

সফ্‌ট ড্রিং শেষ করে বন্দনা গেলাস নামাতে বনার্জি মৃদু গলায় জিগ্যেস করল, আর একটা আনব ?

—না, থ্যাঙ্কস্।

বটোকেষ্ট বানার্জি এতক্ষণে ধীরে সুস্থে সুবীর রায়ের দিকে ফিরল।

—তাহলে মিস্টার রায়, এই বৃহস্পতিবার আপনার স্ক্রপ্ট্ শেষ হচ্ছে, আর শনিবারের রাতের গাড়িতে আমরা পুরী যাচ্ছি…?

শোনা মাত্র বন্দনার বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল স্ক্রপ্ট শেষ হলে কেন কোথাও যাওয়া জানা না থাকা সত্ত্বেও। আর আমরা বলতেই বা আর কারা? সুবীর রায়ের নড়েচড়ে সোজা হবার চেষ্টা।

—ও শিওর! সেখানে বি. এন. আর হোটেলে বসে সমুদ্রের হাওয়া খেতে খেতে স্ক্রপ্ট্ শোনা হবে, আলোচনা হবে—এর থেকে স্প্লেনডিড আইডিয়া আর কি হতে পারে। আপনি অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফেলুন।

বনার্জি আস্তে আস্তে বন্দনার দিকে ফিরল।—আমি এখানে বসে স্ক্রপ্ট্ শুনতে রাজি না, এখানকার ব্যস্ততার মধ্যে কিছুই আমার মাথায় থাকবে না' তার থেকে ওখানে তিন চার দিন বসে ধীরে সুস্থে শোনা যাবে, আলোচনাও করা যাবে—আপনি আসার আগে এঁদের সঙ্গে সেই আলোচনাই হচ্ছিল।—হাউ ডু ইউ লাইক দি আইডিয়া?

বন্দনা প্রাণপণে সহজ থাকার চেষ্টা করছে। হেসেই জবাব দিল, মন্দ কি, চলে যান…আপনার একটু চেঞ্জও হবে।

—হোয়াট অ্যাবাউট ইউ?

এবারে আকাশ থেকে পড়া মুখ। —আমি' আমি এখন যাই কি করে?

এবারে সুবীর রায় বলে উঠল, এটা আবার কি কথা হল? আমাদের মতো ট্রেনে যাবে ··আবার কি করে যাবে। তারপরে হেসে রসিকতার সুরে যোগ করল, অবশ্য মিস্টার বনার্জি যদি ইচ্ছে করেন, প্লেনেও যেতে পারো।

বন্দনা স্থির চোখে তার দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর আবার বনার্জির দিকে ফিরে ঠাণ্ডা অথচ স্পষ্ট স্বরে বলল, আপনারা যান, আমার এখন যাওয়া সম্ভব নয়।

সঙ্গে সঙ্গে সুবীর রায় তেতে উঠল, ডোণ্ট বি ইম্পসিব্‌ল বন্দনা —তুমি না গেলে যাওয়ার কোন মানে হয়! সব ঠিক হয়ে গেল,

মিস্টার বনার্জি বলেছেন তিনি এখানে বসে স্ক্রিপ্ট শুনবেন না—আর তুমি বলছ এখন যাওয়া সম্ভব নয়। কেন—তোমার কি অসুবিধে? আউট-ডোর শুটিং-এর সময় একবার ছেড়ে তিন বার করে তোমাকে বাইরে যেতে হবে না?

আবারও তার দিকে ফিরতে হল। এই মুখ নিজের স্থির দু'চোখে আটকে নিল। স্পষ্ট কঠিন গলায় জবাব দিল, সে-যাওয়া আর স্ক্রিপ্ট শুনতে বা শোনাতে যাওয়া এক নয়—আমার অসুবিধে আছে।

নেশা চড়লে রাগও সহজে চড়ে। নইলে এই মুখ দেখে আর এই গলা শুনে সুবীর রায়ের একটু থমকানোর কথা। এখন ফল বিপরিত। গলা দ্বিগুণ চড়িয়ে সজোরে টেবিলে চাপড়ে বলে উঠল তোমার কিছু অসুবিধে নেই, আই সে, ইউ মাস্ট গো। ইউ মাস্ট—।

বন্দনা অপলক চেয়ে আছে। মুখে লালের আভা ছড়াচ্ছে। কিন্তু গলার স্বর সংযত—ইউ আর ড্রাংক···চেঁচিও না

জঠরের জলীয় পদার্থ মুহূর্তে আগুন হয়ে মাথার দিকে ছুটল। চেয়ার ছেড়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল।—কি বললে? আমি ড্রাংক। আর মদ না খেয়েও যে তুমি আমার থেকে বেশি পাগলামি করছ? এত দেমাক তোমার তুমি আমাকে অপমান করো মিস্টার বনার্জীকে অপমান করো! হাতের ধাক্কায় গেলাসটা উল্টে সামান্য যেটুকু অবশিষ্ট ছিল টেবিলে পড়ল আরো জোরে টেবিলে চাপড়ে বলে উঠল, তোমাকে যেতে হবে—দরকার হলে হাজার বার যাবে—যেতে হবে—হবে হবে হবে।

পায়ের ধাক্কা লেগে চেয়ারটা উল্টে পড়ল। সেটার সঙ্গে ঠোক্কর খেয়ে নিজেও পড়ো পড়ো সামলে নিয়ে টলতে টলতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। এবারে মাধব ঘোষও উঠল।—কি কাণ্ড··· মাথারই গণ্ডগোল হয়ে গেল দেখছি দাদা— ও দাদা!

সেও টলতে টলতে আরো দ্রুত হলঘর পেরিয়ে উধাও।

এ-ঘর স্তব্ধ খানিক্ষণ। বন্দনার সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ। কিন্তু সর্বাঙ্গ অবশ ভাবছে শক্তি দরকার, এই মুহূর্তে অনেক শক্তি দরকার। দেহের

অণুতে অণুতে সে শক্তি জড়ো করার চেষ্টা। কিন্তু সেটা খুব সহজ হচ্ছে না। আস্তে আস্তে বটোকেষ্ট বনার্জির দিকে ফিরল। অপলক চাউনি তার মুখের ওপর স্থির করে নিল।

…কিন্তু এখন আবার এই লোকের দু'চোখ একটুও চিকচিক করছে না, হিংস্র তৎপরতার কোন তাড়া দেখছে না। আগের ক'টা দিনের মতই মজা-ছোঁয়া আয়েসী পর্যবেক্ষণ মগ্ন। ঠোঁটে হাসি।

বন্দনা চোখে নামাচ্ছে না। সে-ও না।

আপনার হঠাৎ এত অসুবিধে? ভরাট গলার প্রশ্ন। বন্দনার জবাব তেমনি ঠাণ্ডা।— অসুবিধে কি আপনার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে? কৌতুকের খোরাক পেল যেন। ঠোঁটের হাসি আরো স্পষ্ট। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল।—না।…কিন্তু এ রকম অসুবিধের মধ্যে আপনি আর আগে কখনো পড়েননি?

স্পষ্ট কঠিন স্বরে জবাব দিল, না।

—কিন্তু আপনার এঁরা তো আমাকে জেনে বুঝেই এতটা এগিয়েছেন। আমি এঁদের স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, এ ধরনের সাইড-বিজনেসে নামতে আমার আপত্তি নেই--বাট নট্ উইদাউট সাম ফান…কেন পুরী যেতে চাই বুঝেও এঁদের আপত্তি হয়নি আপনার এ অসুবিধে আমি তাহলে কতটা সত্যি বিশ্বাস করব? ভদ্রলোকের দু'চোখ বন্দনার মুখের ওপর আটকে আছে, রমনীর এই আত্মসংযমের কতটা অভিনয় তার কতটা খাঁটি দেখে নিচ্ছে। ভারী গলার স্বরেও কৌতুকের ছোঁয়া। - আমি যদি বলি আপনি প্রথম দিন দেখেই আমাকে বুঝেছেন…আর নিজের ঘরের মানুষকে তার ঢের আগেই জেনেছেন তাহলে খুব ভুল হবে?

এবারে থমকাতে হল। বন্দনা নিজের মনের দেয়ালেই কপালটা ঠোকর খেল। মিথ্যে নয়, প্রথম দিন থেকেই এই লোককে বুঝেছে তবু এসেছে। আর নিজের ঘরের মানুষকেও আগে জেনেছে, আভাসে ইংগিতে তাকে লোভের টোপ হতে বলেছে, না আভাসে ইংগীতে কেন, সাজে পোশাকে কথায় বার্তায় সর্বভাবে ও এই একজনের নজরে

পঙ্গু,ক—তাই চেয়েছে। কিন্তু তখন ওই লোককে সে হতাশ থেকে টেনে তোলার সংকল্পে অন্ধ ছিল।

বটোকেষ্ট বনার্জি এই হোঁচট-খাওয়া দেখেছে। নিঃশব্দ হাসিতে ভরাট মুখ। বন্দনা আবার মুখ তুলতেই ভারী গলা খুব নরম করে অনুমতি চাইল' মে আই কিস্ ইউ ?

বন্দনা ছিটকে উঠে দাঁড়াল। চেয়ার সুদ্ধ, এক পা পিছু হঠল। ফর্সা মুখে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে আসতে লাগল। অপমানে আর অসহায় ক্রোধে চোখে আগুনের হলকা।

বনার্জি এবার আশ্বস্ত করার মতো করে একটা হাত তুলল। নিঃশব্দে হাসি এবারে শুধু দুই ঠোঁট আশ্রয় করল।—ঘাবড়াবেন না দ্যাট্ ওয়াজ্ জাস্ট এ টেস্ট বুলেট নট এগজ্যাক্টলি মেণ্টা আমার যেটুকু বোঝার ওই থেকেই বুঝে নিয়েছি। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল। —আসুন

বড় বড় পা ফেলে হলঘরের দিকে এগোল। বন্দনা নিজের অগোচরে সেদিকে ফিরল, কিন্তু স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল

বটকেষ্ট বনার্জি হলঘরের কাছাকাছি গিয়ে ঘুরে তাকালো গম্ভীর। আবার ডাকল, আসুন, ভয় পাবেন না—আই নেভার রান অফটার আনউইলিং পারসন্স্।

বন্দনা বিশ্বাস করবে কি করবে না জানে না। কিন্তু সে নিরুপায়। পায়ে পায়ে এগোল। হলঘরে। হলঘর ছাড়িয়ে বাইরে' ওই দু'হাত সামনে। বনার্জি আগে আগে লিফটের সামনে এসে দাঁড়ালো। —আসুন'

বন্দনা লিফ্ট-এর ভিতরে। ওই লোকও। কাচ লাগানো দরজা টেনে দিল। বোতাম টিপল। লিফ্ট নামছে। ঘুরে দাঁড়াল। মাঝে আধ হাত ফারাক। বন্দনা তখনো বিশ্বাস অবিশ্বাসের ঢেউয়ে আছাড় খাচ্ছে।

নিচে। দরজা খুলে সে আগে বেরুল। বন্দনা পিছনে। কে বলবে লোকটা সন্ধ্যা থেকে কেদারে জল গিলেছে। আগে আগে

বাইরের বারান্দার দিকে চলল। বন্দনা পিছনে। বারান্দার সিঁড়ি ধরে সামনের কম্পাউণ্ডে নেমে বটোকেষ্ট বনার্জি দাঁড়ালো। নির্বাক মূর্তির মতো বন্দনাও। দশ হাত দূরে ঝকঝকে বিলাতী গাড়িটা দাঁড়িয়ে। মালিককে দেখে ড্রাইভার অন্য দিক থেকে গাড়ির কাছে ছুটে এলো।

বটোকেষ্ট বনার্জি এবারে আস্তে আস্তে ঘুরে তাকালো। বন্দনা যন্ত্রচালিতের মতই মুখ তুলল। খুব সহজ স্বাভাবিক সুরে বনার্জি বলল, আই অ্যাম এ স্কাউণ্ড্রেল নো ডাউট কিন্তু আপনার যার ওপর নির্ভর সে আমার থেকেও বড় স্কাউণ্ড্রেল। আসুন—

সোজা গাড়ির সামনে ড্রাইভার তৎপর হবার আগে নিজেই দরজা খুলল। বন্দনা কাছে আসতে বলল, উঠুন—

উঠল। বসল। বটোকেষ্ট বনার্জি ড্রাইভারকে বলল, মেম-সাবকো ঘর লে যাও— দরজাটা বন্ধ করল।—গুড নাইট।

ফিরে চলল। বাড়ির গলির মুখে থামল। বন্দনা নামল।

গলিটা অন্ধকার বাড়িতে ঢুকলে আলো। কিন্তু সেটা এরপর কেমন আলো? তবু আজ ওখানেই যেতে হবে। মেয়ে আছে। কাল কি করবে কাল ভাববে

রাত প্রায় দশটা এখন। নিভা গলির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে আসতে দিদিমণির দেরি দেখে দুশ্চিন্তার কথা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু মুখ দেখেই থেমে গেল। এত রাতে সঙ্গে আর কাউকে না দেখেও কম অবাক নয় হয়তো।

বন্দনা পাশ কাটিয়ে চলে গেল ঘরে পা দিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল মুখে আবার রক্ত উঠতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝল কেন নিভা গলির দরজা খুলে বাইরে দাঁড়িয়েছিল। তার দুশ্চিতা স্বাভাবিক। মেয়ে তার জায়গায় ঘুমোচ্ছে। পাশে তার বাবা। অঘোরে ঘুমোচ্ছে সে-ও থেকেথেকে নাকডাকার বীভৎস শব্দ।

বন্দনা দাঁড়িয়ে দেখল একটু। ঘৃণা অফুরন্ত ঘৃণা। সেই সঙ্গে বুকের তলায় অসহ্য যন্ত্রণা। যত ঘৃণা ততো যন্ত্রণা।

নিজের জামা কাপড় নিয়ে বেরিয়ে এলো। বসার ঘরে এসে বদলাল। ছেলে দুটো সরিয়ে ঘুমোচ্ছে তাই কিছুটা স্বস্তি। সেটি দুটো সরিয়ে সোফা-কাম বেডটা পাতল কেনার পর এই প্রথম ওটা পাতা হল নিভা দরজার কাছে হাঁ করে দাঁড়িয়ে।—মিতাকে নিয়ে এসো, ওর বিছানাও---

নিভা বিমূঢ় মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

-কানে কম শোন?

এবারে শশব্যস্ত। সমস্ত রাত প্রায় বসেই কেটে গেল বন্দনার। অনেকবার স্থির করেছে কাগজের বিয়ে ছিঁড়ে দেবে। কিন্তু এত ঘৃণা এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও নিজের ভিতর থেকে সায় পাচ্ছে না কেন জানে না। যা ই করুক ঠাণ্ডা মাথায় করতে হবে।

মেয়েটার কথা ভাবার আছে। ছেলে দুটোর চিন্তাও একেবারে ছেঁটে দিতে পারছে না। সব থেকে আগে রোজগারের ব্যবস্থা দরকার। নইলে মেয়েটাকে নিয়ে কোথাও যাবার ঠাঁই নেই।

খুব ভোরে পাংশু মুখে সুবীর রায় একবার মাত্র এ-ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। অনুতাপে দগ্ধানো গলায় বলতে চেষ্টা করেছিল, কাল রাতে অত বেশী খেয়ে ফেলে ·

বন্দনা আস্তে আস্তে তার দিকে ঘুরেছে একটা ঘৃণার ঝাপটা খেয়ে ওই লোক মুখের কথা শেষ না করেই সরে গেছে। ঘণ্টাখানেক চুপচাপ কাটিয়ে নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। ভোলাকে বলে গেছে, এ বেলা ফিরবে না।

সন্ধ্যার পর ফিরে বসার ঘরে ঢুকেই স্তব্ধ একটু। সোফা সেটি সব এক ধারে সরানো। অন্য দিকে তার খাট, আলনা, কাপড় জামা, সুটকেস, এমন কি দেয়ালের তাকে রাখা তার ফাইল-পত্র পর্যন্ত। সুবীর রায়ের ভিতরের দিকে আর পা বাড়ানো হল না।

সেখানেই বসল

ছেলে দুটো বারকয়েক উঁকি দিয়ে গেল। খাট থেকে শুরু করে বাবার সব কিছু ভোলাদা আর নিভামাসিকে এ-ঘরে সরাতে দেখে

ওরাও কম অবাক হয়নি। নিভা অবশ্য ওদের বুঝিয়েছে, মেয়ে রাত্তে কাঁদে, ওদের বাবার ঘুমুতে অসুবিধে হয় তাই এ ব্যবস্থা।

কিন্তু সকাল থেকে ছোটমাকে দেখে তাদেরও এটাই একমাত্র কারণ মনে হয়নি। বিশেষ করে বঙ্কির। এখন ছ'ভাইয়েরই বাবার মুখখানাও দ্রষ্টব্য মনে হয়েছে।

পরদিন সকালে কি জন্যে আলমারি খুলতে বন্দনার প্রথমেই নোটের গোছার দিকে চোখ গেছে। ···পাঁচ হাজার টাকা অ্যাডভান্সের প্রায় সবটাই ওখানে। ওগুলো ছুঁতেও বিতৃষ্ণা, তবু তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলো সামনে বঙ্কি। একটা আঙুল তুলে বন্দনা সোজা ওদের ঘর দেখিয়ে দিল বিমূঢ় বিস্ময়ে পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে সেদিকে চলল। বন্দনা তখন এ-ঘরের দরজায়। সুবীর রায় সোফায় চুপচাপ বসে মুখ তুলতে বন্দনা সজোরে টাকার গোছা ছুঁড়ে দিয়ে চলে এলো।

ছুটো দিন চলে গেল। কি ভাবে গেল বাড়ির প্রতিটি লোক অনুভব করেছে। সাহস করে তৃতীয় সন্ধ্যায় সুবীর রায় বন্দনার সামনে এসে দাঁড়াল। মেয়ে খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে হাত পা ছুঁড়ছে। বন্দনা বসে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই ঘৃণার ঝাপটা সুবীর রায় এবারে এটা সহ্য করবে বলেই এসেছে। কাতর সুরে বলল, বিশ্বাস করো. সেই রাতে অত ড্রিংক করে আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছল আমি প্রতিজ্ঞা করছি আর কখনো মদ খাব না····

বন্দনার মুখ চোখ পাথরের মতো কঠিন।—জবাব দিতে সময় নিল। বলল, তার দরকার নেই, মদ খেয়েছিলে বলে আমি তোমার ভেতরের বীভৎস চেহারাটা দেখতে পেয়েছি ···যার কাছে যে জন্যে তুমি আমাকে ফেলে রেখে চলে এসেচিলে, সে আমাকে কতদূর পর্যন্ত টেনে নামাতে পেরেছে জানতে চাও না?

মুখে হাসি টানার চেষ্টা, সেই সঙ্গে তোয়াজের চেষ্টা।—নিভার মুখে শুনেছি রাত সাড়ে দশটার মধ্যে তুমি ফিরছেন।

কথা বলতেও ঘেন্না, তাই গলা দিয়ে হিস হিস আগুন।—সর্বস্ব খোয়াবার মতো সেটা যথেষ্ট সময় নয় ভাবো?

সুবীর রায় শুকনো জিভে করে শুকনো ঠোঁট দুটো ঘষে নিল একবার। গলার স্বর লঘু করার চেষ্টা।—হুঁ' তার অত সাহস আছে নাকি··· এতটুকু বেচালের কথা শুনলে আমি তাকে···

--থামো! সে তোমার মতো কাপুরুষের নয় বলেই আমাকে দয়া করেছে। কিন্তু আমি আর তোমাকে দয়া করতে রাজি নই। শোনো আমি ডিভোর্সের দিকে এগবো কিনা এখনো ঠিক করিনি—কিন্তু এর পর কোন দরকারে আমি না ডাকলে যদি তুমি কখনো এ-ঘরে আমার সামনে এসে দাঁড়াও—আমি বরাবরকার মত এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

—বন্দনা···প্লীজ···এই বারটি --

বন্দনা খাট থেকে নামল। সমস্ত মুখ তপতপে লাল। কোণের টুলের ওপরে রাখা নিজের বড় সুটকেশটা এক টানে তুলে এনে বিছানায় ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে হাঁক দিল, নিভা—!

সুবীর রায় ব্যাপার বুঝে ত্রস্ত।—থাক থাক, আমি আসব না। কথা শেষ হবার আগেই প্রস্থান।

দিদিমণির টকটকে লাল মুখ দেখে নিভা দরজার কাছে জড়সড়। —থাক, যাও।

এরপর দুটো দিন বন্দনা খুব ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে কাটিয়েছে। যত ভেবেছে একজনের মুখই বারবার চোখের সামনে এগিয়ে এসেছে। যে মানুষ একদিন খুব স্বাভাবিক একটা ইচ্ছে নিয়ে কাছে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু বন্দনা সে-ইচ্ছে বরবাদ করে দেবার পরেও এতটুকু অভদ্রতার ছায়াও তার মধ্যে দেখেনি। কেন যেন মনে হল এখনো দেখবে না।

দাদার বন্ধু প্রদোষ খাসনবিশ।

গলির বাইরে চেনা দোকানে গিয়ে গাইড দেখে ফোন নম্বর বার করে ডায়েল করল। গলা শুনেই বুঝল কে। তবু কয়েক মুহূর্তের জন্য একটু থমক। তবু বলল, মিস্টার প্রদোষ খাসনবিশকে চাইছি।

কথা বলছি।

দাদার নাম করতে গিয়েও করল না।—আমি বন্দনা।···চিনতে পারছেন ?

কয়েক মুহূর্ত সাড়া নেই। তার পরেই উৎসুক গলা।—বন্দনা!—কি খবর ?তুমি কোথা থেকে ?

—একটা দোকান থেকে। আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে ?

—নিশ্চয় তোমার ঠিকানা বলো।

—আমি আপনার বাড়ি গেলে অসুবিধে হবে ?

ব্যস্ত।—না না, অসুবিধে কি ?

পরদিন সকলে ন'টায় সময় ঠিক হল। প্রদোষ খাসনবিশ বলল সেই প্রায় আড়াই বছর আগে একবার এসেছিলে—বাড়ি চিনতে পারবে তো ? ডিরেকশন বলে দেব ?

গাইড দেখে বাড়ির ঠিকানা ফোন নম্বরের নিচেই লিখে রেখেছে। বলল, না, আমি ঠিক চিনে যেতে পারব।

পরদিন সকাল ন'টার কয়েক মিনিট আগেই পৌঁছল। বড়লোকের বনেদী বাড়ি। বাইরের চাকচিক্য কম। সিঁড়ির কাছে একটা পুলিশের জিপ অপেক্ষা করছে। তার পাশে যে লোকটি দাঁড়িয়ে আর একজনের সঙ্গে কথা বলছিল, বন্দনা দূর থেকে দেখেই তাকে চিনল। প্রদোষ খাসনবিশের পরের ভাই প্রবোধ খাসনবিশ। ··দাদার বিয়ের ব্যাপারে এই লোক বোঝাপড়া করার জন্য তাদের বাড়িতে এসেছিল সে বোধহয় আজও কেউ জানে না। তাকে দেখে বন্দনা অস্বস্তি বোধ করল একটু।

দাদার বিয়েতেও প্রবোধ খাসনবিশ এগিয়ে এসে সমাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। তার আগে বাড়িতেও বৌদির মুখে এদের তিন ভাইয়ের গুণ-গান শুনত। বড় ভাই তখনই পদস্থ পুলিশ অফিসার, আর ছোট ভাই বামপন্থী দলের উঠতি লিডার।

দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে কিছুটা কাছে আসতে প্রবোধ খাসনবিশ তাকে দেখেই চিনল। পুলিশের চোখ, তাছাড়া এই মহিলার প্রতি দাদার

দুর্বলতা জানত বলেই দু'চোখে কৌতূহল। অনুগত ভাই দাদাটির জন্য কম করেনি। তাকে দেখে দাদার জন্য দুঃখও হয়েছিল, আলাপ করেও মনে হয়েছিল মনে ধরার মত একজন বটে। আর গেল বছর দাদার পাশে বসেই এর 'ব্যক্তিত্ব' ছবিও দেখেছিল। মনে আছে ছবির চেহারা দেখে দাদা রেগেই গেছল।

আজ বাড়ির দোরে তাকে দেখে কৌতূহল স্বাভাবিক। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে নমস্কার জানালো।—আপনি…!

বন্দনা সামান্য হেসে জবাব দিল, আমার আসার কথা ছিল… আপনার দাদা আছেন তো?

—আছেন, আসুন। ব্যস্ত হয়ে নিজেই সঙ্গে নিয়ে চলল। একতলায় তিন ভায়ের তিনটে ড্রয়িং রুম। মাঝেরটা দাদার। কেউ আসবে বলেই হয়তো দাদা ঘরে একলা বসে দাদা তার শুধু দাদাই নয়, বন্ধুর মতো মহিলার হঠাৎ এই আসাটা পুলিশ অফিসার ভাইয়ের চোখে খুব প্রাঞ্জল ঠেকল না। কটাক্ষে দাদার মুখখানা একবার দেখে নিয়ে সে বেরিয়ে গেল। দেখা মাত্র বুঝেছে কার অপেক্ষায় দাদা বসে।

বন্দনা দু'হাত জোড় করে নমস্কার জানালো। তার ফাঁকে লক্ষ্য করল ভদ্রলোক আরো মোটা হয়েছে, কিন্তু মুখ আগের থেকেও প্রসন্ন। সুখের জীবন নয় ভদ্রলোকের এমন কথা কেউ বলবে না।

চেয়ার ঠেলে উঠে এসে প্রদোষ খাসনবিশ আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালো—এসো এসো—ভাল আছ? বোসো—

বন্দনা বসল। তার বসার জন্য অপেক্ষা করল তারপর খুব সহজ মুখে বলল, ভাল যত দিন ছিলাম ততো দিন আপনার কথা মনে পড়েনি আজ বিপাকে পড়ে মনে পড়েছে।

এ রকম জবাব অপ্রত্যাশিত। প্রদোষ খাসনবিশের দু'চোখ তার মুখের ওপর থমকালো একটু। কপালে সিঁদুর নেই, কিন্তু সিঁথিতে সিঁদুরের সরু আঁচড়ে বিয়ের খবর কাগজেই পড়েছিল এই শুনে চট করে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও পারল না। নিজেই যেন অপ্রস্তুত একটু।

বন্দনা নিজেই বলল, আপনি একদিন এক নাম-করা মেয়ে স্কুলে আমার চাকরির চেষ্টা করতে পারেন বলেছিলেন···আপনার বাবা এখনো সেখানকার ম্যানেজিং কমিটিতে আছেন? প্রদোষ খাসনবিশ এর চাউনি তার মুখের স্থির হল একটু। জবাব দিল, বাবা গত বছর মারা গেছেন। আমি তাঁর জায়গায় ম্যানেজিং কমিটিতে আছি। ···কেন?

এক বছর পরে বাবার মৃত্যুর জন্য দুঃখের কথা বলা হাস্যকর। বন্দনা সে-চেষ্টা করল না। একটু চুপ করে থেকে বলল, ওই স্কুলে এখন আমার কোন কাজ হতে পারে?

সে কি! —তোমার ফিল্ম?

—ছেড়ে দিয়েছি।

—কেন···তোমার অভিনয় তো খারাপ হয়নি--

খুব শান্ত গলায় বন্দনা বলল, ফিল্মের কথা যতবার তুলবেন আমি লজ্জা পাব।···একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলাম, স্কুলে চাকরি করি যদি আপনাকেই ধরব। আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, সে-রকম দরকার না হলে এত ছোট হয়ে সেই চাকরির জন্যেই আসতাম না।

প্রদোষ খাসনবিশ হাঁসফাঁস করে উঠল।—এ কি কথা···ছোট কেন হবে। দরকারে তোমার আমাকে মনে পড়েছে সেটাই বড় কথা। আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব, তবে--আচ্ছা থাক··

ব্যস্ত হাতে এক শিট কাগজ আর নিজের কলমটা তার দিকে এগিয়ে দিল।—প্রিন্সিপ্যালের নামে একটা অ্যাপ্লিকেশন দাও—হায়ার সেকেণ্ডারির টিচারের পোষ্ট-এর জন্য লিখো।

বন্দনার লিখতে পাঁচ সাত মিনিট লাগল। পড়ে প্রদোষ খাসনবিশ ওটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল।—বাড়ির ঠিকানা লেখনি

বন্দনা অসহায় দু'চোখ তুলে তার দিকে তাকালো। বলল, শুধু একটুর জন্যে আমার যোগ্যতা বাতিল হওয়া উচিত।

ঠিকানা লিখে দিল। প্রদোষ খাসনবিশের ভিতরে ভিতরে বিষণ্ণ অনুভূতি একটু। কিন্তু কিছু বলতেও পারছে না।

—আজ আমি তাহলে উঠি ?

—সে কি ! এবারে ব্যস্ত।—একটু চা-ও খেলে না, তাছাড়া আমার স্ত্রীকে ডাকি··

—আজ যে জন্যে এসেছি আজ না...ভাগ্যে থাকলে পরে আর একদিন তাঁর সঙ্গে আলাপ হবে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়াল। অগত্যা প্রদোষ খাসনবিশও। বাড়ি থেকে নেমে সামনের রাস্তা পর্যন্ত চুপচাপ সঙ্গে এলো। শেষে দ্বিধা কাটিয়ে বলে ফেলল, হঠাৎ কি হল তুমি কিছুই বললে না, কিন্তু··· আমাকে একটু ভাবনার মধ্যে রেখে গেলে।

বন্দনার শান্ত চাউনি তার চোখে মিলল।—আপনি অনেক বড় তাই ভাবেন যে-লাইনে পা বাড়িয়েছিলাম সেটা অন্তত আমার জন্য নয় বুঝতে পেরেছি। আসি···।

বন্দনা এগিয়ে গেল।

নামী স্কুলে সেই চাকরি পনেরো দিনের মধ্যে হয়েছে। ফিল্মের অভিনেত্রীকে স্কুলে চাকরিতে নেবার ব্যাপারে অনেকের আপত্তি ছিল পরে তা-ও কানে এসেছে। কার-জোরে বা চেষ্টায় সে-বিঘ্ন কেটেছে জানা কথাই।

কিন্তু প্রদোষ খাসনবিশ এ নিয়ে বন্দনাকে কখনো একটি কথাও বলেনি।

## ॥ পাঁচ ॥

একে একে ছটা বছর পার হয়েছে। সময় অনেক ভোলায়। ক্ষতর যন্ত্রণার ওপর প্রলেপ পড়ে। বন্দনা রায়ের স্কুলের কাজ সেই প্রলেপের কাজ করে। যতক্ষণ স্কুলে থাকে মন ঢেলে দেয়, তার সুফল পাচ্ছে। তার অভিনেত্রী জীবনের অধ্যায় এখন সকলেই ভুলেছে। এ-নিয়ে শিক্ষায়িত্রীদের অনেকের কৌতুহল ছিল। কিন্তু বন্দনার আচরণে শুধু মনে হয়েছে সময়ে সে একটা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত

করতে পেরেছে। কাজের সঙ্গে দম্ভ বা অহংকার যুক্ত না হলে তার চেহারা আলাদা। রূপের সঙ্গে গর্ব যুক্ত না হলে সেই রূপ আলাদা। সকলের সম্ভ্রম তখন আপনা থেকেই তার দিকে গড়াতে থাকে। মেয়েরা শ্রদ্ধা করে ভক্তি করে। সহকর্মিণীদের অনেকেই এখন সত্তার বিনীত মহিমা দেখে। প্রিন্সিপ্যাল খুশি। বন্দনার একটু আনন্দ তাকে এনে প্রদোষ খাসনবিশের মাথা আরো উঁচু হতে পেরেছে।

কিন্তু বাড়িতে ফেরাটা এখনো পোড়া ঘরে ফেরার মতো। সুবীর রায় যখন থেকে বুঝতে পেরেছে মেয়ের কারণে হোক, স্কুলে মান-মর্যাদা রক্ষার কারণে হোক বা যে কারণেই স্ত্রী কোনো চূড়ান্ত বিচ্ছেদের রাস্তায় এগোবে না, তখন থেকেই একটু একটু করে তার অসহিষ্ণুতা বাড়ছে, ক্ষোভ বাড়ছে, রাগ বাড়ছে। এখনো ভাবে সবস্ব না খুইয়েও একটু বুঝে শুনে চললে বটোকেষ্ট বনার্জির মতো অমন শাঁসালো পার্টি হাত ছাড়া হত না। এই ছ'বছরে তার নতুন কোম্পানির ব্যানারে চার চারটে ছবি হয়ে গেছে। এদিকে অত বড় স্কুলে এমন অনায়াসে স্ত্রীকে কাজ পেতে দেখে সুবীর রায় সেই দুদিনে কিছু মনে হয়নি। ভেবেছিল এম-এ পাশ বলে কাজে জুটেছে। কিন্তু এখন ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার মস্ত বড় লোক প্রদোষ খাসনবিশকে নিয়েও তার সন্দেহ দাহ, দংশন। এর ওপর আছে নিজের ব্যর্থতা, আশাহত আত্মাভিমান এখন নিজে যেচে স্ক্রিপ্ট-এর কাজ খুঁজতে বেরুতে হয়, সিনেমার গল্প বেচারজন্য ঘোরাঘুরি করতে হয় কোনো ছবিতে ম্যানেজারি করার দায়িত্ব পেলে তা-ও নিতে হয় নামে ম্যানেজার কিন্তু সাদা কথায় প্রোডিউসারের। করুণার পাত্র ছাড়া আর কিছু নয়—তার এক সময়ের অনুগ্রহপ্রার্থীর আর্টিস্টদেরও ধমক খেতে হয়। তাদের নাম হয়েছে, মেজাজ গরম তাই। ফলে নিস্ফল আক্রোশ সুবীর রায় অনেক সময়েই বাড়িতে বসে বাতাসে কথা ছেড়ে।

বন্দনা এদিক থেকে বন্দনা এদিক থেকে অকরুণ রকমের নিস্পৃহে। আজও ওই লোকের তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে কিছু বলার সাহস নেই। উল্টে খোঁচা লাগার মতো কিছু কানে এলে, সোজা তার সামনে গিয়ে

দাঁড়ালেই হল, ঠাণ্ডা দু'চোখ মুখে বিঁধিয়ে দিলেই হল। তক্ষুণি কাপুরুষের মতো কুঁকড়ে যায়, নিজের ঘরে গিয়ে সেঁধোয়।

বন্দনার এ-ও সয়ে যাচ্ছিল। কারণ বাড়ির বাইরে এখন যে জগতে সে ডুবে আছে, সেটা তার শান্তির জগৎ। কিন্তু দিন দিন তার সমস্যা বাড়ছে আব শান্তি নষ্ট হচ্ছে ছেলে দুটোকে নিয়ে। বচ্চি আর দীপুকে নিয়ে। পুরনো ক্ষত শুকিয়েছে, কিন্তু এই দুশ্চিন্তায় সেই যন্ত্রণায় স্মৃতির ওপর আঁচড় পড়ছে। ঘুরে ফিরে সমস্ত রাগ গিয়ে ওই বাপের ওপর পড়ে। ছোট-মাকে এখনো দুজনে আগের মতই ভালবাসে। কিন্তু কারো ওপরেই শাসন চলে না। বাপের কারণে যে স্বাধীনতা ওরা নিজেরাই অর্জন করেছে সেটা আর যাই হোক ভালো কিছু নয়। বচ্চি রাত যখন খুশি বাড়ি ফেরে, খাওয়া-দাওয়া সময় অসময় নেই, শাসন করতে এগোলে ছোটটা চুপ করেই থাকে, কিন্তু বড়টা মুখটিপে হাসে, বলে এক শাসনের তো ফল দেখছ ছোটমা, কেন মিথ্যে আমাদের নিয়ে মাথা ঘামাও…আমার তো মায়ের ছেলে হতে পারিনি, আমারা বাপের ছেলে।

ওটুকু ছেলের মুখে ওই কথা শুনে বন্দনা চুপ মেরে যায়। বলবে কি। ওদের বাপের হতাশা যত বাড়ছে মন ততো ছোট হয়ে যাচ্ছে। শ্রদ্ধা করার মতো এই বাপের মধ্যে ওরা কিছুই দেখে না। প্রদোষ খাসনবিশ বাড়িতে এলে ওই বাপের চোখ মুখ ওরা ঘোরালো ধারালো হতে দেখে। বড়টা কারণ বুঝতে পারে নিশ্চয়ই, ও দূরে দাঁড়িয়ে বাপের মুখ দেখে আর মুখ টিপে হাসে।

এ-ছাড়া অন্য রকম বিষও লোকটার মনে ঢুকেছে। নিজে ছেলেদের জন্য কিছুই করে না, করতে পারে না। কিন্তু ছেলে দুটোকে বন্দনা অবহেলা করে কিনা লক্ষ্য করে। বেশ কিছুদিন আগের কথা, দীপুটা জ্বর নিয়ে স্কুল থেকে ফিরেছিল। বন্দনা শুনে আর গায়ের তাপ দেখে নিজে কাছের ডাক্তারখানায় গিয়ে সেখানকার ডাক্তারকে দেখিয়েছে। ওষুধের ব্যবস্থা করেছে। ডাক্তার বলে গেছে ঘরে ঘরে ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে সারতে পাঁচ সাত দিন সময় নেবে।

হু'দিন না যেতে সুবীর রায়ের বাতাসে ছোঁড়া কথা কানে এসেছে।—মেয়ের একটু কিছু হলেই মোটা ফীর চায়েল্ড্ স্পেশালিস্ট এসে হাজির হয়, আর এই বেলায় হাতুড়ে বস্তির চিকিৎসক!

শুধু বন্দনা নয়, এ-ঘরে তখন বস্তিও ছিল—কথাগুলো ওরও কানে গেছে। সুবীর রায় সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভিতরে রাগের বিষ ঢালছিল। বলছিল, সব ওষুধ পত্র বন্ধ করে দেওয়া হোক, হু'ঘণ্টার মধ্যে বড় ডাক্তার এনে সে ছেলেকে দেখাবে।

বন্দনার সমস্ত মুখ রাগে লাল। দীপুর তখন জ্বর বেশি সত্যি কথাই। কিন্তু অভিযোগটা যেমন হীন তেমনি নীচ। বন্দনা দীপুর খাট থেকে আস্তে আস্তে নেমে দাঁড়িয়েছিল। ওই লোকের সামনে গিয়ে একবার দাঁড়ানোর ইচ্ছে। কিন্তু বস্তির দিকে চোখ যেতে থমকে দাঁড়াতে হল। তার দিকে চেয়ে এই ছেলে মুখ টিপে হাসছে। চোখে চোখ পড়তে বস্তি তেমনি হাসি মুখে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে ছড়ালো। বলল, দিনকে দিন বাবার কত উন্নতি হচ্ছে তুমি তো খবরও রাখো না।...নিভা মাসি আমাদের ঠিক মতো খেতে টেতে দেয় কিনা, ইস্কুল থেকে ফিরলে টিফিন দেয় কিনা একদিন সেই খোঁজ নিয়েছিল, কাল বিকোল আবার দীপুকে জিগোস করছিল, অসুখের মধ্যে কি খাচ্ছে—ঠিক মতো হুধটুধ পাচ্ছে কিনা।

বস্তি চুপিচুপি কিছু বলেনি। আবার বাইরের অন্য কাউকে শোনাবার উদ্দেশ্য নিয়েও বলেনি কিন্তু বারান্দায় দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বড় ছেলের সব কথাই শুনেছে। ক্ষিপ্ত হয়ে ঘরে ঢুকল।—কি বললি রাসকেল কোথাকারের—তোকে আজ আমি খুন করে ফেলব!

বলেই এক হাতে থাবলা দিয়ে চুলের মুঠি ধরে ওকে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে একটা হাত তুলে বস্তি চোখের পলকে কি করল বন্দনা বুঝতেও পারল না। একটা ইলেকট্রিক শক খাবার মতো করে ওদের বাবা চুলের মুঠি ছেড়ে হু'হাত সরে দাঁড়ালো। বস্তির লালচে মুখ আরো একটু লাল শুধু, কিন্তু ঠোঁটে সেই রকমই হাসি।

আর কথাগুলো কৌতুক-ঝরা নরম-নরম। বলল, বাবা তোমার শাসনের দিন কবে চলে গেছে তুমি জানোও না—আবার এ-রকম শাসনের চেষ্টা করলে তোমার ওই অকেজো হাত দুটোও যাবে।

শুধু বাপ কেন, এই মুখ দেখে আর এই কথা শুনে বন্দনাও তাজ্জব। সুবীর রায় চুপচাপ ঘর ছেড়ে চলে গেল। তেমনি হাসি-হাসি মুখে বঙ্কিও বেরিয়ে গেল। বন্দনা নির্বাক দাঁড়িয়ে। এই বিষাক্ত পরিবেশ থেকে কবে তার মুক্তি জানে না। এই আরো হতাশ।

দিন কাটছে, মাস যাচ্ছে, বছর ঘুরছে। পড়াশোনা বঙ্কির তো চুলোয় গেছেই, এ-ভাবে চললে ছোটটার ও-পাট চুকল বলে। তবু বন্দনার বেশি সমস্যা বঙ্কিকে নিয়ে। তলায় তলায় ভয়ও। ওর আঠারো বছর বয়েস এখন। বাপের থেকেও চার আঙুল ঢ্যাঙা। মাথার চুল বেশ লাল্‌চে এখন। গায়ের অত ফর্সা রঙে এখন বাদামী প্রলেপ পড়েছে। দুই ঠোঁটের ভেতরটা টকটকে লাল। এই বয়সেই ঘন দাড়ি। না কাটলে মনে হয় ওগুলো আগুন ফুঁড়ে উঁচিয়ে আছে। নাকের নিচে সরু গোঁফের রেখা। আর অদ্ভুত ঝকঝকে দুটো চোখ। তাকালে মনে হবে চামড়া ফুঁড়ে মাংস ফুঁড়ে হাড়-পাঁজর পর্যন্ত দেখতে পায়।

গেল বছর অর্থাৎ সতেরো বছরে ওই ছেলে হায়ায় সেকেণ্ডারি পাশ করল। রেজাল্ট টায়েটোরে ফার্স্ট ডিভিশন। তা-ও কেবল অঙ্কের জোরে। কম্পালসারি আর অ্যাডিশনাল দুটোতেই লেটার পেয়েছে। সেই ছেলেকে ধমকে মিনতি করে কোন ভাবে আর পড়ানোই গেল না। সোজা কথা, বাপ থাকতে যার স্ত্রীকে রোজগার করে সৎ ছেলেদের পর্যন্ত টানতে হয় সেখানে আর বেশি পড়ার বিলাসিতায় কাজ নেই। তার এখন রোজগার করা দরকার।

—কি বললি? বন্দনা তেতেই উঠেছিল, আমি তোদের সৎ

ছেলে ভাবি ?

—তুমি ভাবো না সেটা তোমার গুণ, কিন্তু আমি না ভাবলে তোমার ওপর আরো বেশি অবিচার করা হয়।

বন্দনা আরো আগুন।—দেব ধরে এক চড়, খুব বড় কথা শিখেছিস—কেমন ? হায়ার সেকেণ্ডারির বিদ্যে নিয়ে তুই কার কি দুঃখ ঘোচাবি ?

শুনে সেই হাসি, যা দেখলে হঠাৎ চুপ করে যেতে হয়।—কি যে বল ছোটমা, এই দুঃখ ঘোচাতে হলে সেটা তুমি নিজেই পারতে, সিনেমা ছেড়ে তাহলে স্কুল মাস্টারিতে ঢুকতে না। আমার নিজের জন্যেই টাকা দরকার, দীপুর জন্যেও।

মেয়েরা কোথাও একেবারে মেয়েই। এই রাগের মুখেই বন্দনার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, স্বার্থপর কোথাকারের—বোনের জন্য তোর ভাবনা নেই, তার জন্য টাকার দরকার নেই ?

বোনকে এই ছেলে কত ভালবাসে জানে, তবু বলেছে। কিন্তু ওর জবাব শুনে বন্দনা চুপ একেবারে। ঠোঁটের মিটিমিটি হাসির ছটায় দু'চোখ যেন টুপুটুপু।—না ছোটমা, বোন কেবল তোমার টাকায় বড় হবে, কেবল তোমার টাকায় মানুষ হবে—নইলে তুমি আসার আগে বাবার টাকায় খেয়ে পরে সেই এগারো বছর বয়েস থেকেই আমি কেমন মানুষ হয়েছি দেখনি ? আমার এ জন্যেও অনেক টাকা দরকার, যাতে বোনের টাকায় আর আমাদের ভাগ বসাতে না হয়।

এর পরের মাসেই দেখা গেল বোনের জন্য বক্তি প্রমাণ সাইজের একটা দামী ঘুঙুর কিনে এনেছে। কম করে যাট-সত্তর টাকা দাম হবে। বড়রা পরলে তিন-চার প্যাঁচে ওটা এক বিঘতের কাছাকাছি চওড়া হবে, আর মিতাকে পরালে ওটা পা থেকে হাঁটু পর্যন্ত উঠে আসে। দাদা নিজের হাতে সেটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পরিয়ে দিতে মেয়ের সে কি আনন্দ ! আর বাড়িশুদ্ধ ঝমঝম ঝমঝম শব্দ। দাদা হেসে ধমকায়, লাফাচ্ছিস কেন—নাচ্।

অমনি মেয়ের নাচ শুরু হয়ে যায়। নাচে আর খুশিতে দাদার

গলা জড়িয়ে ধরে।

বন্দনা চুপচাপ দেখেছিল। ফূর্তি আর নাচের তাণ্ডব কমতে সাদা মুখ করে বলল, আনলি তো এত বড় আনতে গেলি কেন, এটা কি আমি পরব? ওর মাপের আনলেই হত···কত দাম এটার?

দামের কথা এড়িয়ে বঙ্কি জবাব দিল, ছোট আনতে যাব কেন, ও বড় হবে না···এই এক ঘুঙুরে ওর নাচের জীবন চলে যাবে।

বন্দনা আবার জিগ্যেস করল, দাম কত?

—আশি চেয়েছিল, সাতাত্তরে পেয়েছি।

—টাকা কোথায় পেলি?

—কিছু ভেব না, আমার প্রথম মাসের রোজগারের খাঁটি টাকায় কেনা। ছেলের খুশি খুশি জবাব।

—খাটি টাকা মানে?

মুখে হাসি, সোজা জবাব।—খাটি মানে আমার কালো রোজগারও হচ্ছে, এটা সাদা রোজগারের টাকায় কেনা।

জেরা করলেই তার সাদা সাপ্টা জবাব মেলে। সাদা কালো দুই রোজগারই শুনল। সন্ধ্যায় এক বাড়ির চার ক্লাসের চার ছেলেকে অঙ্ক করিয়ে মাসে একশো দশ টাকা পায়, কালো টাকা দুপুরের আর বিকেলের সিনেমা শোয়ের টিকিট ব্ল্যাক করে পায়।

পরেরটা শুনে বন্দনা আঁতকে উঠেছিল, এই সব করে তুই টাকা রোজগার করবি?

—ক্ষেপেছ! এ তো শুধু চোখ-খোলা রেখে বাজার দেখার সময় নিচ্ছি বলে। এর মধ্যে একজন জব্বর সাকরেদ পেয়েও গেছি, সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করা দু-মাসের মধ্যেই ছেড়ে দেব। তবে বোনকে এটা-সেটা কিনে দিতে ইচ্ছে করে বলেই সাদা রোজগার মানে টিউশনিটা এক্ষুনি ছাড়ছি না।

এ ছেলেকে নিয়ে কি করবে বন্দনা জানে না। বাপকে বলে লাভ নেই, বাপ এখন উল্টে ছেলের ভয়ে কাঁপে। সে বাড়ি থাকলে বাতাসে কথা ছুঁড়তেও ভয় পায়। একদিন কানে যেতে বঙ্কি সোজা

তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।—এ সব কথা তুমি কাকে শোনাচ্ছ, ছোটমাকে ?

—তোর তাতে কি দরকার? ঘাবড়ালেও ঝাঁঝ না দেখালে বাপের মানহানি।

—কি দরকার তোমাকে যেন বুঝতে না হয়···ছোটমাকে এতটুকু অপমান করলে তোমার অদৃষ্ট খুব মন্দ জেনে রেখো।

অনায়াসে এমন কথা বলে তাই বন্দনার এই ছেলের ওপরেই রাগ হয়। কিন্তু আসলে এটা রাগ নয়, অজানা ভয়। ছেলেটা কোন্ পথে যাচ্ছে ? ওর এত সাহসই বা হয় কি করে!

··মেয়েটা অত বড় ঘুঙুর পরে ঝম-ঝম শব্দে বাড়ি মাত করে বেড়ায়। মিষ্টি লাগে। সেদিন দু'ভাইয়ের সামনে মেয়ে বায়না ধরল, মাকে ওই ঘুঙুর পরতে হবে। বন্দনা হাসি মুখেই পরল। তার পায়েরই মাপের জিনিস এটা। মেয়ের হুকুম।—এবার হাঁটো।

মা হাঁটল।

ঘুঙুরের এত অল্প শব্দ মেয়ের পছন্দ নয়। হুকুম করল, এবার নাচো।

বহ্নি সাধারণত শব্দ করে হাসে না। কিন্তু শুনে একেবারে অট্টহাসি। বন্দনা দেখল, সেই হাসি একেবারে যেন শিশুর হাসি। বোনকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বলে উঠল, এবারে তুই ভাবালি, তোর সঙ্গে আমাদেরও বসে মায়ের নাচ দেখতে হবে!

বন্দনার বুকের তলায় মোচড় পড়ছে। প্রথম মাসের একশো দশ টাকা মাইনে পেয়ে তার থেকে যে অনয়াসে সাতাত্তর টাকা দিয়ে বোনের জন্য ঘুঙুর কিনতে পারে তার টান বা হাসির মধ্যে এতটুকু খাদ নেই। মেয়েটা ওদের চোখের মণি। কিন্তু গত রাতেই বন্দনা ঠিক করেছে, আর একটা দুটো বছর গেলেই মেয়েকে বাড়ির কাছের স্কুল ছাড়িয়ে শুধু নিজের স্কুলে ভরতি করবে না—ওকে স্কুলের হস্টেলে দিয়ে দেবে। বাড়ির হাওয়ার মধ্যে বড় হলে এই মেয়েও একদিন শাসনের বাইরে চলে যাবে, এই রক্তের ধারাকে বিশ্বাস নেই।

এ-রকম ভাবার কারণ ঘটেছে, ঘটছে। বঙ্কির হাতে এখন বেশ টাকা আসে টের পায়। বয়েস মাত্র আঠারো কিন্তু চাল চলন আটাশের মত। নিজের পোশাক-আসাকের জলুস বাড়ছে, ভাইয়েরও। বাপকে এক এক সময় থোকে কিছু করে টাকা দেয়। বলে, আমার তোমার আর দীপুর খরচ এর থেকে চালাবে—ছোটমা আর মিতার খরচ শুধু ছোটমা'র।

এই থেকেই ত্ব'মাসের মধ্যে আচমকা ত্বটো আঘাত। পরেরটা শুধু আঘাত নয়—বজ্রাঘাত।

....কলকাতায় তখন সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে। খুনোখুনির রাজনীতিতে মাটি লাল। পার্টিতে পার্টিতে বোমাবাজী মারামারি কাটাকাটি আর আগুনের তাণ্ডব লেগেই আছে। এরই মধ্যে নক্সালরা তৎপর। আবার রাতারাতি নক্সাল নামের আড়ালে সমাজের কিছু ভয়ংকর মানুষও খুনোখুনির তুঙ্গোৎসবে মেতে উঠেছে। সবকিছুর আগুন দাম, শস্তা কেবল মানুষের জীবন। যাকে খুশি যেখানে খুশি মারতে চাইলেই মারা যাচ্ছে।

বঙ্কির জন্য বন্দনার বুকের তলায় ত্রাস। আজকাল সকালে বেরোয় রাতের আগে বাড়ি ফেরে না। ত্বপুরে যখন খেতে আসে বন্দন তখন স্কুলে। নিভা বলে রোজ দিন খেতেও আসে না। রাতেও ওর কাছে কারা আসে জানে না। গলির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অথবা বড় রাস্তায় গিয়ে কথা হয়।

সেই সন্ধ্যায় কয়েকটা ছেলে চলে যাবার পরেই ও এসে বাপের হাতে পাঁচশো টাকা গুণে দিল, তার আর ত্ব'ভাইয়ের খরচ।

ঘর ছেড়ে বেরুতেই বন্দনা ডাকল, এ ঘরে আয়। মেয়েকে নিভার কাছে পাঠিয়ে দিল। দীপু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, ওর এখন ষোল চলছে, ক্লাস ইলেভেনে উঠেছে—বন্দনা ওকে কিছু বলতে গিয়েও বলল না।

বঙ্কির চোখে মুখে এতটুকু উদ্বেগ নেই, জিগ্যেস করল, কি হল ?

কঠিন গলায় বন্দনা বলল, কি হল না—কি হচ্ছে আমি জানতে

চাই। সমস্ত দিন তুই কোথায় থাকিস—কি করিস—কাদের সঙ্গে মিশিস—বাড়িতে তোর কাছে কারা আসে—এত টাকা পাস কোথা থেকে ?

জবাবে ঠোঁটে আর চোখে হাসির ঝিলিক।—বা-ব্বা! না জেনেই এই, জানলে কি করবে ?

—বঙ্কি! বন্দনার থমথমে মুখ, গলার স্বর কঠিন।—আমি জানতে চাই তুই কাদের সঙ্গে মিশিস? টাকা আসে কোত্থেকে ?

—আমি কারো সঙ্গে মিশি না, কারো দলে নেই। ডাইনের না বাঁয়ের না নক্সালদের না, ওদের নাম নিয়ে যারা হামলাবাজী করছে —তাদেরও কারো দলেই না। ওদের দরকারে ওরা আসে আমার কাছে। আমি ওদের সকলের কাছ থেকেই টাকা রোজগার করি— এটুকুই সম্পর্ক।

—কেন ওরা তোকে টাকা দেয়, ওদের জন্য কি করিস তুই ?

—ওদের জন্য নয়, আমি আমার ব্যবসা করি। এটা আমার ব্যবসা।

অসহ্য রাগে বন্দনা প্রচণ্ড একটা চড় তুলল। বঙ্কি চোখের পলকে টুক করে বসে পড়ল। যেন মজার খেলা। হাত নামাতে আবার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। হাসছে।

মুখ লাল, বন্দনা অপলক চেয়ে রইল খানিক—তুই না খুব সাহসের বড়াই করিস—সাহস থাকে তো বল কি করিস—কিসের ব্যবসা ?

বেশ ধীরেসুস্থেই জবাবটা দিল। বলল, আমি বোমা বানাই। বোমার ব্যবসা। নানা রকমের, নানা দামের। যার দরকার সে নিয়ে যায়....অবশ্য এই লেনদেনের মধ্যে কিছু টেকনিক আছে, যার জন্য সকলেই আমাকে নিজের লোক ভাবে।....আর শুনবে ?

বন্দনা পাথর কয়েক মুহূর্ত।—তুই এই করিস ?

হাসছে।—আমি না করলে আর কেউ করবে—বাজার থেকে বোমা উঠে যাবে না।

এবারে বন্দনার গলা দিয়ে আগুন ঝরল।— আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা, আর আমি তোর মুখ দেখতে চাই না! আমার মেয়েকে তুই ছুঁবি না! আমি তোকে পুলিশে দেব! হয় তুই থাকবি এ বাড়িতে না হয় আমি থাকব!

বঙ্কির ঠোঁটের হাসি গেল। বাদামী মুখে রক্ত উঠছে। চেয়ে আছে।—না, তুমি কোথাও যাবে না, তুমি থাকবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অসহ্য রাগে বন্দনাও দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। তার চড়া গলা শুনে ওর বাবাও বারান্দায়। ছেলেকে থামতে বলার সাহস নেই। ওর সব কথা কানে যায়নি, কিন্তু বন্দনার কথা শুনেছে, বঙ্কি তার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। বন্দনা তখনো রাগে কাঁপছে।

রাতে আর এলো না। পরদিন সকালেও না। বন্দনার স্কুল কামাই হল। দুপুর, বিকেল গড়াল। পায়ে ঘুঙুর পরে মিতা ঝম-ঝম করে এসে এসে বার বার দাদার খোঁজ করে গেল। দাদার সামনে ওর নাচ সব থেকে ভাল জমে। সন্ধ্যা পেরুল, রাতটাও কাটল।

পরদিন বন্দনা স্কুলে না গিয়ে পারল না। ক্লাসের মেয়েদের সাপ্তাহিক পরীক্ষা সেদিন, বন্দনার কাছে প্রশ্নপত্র। বিকেলে ফিরে নিভার মুখে শুনল, বঙ্কি দুপুরে এসে তার স্যুটকেস আর জামা-প্যাণ্ট নিয়ে চলে গেছে। তখন দীপু মিতাও স্কুলে। ওদের বাবাও বাড়ি ছিল না। নিভা তাকে সাহস করে বলেছিল, দিদিমণি দু'দিন ধরে খুব কষ্ট পাচ্ছে, খাওয়া দাওয়াও করছে না। উত্তরে বঙ্কি বলেছে ছোটমাকে বোলো আমার মরা মুখ দেখতে না চায় তো কষ্ট যেন না করে।

আরো দু'দিন বাদে বন্দনা দীপুকে জিজ্ঞেস করেছে, দাদা কোথায় থাকে জানে কি না। দীপু মাথা নেড়েছে, জানে না। আর বলেছে, দাদা কথা দিয়েছিল ওকে একদিন তার বোমা বানানো দেখাবে। দাদা কথা দিলে কথা রাখে, শীগগিরই ওকে একদিন নিয়ে যাবে নিশ্চয়।

বন্দনা চমকে উঠল। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারল না, তুই যাবি না। তাছাড়া বলে লাভও নেই। দাদার জন্য ওর দারুণ মন খারাপ। উন্মুখ হয়ে আছে কখন দাদার সঙ্গে দেখা হবে। ওদিকে পায়ে ঘুঙুর পরলেই মিতার দাদার কথা মনে পড়ে। দাদা-দাদা করে কাঁদে। ওর এই ছ'বছরের মধ্যে একদিন দাদাকে দেখেনি এমন হয়নি।

ও-ঘর থেকে বাতাসে কথা ছোড়া শুরু হয়েছে আবার।....কার বাড়ি থেকে কে কাকে তাড়ায়! একটা গেছে এখন আর একটা গেলেই বোধ হয় শান্তি।

বন্দনা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। যে নেই এখন, ওই মানুষ ইদানীং তাকেই যমের মত ভয় করত। টাকার সম্পর্ক না থাকলে বস্থির চলে যাওয়াটা হয়তো তারই সব থেকে শান্তির কারণ হত। কিন্তু তা বলে কথা শোনাতে ছাড়বে কেন।

মাসের শেষে দীপু বাবার হাতে টাকা এনে দিয়েছে। দাদা স্কুলে এসে ওর হাতে টাকা দিয়েছে। ওই বাবা তখন বস্থি কেমন আছে না আছে একটি কথাও জিগ্যেস করেনি। টাকা পেয়েই নিশ্চিন্ত।

দীপু এ-ঘরে এসে চুপি চুপি জানিয়েছে, তোমার কথা বলে আমি অনেকবার দাদাকে আসতে বলেছিলাম ছোটমা। দাদা হেসে হেসে বললে, ছোটমাকে বলিস, আমার পকেটে সর্বদা একটা রিভলবার থাকে—বেশি দেখতে চাইলে একদিন গিয়ে মরামুখ দেখিয়ে দেব।

বন্দনা ইদানীং লক্ষ্য করছে রবিবার দুপুরে বা ছুটির দিনে দীপু খেয়ে দেয়ে চুপচাপ বেরিয়ে যায়। ফেরে সন্ধ্যার পরে। কিন্তু বন্দনার আর জেরা করার রুচি নেই। একজনই খুব আক্কেল দিয়েছে।

পরের মাসের শেষের সেই দিনটা। রবিবার। দীপু বেরিয়ে গেছে। কিন্তু সন্ধ্যায় ফিরল না। রাতেও না। পরদিন রাগ আর বিষম দুশ্চিন্তা নিয়ে বন্দনা স্কুলে এসেছে। প্রথম ঘন্টার ক্লাস সবে শুরু হয়েছে। অফিসের বেয়ারা খবর দিয়ে গেল তার জরুরি টেলিফোন।

বাড়ির সামনের দোকান থেকে দীপুর সম্পর্কে তার বাবা কোন খারাপ খবর দেবে কিনা সেই দুশ্চিন্তা। ক্লাস ফেলে তাড়াতাড়ি ফোন ধরতে এলো। টিচাররা সব যে যার ক্লাসে, ঘরে কেউ নেই।

সাড়া দিয়েই কাঠ। ওধারে ঠাণ্ডা গলা।

—আমি বঙ্কি।···ঘরে আর কে আছে?

—কেউ না, কেন—কি হয়েছে?

—কাগজে খবর পড়নি কাল সন্ধ্যার ঠিক আগে চারজন নক্সালকে পুলিশ গুলি করে মেরেছে?

বন্দনা ও-সব খবর উল্টেই যায়। পড়তে গেলে গা শিউরে ওঠে। কিন্তু এই মুহূর্তে অব্যক্ত ত্রাস। সাহস করে কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারছে না।

আবার বঙ্কির গলা।—তাদের কেউ নক্সাল নয়। তিনজন বাজে দাগী লোক, আর একজন দীপু—

বন্দনার হাত থেকে টেলিফোন খসে পড়ছিল, আর্তনাদ করে উঠল, কি বলছিস তুই বঙ্কি।

—চেঁচিও না। আমি দশ মিনিটের জন্য একটু কাজে বেরিয়েছিলাম। দীপুকে চলে যেতে বলেছিলাম। কিন্তু ও কেন আমার জন্য বসে ছিল জানি না। রেড হয়েছে শুনেই দীপু ভয় পেয়ে পালাচ্ছিল, পুলিশ তাকে তাড়া করে রাস্তার ওপর গুলি করেছে—দূরে দাঁড়িয়ে আমি নিজের চোখে দেখেছি।···তোমাদের স্কুল কমিটির প্রদোষ খাসনবিশের ছোট ভাই প্রবোধ খাসনবিশের হুকুমে তার এলাকার ও-সি এই রেড করেছিল। প্রদোষ খাসনবিশকে জানিয়ে দিতে পারো তার ভাইকে আমি ভুলব না—সে-ই কাগজে দীপুকে নক্সাল বলে চালিয়েছে।

ফোন কেটে দিল।

বন্দনা থরথর করে কাঁপছে। বাইরে এসে বেয়ারাকে বলল, প্রিন্সিপ্যালকে বোলো আমার বাড়িতে খুব বিপদ, আমি চলে গেলাম।

প্রথমে ভাবল বাড়ি যাবে। না, বাড়ি নয়, দীপু কোন্ হাসপাতালে বা কোথায় তা-ও জানে না। ট্যাক্সি নিয়ে সোজা খাসনবিশদের বাড়িতে। প্রবোধ খাসনবিশকে নিচেই পেল। বন্দনাকে ঢুকতে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। গম্ভীর। যার সঙ্গে কথা বলছিল সে-ও ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিশ কর্মচারী। ইশারায় তাকে বাইরে যেতে বলল।

—আপনারা এ কি করেছেন? বন্দনা কাঁপছে, হাঁপাচ্ছে।—নক্সাল নাম দিয়ে ষোল বছরের একটা নিষ্পাপ স্কুলের ছেলেকে মারলেন?

—বসুন।

বন্দনা দাঁড়াতে পারছিল না। বসল।

প্রবোধ খাসনবিশ ফোনের নম্বর ডায়েল করল না, একটি 'নব' টিপল শুধু। দু-চার সেকেণ্ড বাদে বলল, দাদা, নিচে এসো, যাঁকে ফোনে ধরতে চেষ্টা করছ তিনি এখানে।

আধ মিনিটের মধ্যেই প্রদোষ খাসনবিশ ঘরে ঢুকল। বিষণ্ণ মুখে বন্দনার পাশের চেয়ারে বসল।

প্রবোধ খাসবিশ বলল, ইনভেস্টিগেশনে আজ সাড়ে ন'টায় জানা গেছে বহ্নি রায় আর দীপেন রায় সুবীর রায়ের প্রথম পক্ষের ছেলে···· পুলিশ বহ্নি রায়কে খুঁজছিল, দীপেনকে বহ্নি ভেবে গুলি করেছে—

বন্দনা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, বহ্নিও নক্সাল নয়!

—হতে পারে, কিন্তু সব রকমের অ্যান্টি-সোশাল এলিমেন্টের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের খবর পুলিশের খাতায় আছে····। আপনি ওদের কত ভালবাসতেন আমি দাদার কাছে শুনেছি, আই অ্যাম রিয়েলি সরি ফর দি ইয়ংগার বয়····কিন্তু সে ওখানে গেছল কেন···· পুলিশ রেড করে সেখানে কতগুলো মারাত্মক বোমাও পেয়েছে।

বন্দনা চোখে অন্ধকার দেখছে। জবাব না দিয়ে টেবিলে দুই কনুই রেখে দুই হাতের ওপর মাথা রাখল।

একটু চুপ করে থেকে প্রবোধ খাসনবিশ বলল, বিশ্বাস করুন,

আমি সত্যি দুঃখিত, শুধু আপনার জন্যেই আমি এটুকু বলতে পারি যদি সম্ভব হয় বঙ্কিকে আপনি সকলের চোখে ধুলো দিয়েও দূরে কোথাও পাঠাতে চেষ্টা করুন।

বন্দনা ওইভাবেই মাথা রেখে জবাব দিল, আমার সঙ্গে তার দেখা হয়নি—হবে না।...আপনিও দয়া করে একটু সাবধানে থাকবেন, ও জানে আপনার ও. সি. ওর ভাইকে গুলি করে মেরেছে....আমি কিছু ভাবতে পারছি না।

প্রবোধ খাসনবিশ স্থির চোখে চেয়ে রইল একটু।—বুঝলাম ধন্যবাদ।...পুলিশকে সর্বদাই সাবধানে থাকতে হয়।....আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি সোজা স্কুল থেকে আসছেন, দীপেনের খবর সেখানেই ফোনে বা কোন ভাবে পেয়েছেন বোধহয় ?

বন্দনা জবাব দিল না। মাথাও তুলল না।

দিন বসে থাকে না। অতি দুঃখের দিনও সবতেই থাকে। দিনে দিনে মাসে মাসে আবার একটা বছর ঘুরে গেল।

...মিতা ছয় পেরিয়ে সাতে পড়ল। আস্তে আস্তে দুই দাদার কথাই ভুলেছে। তাকে নিয়ে বন্দনা আবার স্কুলের হস্টেলে চলে যাবে কিনা ভাবছে। কারণ, সুবীর রায়ের অবুঝ অসহিষ্ণুতা বেড়েই চলেছে। এখনো কাছে সামনাসামনি এসে বলে না কিছু। কিন্তু যা বলে বন্দনার কানে আসে।

দুটো ছেলেই কার জন্যে এভাবে গেল পাকে-প্রকারে প্রায়ই ওকে শুনিয়ে সে-কথা বলে। আরো বলে, ছেলেরা গোলাম হয়েই ছিল, সত্যিকারের ভালবাসা পেলে একেবারে কেনা গোলাম হয়ে থাকত। নিভা বা ভোলা খাবার নিয়ে গেলে রাগ করে অনেক সময় জানালা দিয়ে ফেলে দেয়। চিৎকার করে বলে আমার জন্য কারো দরদ দেখানোর দরকার নেই। আমার জন্য কার কত দরদ জানা আছে।

বাড়িতে এই একত্রিশ বছরের জীবন এক-এক সময় দুর্বহ মনে

হয় বন্দনার। মেয়ে নিয়ে হস্টেলে চলে গেলে সমস্যা নিভাকে নিয়ে। সে কোথায় যাবে কোথায় থাকবে। একদিন বলতে কেঁদে কেটে ভাসিয়ে দিয়েছিল। ভোলা ছিল সামনে। সে-ই বোধ হয় তার বাবুকে মেয়ে নিয়ে বউদির হস্টেলে চলে যাবার কথা বলে ছিল। ক'দিন চুপ একেবারে। তারপর সত্যিই বেশ একটা শক্ত অসুখ বাধিয়ে বসল মানুষটা। খারাপ ধরনের জ্বর, তিন সপ্তাহের আগে অত জ্বর নামেনি। বন্দনা ডাক্তার দেখিয়েছে চিকিৎসার কোথাও এতটুকু ত্রুটি করেনি, চব্বিশ ঘণ্টা থাকার জন্য শেষে খাসনবিশের মারফৎ হাসপাতাল থেকে একটা লোক রেখেছে। এখন এই মানুষেরই সে কি অসহায় মূর্তি। কাছে গেলে দুটো চোখ দিয়েই যেন তাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চেষ্টা করে। একদিন বলেই ফেলেছিল আমি সেরে উঠলে মেয়েকে নিয়ে তুমি হস্টেলে চলে যাবে?

হাঁ, এই লোকের জন্যেও বন্দনার কান্নাই পেয়েছিল সেদিন। বলেছে, তুমি যেতে বাধ্য না করলে যাব না।

সেরে ওঠার পর আর এক মাসের মধ্যেও আর ও কথা হয়নি।

সেদিন। বিকেল তখন সাড়ে পাঁচটা। শীতকালের আলো এরই মধ্যে মুছে যাচ্ছে। নিভা মেয়ে নিয়ে কাছের পার্কে গেছে। একেবারে সন্ধে না হলে মেয়ে পার্ক ছেড়ে নড়তে চায় না। ভোলা বাজারে। যে-কোনো সময় ফিরতে পারে বলে গলির মুখের দরজাটা ভেজানো।

বন্দনা চুপচাপ নিজের খাটের ওপর বসে ছিল। আচমকা ছুটে যে ঘরে ঢুকল তাকে দেখেই বন্দনার বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল।

বঙ্কি। উত্তেজনায় মুখ লাল।

—ছোটমা! আমাকে বাঁচাতে পারো? পুলিশ আমাকে ফলো করছিল, আমি চলন্ত ট্যাক্সি থেকে লাফিয়ে পড়ে এই গলিতে ঢুকেছি —কিন্তু পুলিশ দূর থেকে দেখেছে। সামনের দুটো বাড়ি খোঁজ

করে তারা দশ মিনিটের মধ্যে এখানে ঢুকল বলে। ছোটমা, আমাকে পেলে তারা রাস্তায় টেনে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মারবে! ছোটমা, কিছু করতে পারো? পারো কিছু করতে? .

বন্দনা পাগলের মত ঘরের চারদিকে তাকালো কি করবে? কি করবে- কি করবে--কি করবে? দলবল নিয়ে পুলিশ বাড়িতে ঢুকে পড়লে বঙ্কিকে আড়াল করবে কি করে? কোথায়? ঈশ্বর! আমি কি করব এখন?

কার ইঙ্গিত জানে না। খাটের পাশের দেয়ালে শৌখিন ওয়ালম্যাট্রেসটা চোখে পড়ল। ওটার পিছনে বন্ধ কম চট করে চোখে পড়ার নয়। খাটে উঠলেই ওটার নাগাল পাওয়া যায়। মুহূর্তে ম্যাট্রেস সরিয়ে বালিশ দুটো আর লেপটা খাটে ফেলল। আর কিছু নামানোর দরকার নেই।

চোখের পলকে বঙ্কি ওটার মধ্যে ঢুকে গেল বন্দনা ওয়াল-ম্যাটেসটা টেনে দিল। বালিশ দুটো আর লেপ জায়গায় ফেলল। এবারে কি করবে? বুকের তলার ধপধপ শব্দ নিজের কানেই শুনছে। কিন্তু শব্দ হলে চলবে না। স্থির থাকতে হবে। খুব ঠাণ্ডা থাকতে হবে।

টেবিলের সামনে আসতেই মিতার ঘুঙুর জোড়া চোখে পড়ল। চিন্তা করার সময় নেই বন্দনার। এক মুহূর্ত থমকালো তবু। পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে দেওয়ালের তাক থেকে সুরেন বায় পুরনো একটা স্ক্রিপ্ট-এর ফাইল এনে ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখল। শাড়িটা গলার দিকে ঠেলে বুকের ওপর দিয়ে টেনে কোমরে জড়িয়ে নিল। নিচে ঝুঁকে শাড়িটা টেনে বেশ খানিকটা ওপরে তুলে দিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘুঙুর জোড়া ধপধপে দু'পায়ের প্রায় আট আঙুল জুড়ল। শাড়ি তারও চার আঙুল ওপরে তোলা। এবারে বন্দনা ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে। ধীর, স্থির, উৎকর্ণ। শাড়িটা ও-ভাবে বুকের ওপর দিয়ে টানার ফলে ব্লাউসের নিচে দু'দিকের সুডৌল স্তনভার বিচ্ছিরি রকম উঁচিয়ে আছে।...থাক। বন্দনা উৎকর্ণ।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। খোলা আছে তবু কড়া নাড়ল মানে তারা এসে গেছে। বন্দনা আয়নার সামনে দু'হাতের ঢেউ তুলে নাচ শুরু করল। স্কুলের নাচ কবে ভুলেছে ঠিক নেই তাতে কি। তাল বেঁধে আছে। পায়ের ঘুঙুর তার কাজ করছে। একটু থামতেই বারান্দায় অনেক জোড়া পায়ের শব্দ। মেঝেতে পায়ের আঘাতে আঘাতে ঘুঙুর তালে তালে ঝমঝম করে বাতাসে ঘা দিচ্ছে।

দরজা দুটো চার আঙুল ফাঁক ছিল। আস্তে আস্তে আধ হাতেরও বেশি ফাঁক হল। কিন্তু বন্দনার নাচের তন্ময়তা বাড়ছেই, আয়না ছাড়া আর কোন দিকে চোখ নেই।

দরজা আরো একটু খুলতে বিষম চমকে বন্দনা তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, কে? কে ওখানে?

ঝমঝম শব্দ তুলে দরজার কাছে এগিয়ে এসে সামনে কোমরে রিভলবার গোঁজা পুলিশ অফিসার দেখেও সরোষে বলে উঠল, কে আপনারা? খবর না দিয়ে একজন ভদ্রমহিলার শোবার ঘরের দরজা ফাঁক করে কি দেখছেন?

কিন্তু যা দেখছে অফিসারের দু'চোখ সেদিক থেকে ফেরানো শক্ত। এবারে সে ঘরের ভিতরেই পা দিয়ে দাঁড়ালো। হাত নেড়ে অন্যদের বাইরে দাঁড়াতে ইশারা করল।

--আমরা পুলিশ দেখতেই তো পাচ্ছেন।

পু-লিশ। কিন্তু পুলিশই বা জানান না দিয়ে কোন শোবার ঘরে ঢুকবে কেন?

জবাব না দিয়ে এবারে অফিসারটি ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। খাটের নিচটাও একবার দেখল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে স্ক্রিপ্ট-এর ফাইলটা খুলল।

কিন্তু বন্দনার তাকে নিজের দিকে ফেরানোর তাড়না, একটু আগে ওই দুই চোখে লোভ দেখেছে। এগিয়ে গিয়ে স্ক্রিপ্ট্টা এক ঝটকায় টেনে নিয়ে ড্রেসিং টেবিলের ওপর আছড়ে ফেলল। সমস্ত মুখ লাল।—আপনি কোন্ অধিকারে আমার শোবার ঘরে এ-ভাবে

ঢুকেছেন? কেন এ-ভাবে হামলা করতে এসেছেন? কি চান? কি চান?

অফিসার জবাব দিতে সময় নিল একটু। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল একপ্রস্থ। শিকার ধরতে এসে এমন লোভনীয় দৃশ্য দেখবে কল্পনার বাইরে।—আপনি অভিনেত্রী?

—যা জিগ্যেস করবার বাইরে এসে বলুন। পুলিশের লোকের ভদ্রতার জ্ঞান থাকতে নেই?

এবারে দরজার দিকে এগোতে অফিসার বলল, আপনি আসুন

দরজার বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বন্দনাও এলো। পায়ের ঘুঙুরের শব্দ ঠেকানো গেল না। বাইরে সশস্ত্র আটজন পুলিশ। তাদের চারজন ওপাশের ঘর রান্নাঘর বাথরুম সব সাচ করে ফিরেছে। মুখে কিছু না বলে মাথা নাড়ল শুধু। এদিকের ঘর থেকেও দুজন বেরিয়ে এলো।

বন্দনাই প্রথম কথা বলল, ক্রুদ্ধ স্বরে জিগ্যেস করল, আপনারা কি দেখছেন···কি খুঁজছেন?

জবাবে অফিসারের অবাধ্য চোখ আবার তার বুকে নেমে এসে মুখে উঠল। তারপর একটা ছবি বার করে সামনে ধরল।—একে চেনেন?

বন্দনা দেখল। বিমূঢ় যেন হঠাৎ।—হ্যাঁ চিনি

– আপনার কে হয়?

—আমার স্বামীর আগের পক্ষের ছেলে।

—আমরাও এনকোয়ারি করে জানলাম সে এ বাড়ির ছেলে। সে কোথায়?

বন্দনার হঠাৎই যেন খেয়াল হল, সব ক'টা লোকই তার পায়ের দিয়ে বুকের দিকে দেখছে। এতক্ষণে সচকিত হয়ে শাড়ির আঁচলটা খুলে নিয়ে গায়ে জড়াল। এতেও প্রায় সম্মোহিত দৃষ্টি সকলের। তারপর জবাব দিল, এ-বাড়ির ছেলে, কিন্তু এ-বাড়ির ছায়া সে দেড় বছরের মধ্যেও মাড়ায়নি।

—কিন্তু আমরা তাকে এই গলিতে ঢুকতে দেখেছি!

—তাহলে গলির ওই ভাঙা দেয়াল দিয়ে চলে গেছে।...আমার স্বামীর আগের পক্ষের ছেলে, এখানে আসার থেকে সে আপনাদের বেশি নিরাপদ ভাবত।

অফিসার আরো দুই একবার লুব্ধ চোখে তাকিয়ে দলবল নিয়ে চলে গেল।

বন্দনা বারান্দায় দাঁড়িয়েই দেখল, সকলে ডানদিকে অর্থাৎ গলির ভাঙা দেয়ালের দিকে চলল। তাদের হাতে জোবালো টর্চ। দড়ি ছাড়া ওই ভাঙা দেয়াল টপকানো সম্ভব নয়। বন্দনা জানে না আবার ওরা এখানেই আসবে কি না।

এলো না। তবু বন্দনা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। মনে হল এক যুগ। ওরা চলে গেল টের পেল।

শোবার ঘরে ফিরে এলো। বঙ্কি বক্স রুম থেকে খাটে বসে ঘামছে। বন্দনা ঘরে ঢুকতে শাড়ি তোলা পায়ে ঘুঙুর জোড়ার দিকে তাকালো একবার। তারপর বলল, দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল ছোটমা, আর ওই খুপরিতে পারছিলাম না।

বন্দনা নির্বাক। ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে। বঙ্কি উঠে তার পা ছুঁলো। বলল, ছোটমা তোমাকে আমি কোন দিন ভুলব না, একদিন না একদিন ঠিক তোমার কাছে ফিরব।

তারও অনেকক্ষণ বাদে বন্দনার খেয়াল হল ঘরে আর কেউ নেই। সে একা।

পরদিন। স্কুল কামাই হয়েই গেল। উঠি উঠি করেও বন্দনা উঠতে পারল না। অবসাদে নড়েচড়ে বসতেও ইচ্ছে করছে না। সুবীর রায় সকালে বেরিয়েছে। কখন ফিরবে ঠিক নেই। গত কালের ঘটনা বন্দনা তাকে কিছুই বলেনি। না বলার কারণ ভয়। তার মনে হয়েছে, পুলিশের ডাকে ওই লোককে থানায় যেতে হতে পারে। জেরা করতে পারে। অত্যাচারের ভয় দেখাতে পারে। গত সন্ধ্যার ঘটনা জানা থাকলে এই লোক ভয়ে গল গল করে সব

বলে দেবে।

মেয়েকে নিভা সামনের স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসেছে। বন্দনা তখনো অবসন্নের মতো বসে।

ভোলা খোলা দরজা দিয়ে মুখ বাড়ালো, তারপর ঘরে ঢুকল। জানান দিল, প্যান্ট কোট টুপী পরা একজন পুলিশের সাহেব এসেছেন, এই কার্ড আপনাকে দিতে বললেন-

বন্দনার বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করে উঠৎ। তাড়াতাড়ি উঠে এসে ভোলার হাত থেকে কার্ডটা নিল। ছাপার হরফে লেখা, প্রবোধ খাসনবিশ ; ডেপুটি কমিশনার, ইত্যাদি। বন্দনা কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ভোলাকে জিগোস করল, একা এসেছেন না-সঙ্গে পুলিশের আরো লোক আছে।

ভোলা জবাব দিল, একটা জিপগাড়ি থেকে নেমে তাকে এ-বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে, সেই জিপে ড্রাইভার ছাড়া আরো তু'জন লোক আছে।

বসতে দিয়েছ ?

হাঁ, বাবুর ঘরে বসিয়েছি। বাইরের লোকের এখনো সেখানেই বসার ব্যবস্থা।

—ঠিক আছে। বলোগে আসছি।

ভোলা চলে গেল। বন্দনা আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো। মাথায় একবার চিরুনি বুলিয়ে নিল। পরণের শাড়িটাই আর একটু ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিল। এই লোকের আসার উদ্দেশ্য জানে না··· কিন্তু বিনা কারণে নিশ্চয় আসেনি। বন্দনা যতটা সম্ভব স্থির শান্ত পায় বেরিয়ে এলো।

তাকে দেখা মাত্র স্বভাব সুলভ সৌজন্যে প্রবোধ খাসনবিশ সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তার পুলিশের টুপী সামনের টেবিলের ওপর। তু'হাত জুড়ে নমস্কার জানালো।—অসময়ে বিরক্ত করলাম না তো ?

প্রতি নমস্কার করে বন্দনাও মুখে সহজ হাসি ফুটিয়ে বলল, না, বসুন—

প্রবোধ খাসনবিশ বসল। বন্দনাও।

ভদ্রলোকের দু'চোখ হাসিতে চিকচিক করছে। চাউনি তার মুখের ওপর। কিন্তু এ চাউনি গত সন্ধ্যার সেই পুলিশ অফিসারের মতো নয়। জিগ্যেস করল, আজ স্কুল ছুটি নাকি, আপনাকে বাড়িতে পাব আশা করিনি।

বন্দনার ভিতরটা এখন অনেক স্থির এই লোক বরাবরই খুব ভদ্র। জবাব দিল, আজ স্কুলে যাইনি....। আপনি হঠাৎ?

—খুব হঠাৎ নয়। দু'চোখে এখনো হাসি চিকচিক করছে।— আচ্ছা আপনি কি দাদার স্কুল ছেড়ে আবার সিনেমা লাইনেই ভিড়ে যাচ্ছেন নাকি?... ফিল্ম স্ক্রপ্ট সামনে রেখে নাচের তালিম দিচ্ছেন শুনলাম....শকুড হবেন ভেবে আমি অবশ্য এখনো কিছুই বলিনি বা জগ্যেস করিনি....।

জবাব দেবার আগে বন্দনা ঠাণ্ডা দু'চোখ তুলে তার দিকে চেয়ে রইল খানিক, তারপর বলল, আগে দয়া করে আমার একটা কথার জবাব দেবেন?

—নিশ্চয়। বলুন...

—আপনার এই ভিজিটটা অফিসিয়াল না আন-অফিসিয়াল?

হাসছে।—ইচ্ছে করলে অফিসিয়াল করে নিতে পারতুম। কিন্তু তা করিনি, আপনি সম্পুর্ণ আনঅফিসিয়াল ধরে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন--কাল আপনি আমার থানার যে অফিসারকে গাধা বানিয়ে চোখে ধুলো দিয়েছেন আমি তার জের টানতে আসিনি আমি নিছক কৌতূহলের বশে এসেছি, কারণ অতগুলো আর্মড্ পুলিশসহ আপনি যে-লোকটাকে ঠকাতে পেরেছেন সে কাঁচা লোক নয়। মানুষ যেমনই হোক তার কাজে সুনাম আছে অথচ।

বাকিটুকু শেষ না করে মুখের দিকে চেয়ে থাকতে লাগল এই হাসির মধ্যে বন্দনা পুলিশি চাতুরী কিছু দেখছে না সত্যি কথাই।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে প্রবোধ খাসনবিশ বলল, যাক, আমি ধরে নিতে পারি আপনার স্বামীর প্রথম পক্ষের ছেলে বঙ্কি রায় আজও

এ-বাড়িতে বসে নেই ?

—আপনাদের লোক চলে যাবার দশ মিনিটের মধ্যেই চলে গেছে।

—দ্যাট্‌স্ এক্সপেকটেড্।···কিন্তু আপনি নিজে এতবড় একটা রিস্ক্ নিতে গেলেন কি করে, আপনার মেয়ে আছে, চাকরি আছে··· ধরা পড়লে তো আপনাকেও টেনে নিয়ে যেতই, আমিও তখন আপনাকে কোন রকম সাহায্য করতে পারতাম না।

খুব শান্ত মুখে বন্দনা বলল, আপনারা বিশ্বাস করবেন কি করে ও আমার নিজের ছেলের থেকে কম নয়—আর এ-ও ভাবতে পারবেন না, আপনারা ওকে যত খারাপ ভাবেন ও ততো খারাপ নয়—

—তাহলে ও এ-রকম হল কি করে ?

আমাদের দোষে, ছোটবেলায় মা-হারা ছেলেদের মানুষ করার ব্যাপারে অনেক গলদ ছিল···।

দোষটা বন্দনা নিজের ঘাড়েও নিল বটে, কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষটা বুঝেই নিল আসল দোষটা কার। এই মহিলার প্রতি তার আজও অশ্রদ্ধা নেই। বলল, ওকে আপাতত বেশ কিছুদিনের জন্য কলকাতা থেকে চলে যেতে বলেছেন ?

—আমি কিছুই বলতে পারিনি।···হঠাৎ ঝড়ের মতো এসে বিপদের কথা বলল, তার কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ এলো···ওকে তখনকার মতো রক্ষা করা ছাড়া আমার মাথায় আর কিছুই ছিল না··· পরেও ভেবে-চিন্তে কিছু বলার ফুরসৎ পাইনি।

প্রবোধ খাসনবিশ একটু হেসে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। টুপীটা মাথায় পড়ল। হাতে ছোট বেটন। বলল, আমাকে শত্রু না ভেবে আপনি অকপটে সব বললেন ভালো হল···কিছু মনে করবেন না, আমি আপনার শোবার ঘরটা দেখব···জাস্ট ফর কিউরিসিটিজ, সেক্, আমার ও. সি'র চোখকে আপনি কি করে ফাঁকি দিলেন সেটা আমার কাছে এখনো পরিষ্কার নয়।

বন্দনা নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো। আগে আগে ঘর থেকে বেরুলো।

পিছনে প্রবোধ খাসনবিশ। বন্দনা শোবার ঘরে এলো। পিছনে সে-ও।

ভদ্রলোক ঘরের চারদিক খুঁটিয়ে দেখল একবার। ড্রেসিং টেবিলের ওপর সেই ঘুঙুরজোড়া এখনো পড়ে আছে। সে দুটো হাতে তুলে নিয়ে দেখল। নাড়া দিতেই ঝুম ঝুম শব্দ হল। বন্দনার দিয়ে ফিরে জিগ্যেস করল, এ দুটো কার।

—আমার মেয়ের···বঙ্কি কিনে দিয়েছিল।

—আপনি এ দুটো পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নাচের তালিম দিচ্ছিলেন ?

বন্দনার নীরব চাউনিটুকুই জবাব।

ভদ্রলোকের ঠোঁটে মৃদু হাসি। ঘরের চারদিক একবার দেখে নিয়ে খাটের পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে শৌখিন ওয়াল ম্যাট্রেসটার দিকে এগিয়ে গেল। একটু থমকে দাঁড়িয়ে দেখছে। তারপর হাতের বেটন দিয়ে ম্যাট্রেসটা আধ-হাত সরালো। বক্স রুম চোখে পড়ল।

হাসছে।—বঙ্কিকে তাহলে এখানে রেখে আপনি নাচের তালিম দিচ্ছিলেন ?

বন্দনার নিরুপায় মুখ। এবারেও চাউনিটুকুই জবাব।

তেমনি হেসে প্রবোধ খাসনবিশ বলল, এখন সব বুঝতে পারছি ····ভেরি ক্লেভার অফ ইউ····আমার ও. সি.-টি একটু বেশি রসিক, সো ইউ কুড ড্র অল্ হিজ অ্যাটেনশান. হি শুড্ বি পানিশড্, কিন্তু আপনার খাতিরে আমি তাকে স্পেয়ার করব, তা নাহলে প্রেস পাবলিসিটি পেয়ে ব্যাপারটা লাউড হয়ে দাঁড়াবে।···আচ্ছা, আপনার সময় নষ্ট করলাম. নমস্কার—

দ্বিধা কাটিয়ে বন্দনা বলল, আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব জানি না····যা করেছি নিরুপায় হয়েই করেছি····আপনার দাদার কি সব জানার দরকার আছে।

জবাবে প্রবোধ খাসনবিশ হাসিমুখে চেয়ে রইল একটু। জবাব দিল, বুঝলাম। দরকার নেই, চলি।

॥ ছয় ॥

মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা এক রকম বন্ধ মধুমিতার। মুখ দেখাদেখি বন্ধ করার কোনো রাস্তা থাকলে তাও করত। তিনি ঘরের বাড়িতে সেটা সম্ভব নয়। যতক্ষণ পারে নিজের ঘরে থাকে। কিন্তু বাবার কাছে যেতে হলে মায়ের ঘরের পাশ কাটাতে হয়। যেতে আসতে মুখ দেখতে হয়, স্কুলে মুখ দেখতে হয়। মধুমিতার সব থেকে বড় ক্ষোভ মায়ের টাকায় খেতে হয়, পরতে হয়, পড়াশুনা করতে হয়। এ-সব বাবার টাকায় হলে মায়ের জারিজুরি কিছু ভাঙতে চেষ্টা করা যেতে পারত।

না, যত ব্যক্তিত্ব নিয়েই চলুক, এই মা যে এমন নিষ্ঠুর হতে পারে তার কল্পনার মধ্যেও ছিল না। হায়ার সেকেণ্ডারি পড়তে শুরু করা কোন মেয়েকে তার মা এ ভাবে মেরেছে বলে কখনো শোনেনি। দুর্জয় রাগে অনেক রকমের প্রতিশোধের চিন্তা মাথায় এসেছে। আত্মহত্যা করলে কেমন হয় তাও ভেবেছে।...চলন্ত লরি-টরির নিচে ঝাঁপিয়ে পড়া বা লেকের জলে ডোবার কথা ভাবতেও গা শিউরে উঠেছে। এই বয়েস পর্যন্ত বাস একসিডেন্টে একবারই একজনকে মরতে দেখেছে। বাপরে, কি বীভৎস। তিন-রাত ঘুমোতে পারেনি। আর জলে ডোবা মৃত্যু চোখে না দেখলেও কল্পনা করতে পারে। জল খেয়ে খেয়ে শেষে দম বন্ধ হয় শুনেছে। নাঃ, অত কষ্ট বিভীষিকা। তার থেকে ডজন তিনেক কড়া ঘুমের ওষুধ গিলে ঘরের খাটে শুয়েই চিরদিনের মতো ঘুমোলে কেমন হয়? নিজেই তারপর নিজের মৃতদেহ দেখেছে মধুমিতা আর মায়ের মুখখানা দেখতে বা ভাবতে চেষ্টা করেছে। নাঃ, এই মা তখনো যেন এক পাথরের ব্যক্তিত্ব নিয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। শোকে অধীর বরং তার বাবা।...ও-চিন্তাও বাতিল কারণ এই দেহটার ওপর মায়া। এরই মধ্যে গান ফুরিয়ে গেল নাচ ফুরিয়ে গেল চেনা-অচেনা ছেলেগুলোর ছোক-ছোকানি ফুরিয়ে গেল—এ কথা ভাবতে ভাল লাগে?...সোনালির ছোড়দা বি. এ.

পড়ে, অত বড়লোকের ছেলে, কিন্তু মধুমিতা সোনালিদের বাড়ি গেলে সেই ছেলের যে কতবার করে বোনকে দরকার হয় আর তার ঘরে আসে ঠিক নেই। সোনালিটাকে হাঁদা মেয়ে ভাবে ওর ছোড়দা, কিন্তু ও পর্যন্ত হাসে। একদিন বলেছিল, মেজদা প্রেম করে বিয়ে করেছে, ছোড়দারও প্রেমের হাতেখড়ি শুরু হল বোধ হয়। এ ছাড়াও কত রকমের সংকল্প ওর সামনে, কত সোনার স্বপ্ন—এর মধ্যে হঠাৎ আত্মহত্যা করল আর সব ফুরিয়ে গেল—এ কখনো হয়?

মধুমিতা নাচ আর গানে আরো বেশি মন দিয়েছে। সেই সঙ্গে একটু পড়াশোনাতেও। হায়ার সেকেণ্ডারিটা অন্তত ভাল ভাবে পাশ করতে হবে। তারপর কলেজের খাতায়ও নাম লেখাতে হবে তা না হলে কল্পনার জলুসে ঘাটতি পড়ে। বাবার সঙ্গে এখন বেজায় খাতির ওর। বিশ্বাস করে এখন অনেক কথাই বলে। মায়ের অভিনয় জীবনের অনেক কিছু খুঁটিয়ে শোনা হয়ে গেছে।...গোড়ায় সিনেমা মহলে মায়ের এম. এ. পাশটা নাকি একটা দারুণ পোশাকের মতো কাজ করেছিল।...না, মধুমিতার যা কল্পনা তাতে এম. এ. পাশ করার মতো অত দিন ধরে ঘষ্টানোর ধৈর্য নেই। কেবল কলেজে পড়া মেয়ে এই নাম থাকলেই হল। ও তো আর স্কুল মাস্টারি করতে যাচ্ছি না। ওর স্থির বিশ্বাস বি. এ. পাশ করারও দরকার হবে না। তার ঢের আগেই বাঞ্ছিত সুযোগ সুবিধে এসে যাবে। নাচের স্কুলের লোকেরাই তো ওর নাচের দু-তিনটে ফোটো তুলে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে পাবলিসিটির জন্য। মধুমিতার কাছেও সে-সব ফোটোর কপি আছে। সোনালির বাড়িতে গান করার সময় ওর ছোড়দা যে ফোটো কটা তুলেছে তারও একটা করে কপি ওকে উপহার দিয়েছে।

হাত পাকানোর আছিলায় গোড়ায় গোড়ায় সোনালির সঙ্গে ওর ফোটো তুলত। শেষে নানা ছলে সোনালিই ওর ছোড়দাকে একা ছবি তোলার সুযোগ করে দিয়েছে। কোনদিন হঠাৎ কি মনে পড়তে আসছি বলে সরে পড়ত। ওর সেয়ানা ছোড়দাটি ততক্ষণ হাত গুটিয়ে বসে থাকত। মোটেই না। আর মধুমিতা লজ্জা-লজ্জা ভাব দেখাতো

বটে, কিন্তু লজ্জা কত পেত নিজেই জানে। কেউ ওকে কোনদিন আনস্মার্ট বলেনি। ফলে সোনালির ছোড়দার ফোটো তোলার নেশা বেড়েছে। বাড়িতে তুলেছে। বোনের সঙ্গে ওকে গাড়িতে বেড়াতে নিয়ে বেরিয়ে জায়গা বেছে ফোটো তুলেছে। নানা ঢংয়ের ছবি তোলা হয়েছে যা দেখলে চেয়ে থাকতে হয়। সে-সব মধুমিতার অ্যালবামে আছে। বাবাকে শুধু দেখিয়েছে, আর কাউকে নয়। কে এ-সব তুলেছে বাবাকে অবশ্যই বলেনি। বাবা তো আর মায়ের মতো নয় যে অবিশ্বাস করবে। সোনালিকে বাবা মা দুজনেই চেনে সোনালিও এ-বাড়িতে মাঝে মধ্যে আসে। তার এক মস্ত বড়লোক ফোটোগ্রাফার আত্মীয় তুলে দিয়েছে বলতেই ফুরিয়ে গেল, মেয়ের অত সুন্দর ছবি দেখে বাবার সে কি আনন্দ। বলেছে, এমন ফোটোজেনিক মুখ খুব কম দেখা যায়।

বাবা এতটুকু বাড়িয়ে বলে ভাবে না মধুমিতা। ওর নিজেরও তো চোখ আছে। সুন্দরী মায়ের সুন্দরী মেয়েই বলে সকলে কিন্তু ফোটোতে তার থেকে ঢের বেশি সুন্দরী মনে হয় ওকে। সে তুলনায় দাদাদের সঙ্গে মায়ের সেই বয়েস কালের ফোটো কিছুই না। ফোটোজেনিক মুখ নয় বলেই তো অত রূপ নিয়েও তা ছবির জগতে পাত্তা পেল না।

মায়ের ওপর বিদ্বেষ বেড়েই চলেছে মধুমিতার। দিনে দিনে বিদ্বেষের অনেক কারণ ধরা পড়ছে চোখে।...প্রদোষ খাসনবিশকে বাবা কি চোখে দেখে তা অনেক দিনই আঁচ করতে পেরেছে। মায়ের একচল্লিশ বছর বয়েস এখন ( অবশ্য বয়েস চাপা দেবার কারিকুরি মা ভালই জানে—বড় জোর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ মনে হয় )। তবু মায়ের আসল বয়েস বাবা তো জানে। এখনো ওই প্রদোষ খাসনবিশ বাড়ি এলে বাবার ভিতরের আঁচ মধুমিতা ঠিক টের পায়। ওদিকে ভদ্রলোকের যা ঢোসকা চেহারা একখানা—অথচ এলে মায়ের সমাদর কত।

মধুমিতা নিজেই কিছু দিনের মধ্যে একটা বড় রহস্য জানতে

পেরেছে।···কথায় কথায় নিভা মাসিকে একদিন জিগ্যেস করেছিল, প্রদোষ খাসনবিশকে সে মায়ের স্কুলের চাকরির গোড়া থেকেই দেখছে কিনা। এই থেকেই সাদা মানুষ নিভা মাসির পেট থেকে অনেক কথা টেনে বার করতে পেরেছে। নিভা মাসি জবাব দিয়েছিল, স্কুলের চাকরি থেকে কেন, তোর মায়ের বিয়ের বহু আগে থেকেই তো তোর মামা বাড়িতে যাতায়াত ছিল তার—তোর বড় মামার বন্ধু ছিল সে

শুনে মধুমিতা ভিতরে ভিতরে লাফিয়ে উঠেছে। কিন্তু এখন থেকেই ও ভেতর-বার আলাদা করতে শিখেছে। বোকার মতো জিগ্যেস করেছে, প্রদোষকাকা তাহলে তখন থেকেই মাকে পছন্দ করত বুঝি?

—ও মা, তা আর করত না। গাড়ি হাকিয়ে প্রায়ই তো বাড়িতে আসত। নিভামাসি পরে গলা খাটো করে বলেছিল, তোর মাকে বলিস না যেন, দিদিমণি একটা মুখের কথা খসালেই কবে বিয়ে হয়ে যেত, তোর বড় মামা আর বড় মামী তো ওখানেই বোনের বিয়েটা দেবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল—কিন্তু দিদিমণি তখন ভদ্রলোককে পাত্তাই দিলে না।

ব্যস, মধুমিতার চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেল। উত্তেজনা চেপে জিগ্যেস করেছিল, বাবা কি এ-সব জানে?

নিভা মাসি সাদা মনেই জবাব দিয়েছে, জানার তো কথা নয়, তোর বাবা তো দিদির স্কুলে চাকরি নেবার আগে তাকে দেখেনি। আমিও তো তার পর থেকেই আবার তাকে এখানে আসতে দেখছি।

····না, মধুমিতা বাবাকে এ-সব কিছু বলেনি। বলে তার অশান্তি আরো বাড়িয়ে লাভ কি। বাবার জন্য দরদেই মায়ের ওপর আরো দুর্জয় রাগ মধুমিতার।····মায়ের ছবি তো মার খেয়েই ছিল, তার পরেও বাবা আর দাঁড়াতে পারল না তার কারণ নিশ্চয় প্রদোষ খাসনবিশ আর মা। নিজের স্ত্রীর ওপর এমন একটা সন্দেহ নিয়ে কোন্ মানুষ সুস্থির হয়ে কাজে-কর্মে মন দিতে পারে। মায়ের সঙ্গে বিয়ের আগে বাবার তো আরো তিন-চারখানা ছবি হয়েছিল। বিয়ের পর ওই এক

'ব্যক্তিত্ব' ছবিতেই সব শেষ হয়ে গেল কেন?

প্রদোষ খাসনবিশ দু'তিন সপ্তাহে একবার করে আসেই। মায়ের ঘরেই বসে মামণি বলে হাঁক দেয়। আদর দেখিয়ে মধুমিতাকে মা-মণি ডাকে। গান শুনতে চায়। মধুমিতা তাকে ঘুঙুর পরে নাচও দেখিয়েছে। কিন্তু নাচের থেকে গান বেশি পছন্দ ( হবে না কেন, মায়েরও যে তাই )। কিন্তু এখন মামণি ডাক শুনলে নিজের ঘর থেকে তার উদ্দেশে জিভ ভ্যাঙচায় মধুমিতা। দু'বার তার গান শোনার ইচ্ছে বাতিল করেছে। প্রথমবার হাঁক শুনেও সাড়া দেয়নি। মা এসে বলেছে, ডাকছেন শুনতে পাস না?

রাগে মাকেও অমনি করে জিভ ভেঙচাতে ইচ্ছে করছিল মধুমিতার। উঠে এসেছে। বলেছে, খুব গলা ব্যথা, গাইতে পারছি না। আর একবার নিভাকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিল, এত মাথা ধরেছে যে বিছানা থেকেই উঠতে পারছে না। তা-ও দরদ-কত. এ-ঘরে এসে দেখে গেছে, কপালে হাত দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছে, জ্বর-টর কিনা। গা ঠাণ্ডা দেখেও মাকে বলেছে, প্রায়ই শরীর খারাপ হচ্ছে মামণির, ডাক্তার-টাক্তার দেখাও। আমার ডাক্তারকেও ফোন করে দিতে পারি, এসে দেখে যাবে।

মা চুপ করে খানিক মধুমিতার দিকে চেয়ে থেকে ঠোঁটে সামান্য হাসি টেনে বলেছিল, ওর ডাক্তার আমি।

প্রদোষ খাসনবিশ কিছুই বোঝেনি। কিন্তু মধুমিতার বুঝতে বাকি থাকেনি। তার হাড়পিত্তি জ্বলে গেছল। এক ঘণ্টা বাদে আদরের লোক চলে যেতে মা ফের ঘরে এসেছিল। চুপচাপ খানিক চেয়ে থেকে বলেছিল, তোর গান বাজনা এরপর আমি বন্ধ করে দেব।

—কি বন্ধ করে দেবে? মধুমিতা ঝলসেই উঠেছিল।—বাবা আমার নাচ গানের খরচাও চালাতে পারবে না ভাবো নাকি?

—আমি না চাইলে কিছুই চালাতে পারবে না।

—কেন? তোমারই বা এত রাগ কেন? যাকে তাকে আমি গান শোনাতে চাই না বলে?

মোক্ষম একখানা ঘা বসিয়ে রাগ করে আর একদিকে চলে গেল। আসলে হাতের নাগালের বাইরে গেল। মধুমিতার বয়েস এখন সতেরো পেরোতে চলল, তবু সেই এক দিনের মার ভোলেনি। যদিও অত আর পরোয়া করে না, তবু বিশ্বাস নেই।

—কি বললি ? মায়ের মুখে লালের আভা ছড়াচ্ছে।

মধুমিতা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে সমান তালে তেজ দেখালো।—গান শোনাব না—তুমি জেনে রেখো আমি কাউকে গান শোনাব না! যখন-তখন আমাকে যেন গান শোনার জন্য ডাকা না হয়।

এরপর প্রদোষ খাসনবিশ এসেছে টের পেলেই বই-পত্র নিয়ে সুমিতার বাড়ি পড়তে চলে যায়। সুমিতা ক্লাসের মেয়ে, এ পাড়াতেই থাকে। আর থেকে থেকে মধুমিতার তখন মনে হয়, বাবা বাড়ি নেই, নিভা মাসি বা ভোলাদা মায়ের ঘরে কেউ থকলে পরদা এক ইঞ্চিও সরাবে না জানা কথাই।...দুজনের এত কি গল্প থাকতে পারে।... প্রদোষ খাসনবিশ তখন মাকে চুমু-টুমু অন্তত খায় নিশ্চয়। মনে হলেও মধুমিতার কান-মাথা দিয়ে আগুন ছোটে।

...মায়ের নিষ্ঠুরতার আরো জঘন্য প্রমাণ বাবার কাছে থেকেই পেয়েছে। ছোড়দাকে না হোক দাদাকে এখনো মনে পড়ে। মুখ স্পষ্ট একটুও মনে নেই অবশ্য। কারণ ঘরে মায়ের সঙ্গে যে ছবি আছে সেটা দাদার এগারো বছর বয়সের। মধুমিতার তখন জন্মই হয়নি। আর যে চেহারা ধূ-ধূ মনে আসে সেটা দাদার আঠারো বছর বয়সের। এগারো বছরের ফোটোর সঙ্গে সেটা একটুও মেলে না। মধুমিতার বয়েস তখন ছয় হবে। তবু দাদার কিছু স্মৃতি মনে আসেই। ...ও যখন নাচত একজন কেউ হাত-তালি দিত আর হাসত। আজও যে ঘুঙুর জোড়া ওর প্রাণের জিনিস সেটা দাদারই দেওয়া এটুকু কেমন করে যেন মনে আছে!

...ষোল বছর বয়সে মায়ের কাছে সেই ভীষণ মার খাওয়ার পরে বাবাই একদিন তুই দাদার ব্যাপারটা ওকে বলেছিল।

হ্যাঁ, সুবীর রায় তখন স্ত্রীর ওপর আক্রোশেই মেয়ের কান বিষিয়েছে। বলেছে, তোর মা যে সময় সময় কত নিষ্ঠুর হতে পারে ভাবতে পারবি না—একটু ভালবাসা পেলে দু'দুটো ছেলে এ-ভাবে চলে যেত না, ভাবলাম সৎ-ছেলে, তাদের ওপর না হয় মায়াদয়া নেই—কিন্তু এখন দেখছি তোর ওপরেও এই অত্যাচার····এত বড় মেয়ের গায়ে কেউ এ-ভাবে হাত তোলে!

মধুমিতার মাথায় তক্ষুণি অন্য আঁচড় পড়েছে।—দাদাদের মা একটুও ভালবাসত না? নিভা মাসি যে বলে মা তাদের খুব ভালবাসত?

—আমিও তো ভাবতাম তো ভারী ভালবাসে। কিন্তু কি রাগ তোর মায়ের, আঠারো বছরের ছেলেকে বাড়ি থেকে একদিন তাড়িয়েই দিল। তোর দাদা কি এমনি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে?

মধুমিতা আঁতকে উঠেছে।—তাড়িয়ে দিল! দাদাকে? আর তুমি বাধা দিলে না? বাড়িটা তো তোমার?

—তা হলে কি হবে, অত বড় ছেলের মানসম্মান বোধ আছে না?····দাদা তোর মাকে ভাল যেমন বাসত তেমনি গোঁয়ারও ছিল—অভিমান করে সেই যে বাড়ি ছাড়ল আর ফিরলই না।····দীপুটা ছিল তার দাদার অন্ধ ভক্ত, তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে পুলিশের গুলি খেয়ে মরল।

রাগে থরথর করে কেঁপেছে মধুমিতা। ঘৃণা—ঘৃণা—ওই নিষ্ঠুর মায়ের ওপর রাজ্যের ঘৃণা তার। জিগ্যেস করেছে, দাদা তাহলে এখন কোথায়?

বাবার বুক ঠেলে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এসেছে।—সে-ও কি আর বেঁচে আছে নাকি! বেঁচে থাকলে এই এগারো বছরের মধ্যে একটা খবর দিত নিশ্চয়ই····

দুই দাদার মৃত্যুর কারণ যে-মা মধুমিতা তাকে জীবনে ক্ষমা করবে? কক্ষনো না, কোনদিন না। আসুক, দিন আসুক, সব-কিছুর বোঝাপড়া ও-ই একদিন করবে। সব-কিছুর জবাবদিহি মা-কে

একদিন করতেই হবে।

বছর গড়িয়ে গেল। মাকে অবাক করে ফার্স্ট ডিভিশনে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করল মধুমিতা। পড়াশুনা যেটুকু করেছে মা-কে এড়িয়ে। অল্পের জন্য সেকেণ্ড ডিভিশন এড়াতে পেরেছে। কিন্তু মা বোধ হয় ধরে নিয়েছিল, ও নির্ঘাত ফেল করবে। কারণ, পরীক্ষার আগে পর্যন্ত মেয়ে যখন একটা দিনের জন্য তার কাছে পড়তে যায়নি—সে-মেয়েকে আর পাশ করতে হয়! মা-কে বাতিল করে মধুমিতার একটা সংকল্প সিদ্ধি হয়েছে।

ছেলে মেয়ে একসঙ্গে পড়ে এমন একটা কলেজে ভর্তি হল। অনার্সও নিয়ে রাখল একটা। যদিও জানে, যে ক'দিন না মনের মত সুযোগ আসছে, কলেজে নামটাই থাকবে শুধু, ওর দ্বারা আর কিছু হবে না। এ-ব্যাপারে যা-কিছু পরামর্শ সব বাবার সঙ্গে। গার্জেন হিসেবে স্কুলে এত কাল মায়ের নাম ছিল। ফর্মে গার্জেনের জায়গায় এবারে বাবাকে দিয়ে সই করালো। ভক্তি দেখে বাবাও কম খুশি নয়।

মেয়ের সমস্ত পরিবর্তন বন্দনা প্রায় হাল ছেড়ে দেখে যাচ্ছে। মায়ের থেকে বড় শত্রু ওর যেন আর কেউ নয়। কথা বললে জবাব দেয় না, ডাকলে সাড়া দেয় না। যে-ভাবে তাকায় মনে হয় চোখ দিয়ে বিষ ঢালছে। গোড়ায় গোড়ায় বন্দনার রাগ হত। কিন্তু রাগের থেকে এখন ভাবনা বেশি। কারণ, তার স্থির বিশ্বাস ওর বাবাই মেয়ের মতিগতি বদলে দিয়েছে। বাবা বলতে মেয়ে অজ্ঞান এখন। আর মেয়েও তার চোখের মণি। হাতে টাকা পেলেই মেয়ের হাতে গুঁজে দেয়। কেউ বিষিয়ে না দিলে কেউ আস্কারা না দিলে ও এমন বেপরোয়া আর এত অবাধ্য হবে কেন? সম্মান বজায় রাখার জন্যেই বন্দনাও নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে রাখছে। কিন্তু ভিতর থেকে নিস্পৃহ থাকে কি করে। তার দুশ্চিন্তা বেড়েই চলেছে।

মধুমিতা তার নিজের বিবেচনা অনুযায়ী প্রস্তুতির রাস্তা ধরেছে।

বাবার খাতিরের এক সখের জ্যোতিষী ওর হাত দেখে বলেছিল উনিশ বছর বয়েসে ওর জীবনে একটা বড় ঘটনা ঘটবে। বড় ঘটনা বলতে ভাগ্যের বড় রকমের কোনো দরজা খুলে যাওয়া ছাড়া আর কি। মধুমিতা সেটা একটুও অবিশ্বাস করেনি। বাবাও না। সেই উনিশ চলছে এখন। আর যা ঘটবে তার তোড়জোড়ও শুরু হয়ে গেছে। ভাগ্য তো কারো সেধে-আসে না, চেষ্টা করতে হয়, তাকে ডেকে আনতে হয়।

স্টুডিওতে গিয়ে নানা ঢং-এ নানা পোজ-এ কতগুলো ফোটো তুলল। নাচের ফোটো গানের ফোটো আছে, শাড়ি-পরা হালের ফোটোও দরকার। সোনালির ছোড়দার তোলা সব ফোটোই ফ্রক বা স্কার্ট ব্লাউস পরে তোলা। কি ভুল যে করেছে।···নাচ তো আছেই, স্বাস্থ্য আরো তাজা মজবুত রাখার তাড়নায় বাবার অনুমতি নিয়ে সাঁতারে ভর্তি হয়েছে। কলেজে কিছু সাঁতার কাটা মেয়ে আছে। তারা বলে সর্বাঙ্গের এমন এক্সারসাইজ আর নেই। বাবার অনুমতি নেবার কারণ, এ টাকাটা মায়ের কাছ থেকে নেবে না, বাবাকে দিতে হবে। কলেজে কিছু ছেলে বন্ধু হয়েছে। মধুমিতাকে জোটাতে হয়নি, তারাই এসে জুটেছে। মায়ের শ্যেন চক্ষুর মধ্যে পড়ে না থাকলে স্কুলেও জুটত। মধুমিতা এখন নিজের কদর বুঝছে। ছেলে বন্ধুদের মধ্যে গাড়ি হাঁকানো ছেলেও আছে। তাদের ছুই একজনের কাছে নামী অভিনেতা অভিনেত্রীদের শুটিং দেখার বাসনা প্রকাশ করেছে। চেষ্টা করলে এটা কঠিন ব্যাপার কিছুই নয়। গত চার মাসের মধ্যে ও আর সোনালি ছুজন ছেলে বন্ধুর সঙ্গে পাঁচ দিন শুটিংও দেখেছে। ছু'দিন দেখার পর সোনালির আর ভাল লাগেনি, কিন্তু বান্ধবীর অনন্য আর্টিস্ট হবার স্বপ্নের খবর একমাত্র সে-ই জানে।

মধুমিতা সেই সব শুটিং একাগ্র মনোযোগে দেখে গেছে। বিশেষ করে অভিনেত্রীদের হাব-ভাব কথা-বার্তা চলা-ফেরা অভিব্যক্তি—সব অভিনেত্রীর জায়গায় নিজেকে ওই সেটের নায়িকা কল্পনা করতে চেষ্টা

করেছে। রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে ও দারুণ অভিনয় করছে, আর ডাইরেক্টর ক্যামেরাম্যান আর টেকনিশিয়ানরা বাহবা দিচ্ছে। খবরের কাগজে তার পড়ার বিষয় কেবল সিনেমার পাতা। এ ছাড়া সিনেমার একটা পত্রিকা আর দুটো সাপ্তাহিক পত্রের গ্রাহক হয়েছে। সেগুলো রাখার জায়গা বাবার ঘরে, পড়ার জায়গাও। মা এ-ঘরে ঢোকে না তাই টেরও পায় না।

ওই সব কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে এ পর্যন্ত দু'জায়গায় নিজের ছবি-সহ আবেদন পাঠিয়েছে। তাদের চাহিদার সঙ্গে না মেলা সত্ত্বেও বিজ্ঞাপনের জবাব দিয়েছে। তেইশ থেকে ছাব্বিশ সাতাশের মধ্যে বয়েস চাই, কিন্তু ও একুশ বাইশ লিখলে কে ধরছে। কোথায় যেন শুনেছিল বা পড়েছিল মেয়েদের রূপ আর বয়েস যেমন দেখায় -- তেমন। ইন্টারভিউতে ডাকলে ও তো আর সালোয়ার কামিজ পরে যাবে না, যাবে শাড়ি পরে।

এই বিজ্ঞাপনের জবাব দেবার সময়েই মধুমিতার দারুণ একটা প্ল্যান মাথায় এসেছিল। হঠাৎই একদিন সকলকে তাক লাগিয়ে দেবার বাসনা। সকলকে বলতে সব থেকে বেশি মাকে। ছবির শুটিং হবার আগে থেকেই কাগজে নায়ক নায়িকার সম্পর্কে নানা খবর বেরোয় লক্ষ্য করেছে। বিশেষ করে কোনো ছবিতে নতুন নায়ক বা নায়িকা এলে। কিন্তু মধুমিতা আগে থাকতে কোনো জানাজানির মধ্যে যেতে চায় না। বিশেষ করে কলেজে তাহলে একটা হুল্লোড় পড়ে যাবে। আর মা-ও আগে থাকতে জেনে যাবে, যেটা ও একেবারে চায় না। নিজের সেই এক 'ব্যক্তিত্ব' ছবির পরে মা বোধ হয় জীবনে আর কোন ছবিই দেখেনি। এই মা জানলে শুরুতেই অশান্তি লেগে যাবে। বাবার সঙ্গে খিটিমিটি বাধবে। না, এই মাকে একটুও বিশ্বাস নেই। মেয়ে মা-কে যত অবজ্ঞা অবহেলাই করুক, একদিনের সেই নিদারুণ মারের পরেই বুঝেছে এই মা-টি ক্ষেপে গেলে অনর্থ ঘটানোর ক্ষমতা রাখে। মায়ের ক্ষেপে যাওয়ার ফলে আঠার বছরের দাদাকে পর্যন্ত এই বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল তা-তো

বাবার মুখেই শুনেছে। কাজেই আগে থাকতে তার জানার সম্ভাবনা ছেটে দিয়েই এগোতে হবে। মা সিনেমার কাগজ পড়ে না বটে, কিন্তু কাগজেও তো সিনেমার খবর থাকে। তা পড়ে কিনা কে জানে।

অতএব একটা নাম দরকার। যে-নামে ছবির জগতে ও একদিন সম্রাজ্ঞী হয়ে বসবেই। মধুমিতা নামটা নিজেরও কম মিষ্টি লাগে না। কিন্তু মায়ের কারণেই মায়ের দেওয়া নাম বাতিল। কি নাম ?···কি নাম নেওয়া যেতে পারে ? ডজন দুই নাম মাথায় এসেছে, কাগজে লিখেছে। তারপর হঠাৎই একটা চমকপ্রদ নাম মগজে খেলে গেল।

·চন্দনা। বন্দনার মেয়ে চন্দনা।··তাহলে ?

দারুণ। ছবির জগৎ থেকে বন্দনা বাতিল। আর তার খুব কাছাকাছি—ব'এর জায়গায় চ'—চন্দনা ছবির জগতে বিস্ময়—মা জানার পর এ-ও কি এক ধাক্কার কারণ হবে না ? নিজের অদৃষ্ট ভেবে দীর্ঘনিশ্বাস পড়বে না ? বন্দনা ছবির জগৎ থেকে মুছে গেছে, চন্দনাকে নিয়ে সেই জগৎ তোলপাড়—মায়ের দীর্ঘ নিঃশ্বাস না পড়ে পারে ?

বাস, নাম ঠিক। চন্দনা রায়।

শলা পরামর্শ সব সোনালির সঙ্গে। সোনালি শুধু বন্ধু নয়—মধুমিতার দারুণ ভক্তও। প্রাণের বন্ধু বলেই সোনালি ওকে হিংসে করে না। সে-ও বিশ্বাস করে ও পাঁচজনের একজন নয়, ওর মধ্যে বড় হবার আগুন আছে।

নামের সমস্যা মিটতেই ঠিকানার সমস্যা। বাড়ির ঠিকানায় আবেদনের জবাব এলে সব পণ্ড হতে পারে। ভোলাদা বা নিভা-মাসির যে-ই লেটারবক্স খুলুক, চিঠি পেলেই আগে সেটা মায়ের হাতে দেয়। একই ঠিকানায় বন্দনা রায়ের হাতে চন্দনা রায়ের চিঠি পড়লে নামের ভুল ভেবে সে-চিঠি খোলাই স্বাভাবিক। নাঃ, বাড়ির ঠিকানাও আপাতত বাতিল। সোনালি সরকারের ঠিকানাই ওর ঠিকানা। চন্দনা রায়, কেয়ার অফ সোনালি সরকার দিলেই ওদের বাড়ির

লোকেরও আর ভুল হবে না। সোনালিরই অন্য কোন বন্ধুর চিঠি ভাববে। আর সোনালির হাতে চিঠি পড়লে সেটা মধুমিতার হাতে পড়তে কতক্ষণ।

সোনালির সঙ্গে সব কথাবার্তা আর ব্যবস্থা পাকা। তারই বা উৎসাহ কম হবে কেন, ও তো ধরেই বসে আছে ছোড়দা একেই ঘরে আনবে একদিন। মধুমিতার এখনই যা চেহারা, এর ওপর নামী আর্টিস্ট হলে ছোড়দা তো হাওয়ায় ভেসে বেড়াবে। সোনালির ছোড়দা বি. এ. পাশ করেই ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত গেছে। তার ফেরাব অপেক্ষা কেবল। ছোড়দা বিলেত যাবার আগে মধুমিতার সঙ্গেও কথা বলেছে। মধুমিতা হেসেছে কেবল। হ্যাঁ বা না কিছুই বলেনি। এই হাসি থেকেই বোঝা গেছে তার আপত্তি নেই। কিন্তু মধুমিতার নিজের স্বপ্নটা আপাতত এতই বড় যে এই স্বপ্নটা এখন তেমন প্রশ্রয় পায়না। তবু ভাবতে একেবারে মন্দ লাগে না।

....দুটো বিজ্ঞাপনের মধ্যে এক জায়গা থেকে ডাক এসেছিল। মধুমিতা হতাশ হয়েছে। যারা ডেকেছিল তাদের ওকে অপছন্দ হয়নি এ-কথা স্পষ্ট করেই বলেছে কিন্তু পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটি বিধবা মেয়ের সাইড রোলে তাকে মানাবে না এ-ও সখেদে জানিয়েছে। না, চন্দনা অর্থাৎ মধুমিতারও একটুও পছন্দ হয়নি। নাচ নেই গান নেই, কেবল আদর্শের নজির হয়ে থাকা এক অল্পবয়সী বিধবার রোল্। এ-রকম ভূমিকায় নামলেই বরং বিপত্তি। যে ডাইরেক্টর আর প্রোডিউসার ইন্টারভিউ নিচ্ছিল তারা আশ্বাস দিয়েছে, ভবিষ্যতের কোন ছবিতে তাব উপযুক্ত রোল পেলে ওকে তারা অবশ্যই ডাকবে। এটুকুতেই মধুমিতার নিজের ওপর আস্থা বেড়েছে। সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ওকে বাতিল করা সহজ নয়।

একটা দুটো করে দিন যায় আর মধুমিতা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। যেন অযথা সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। অবাক লাগে, ছবির জগতে নাচ-গান জানা শিল্পীর কদর আছেই—কিন্তু পুরোনো আধ-বুড়ি আর্টিস্টগুলোকে নিয়েই সকলে মেতে আছে কেন? ছবিতে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছরের

নায়িকারা যখন কাঁচা বয়সের মেয়ে সেজে নাচে, মধুমিতার চোখে জল ফোটে। কাঁচা তাজা সুন্দরী মেয়ের চাহিদা নেই কেন কাগজ-গুলোতে ?

অপেক্ষা করে করে যখন বিরক্তি ধরে যাচ্ছিল, আর ভাবছিল, বাবাকে ধরেই স্টুডিও মহলে চেষ্টা চালাবে কিনা, তার মধ্যে সিনেমার দৈনিকে একটা মনের মতো বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল। সেই বিজ্ঞাপন পড়ে মধুমিতার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ। ক'বার করে পড়ল ঠিক নেই। বিজ্ঞাপন দিচ্ছে ইস্ট জোন সিনে কোলাবোরেশন ! লিখেছে বম্বের এক নাম-করা চিত্র-সংস্থার নতুন ভিন্ন শাখা এটা। অবশ্য সেই সংস্থার নাম এতে প্রকাশ করেনি। কুড়ি থেকে বাইশ বছরের মধ্যে প্রকৃত সুন্দরী এবং নাচ গান জানা নতুন আর্টিস্ট চাই। হিন্দী বাংলা আর ইংরেজি জানা থাকলে ভাল হয়— এর কোন একটা জানা না থাকলে তা শিখে নেবার প্রতিশ্রুতি বাঞ্ছনীয়। টার্মস প্রার্থীর গুণাগুণ সাপেক্ষ। ফোটোসহ আবেদনের নির্দেশ। নিচে কোন ঠিকানা নেই, কেবল বক্স নম্বর।

মধুমিতার উৎসাহ ফিরে এলো। বাংলা ইংরেজি তো জানেই। আর মায়ের যে স্কুলে ছোট থেকে পড়ে এসেছে সেখানে হিন্দীর আধিপত্যই বেশি। শতেকে সত্তর পঁচাত্তরটি মেয়ের মাতৃভাষা হিন্দী। শুধু হিন্দী ভাষা পড়া বা জানা নয়, ছেলেবেলা থেকে তাদের সঙ্গে মেশার ফলে মধুমিতা বেশ টগবগ করে হিন্দী বলতে কইতে পারে।

ইস্ট জোন সিনে কোলাবোরেশনের ঠিকানা পেলে দরখাস্তের বদলে মধুমিতা নিজে গিয়ে হাজির হতে পারত। সবকিছুর চটক দেখিয়ে আসা যেত। সর্ব ব্যাপারে সোনালি এখন ওর মস্ত সহায়। কাগজের কাটিং নিয়ে ওর ওখানে চলে গেল। দু'জনে মিলে মাথা খাটিয়ে এবারে খুব যত্ন করেই দরখাস্ত লিখে দামী কাগজে সেটা টাইপ করিয়ে নিল। ভিতরে দুর্দান্ত একটা নাচের ছবি, গান গাইছে এমন একটা ছবি আর শাড়ি পরা একটা বাছাই ছবি দিয়ে বক্স নম্বরে রেজিস্ট্রি করে পাঠালো। আর সোনালিকে বলে রাখল জবাব পেলে

ওকে যেন জানাতে একটুও দেরি না করে।

এবারে আশা করছে জবাব পাবে। চাহিদার থেকেও ওর বেশি ছাড়া কম কিছু নেই যখন, জবাব পাবে না কেন?

আট দিনের দিন জবাব পেল। সোনালি চিঠি নিয়ে নিজেই হাজির। মধুমিতার এর মধ্যে ধৈর্য যেতে বসেছিল।

তিন দিন বাদে বিকেল চারটেয় ইন্টারভিউতে ডেকেছে তারা পার্ক স্ট্রিটের এক অভিজাত এলাকার ঠিকানা।

সময়টা মধুমিতার পক্ষে অনুকূল। মা তখন স্কুলে থাকবে। ভিতরটা উত্তেজনায় ভরপুর। বাবাকে বলি-বলি করেও বলল না। বাতাসে কথা ছড়ায় বাবারও পরে জানাই ভালো সোনালিকে বললে ওদের গাড়িটা পাওয়া যেত। কিন্তু সোনালিও তাহলে সঙ্গ নিতে ছাড়বে না। মধুমিতা একলাই যেতে চায়। বেশ ভেবে-চিন্তে সাজগোজ করে সাড়ে তিনটের আগেই বেরিয়ে পড়তে পারবে।

সেই দিন এলো। সকাল থেকেই চাপা উত্তেজনার মধ্যে কাটল মধুমিতার। তাই যতটা সম্ভব মায়ের চোখের আড়ালে থাকল। সময় বুঝে তৈরি হল। মা ইদানীং একটু কালীভক্ত হয়েছে ভেবে মনে মনে মাকে কত রকম ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছে ঠিক নেই। কালী ভক্তির লক্ষণ হল, নিজের ঘরের দেয়ালে মা বড়-সড় একটা কালীর ছবি টাঙিয়েছে। সন্ধ্যেবেলায় সেখানে ধূপকাঠি জ্বেলে দেয়—আর যেতে আসতে প্রণাম করে। আজ রেডি হয়ে মধুমিতা মায়ের ঘরে ঢুকে সকলের অলক্ষে সেই কালীর পায়ে চট করে একবার মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম সেরে বেরিয়ে এলো। মনে মনে ভাবল, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ মাকে করেছে, কালীকে তো আর নয়।

ঠিকানা দেখে দেখে দশ মিনিট আগে পৌঁছুল। ট্রামে পার্কস্ট্রিটে গেছে। সেখান থেকে মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ। বেশ ছিমছাম বাড়ি। ছোটই বলা যায়। এখানে কতগুলো অফিস জানে না। সময় ধরে রাস্তাতেই মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করল। আ-দেখলের

মতো বেশি আগে গিয়ে কাজ নেই।

দোতলায় অফিস। দরজায় ইস্ট জোন সিনে কোলাবোরেশনের ছোট সাইন বোর্ড। তারপর একটা বসার ঘরের দরজায় অবাঙালী দারোয়ান। ইন্টারভিউর কথা বলতে সে স্লিপ আর পেন্সিল এগিয়ে দিল। তার হাতে স্লিপ পাঠানোর তিন মিনিটের মধ্যে ডাক এলো।

এটা বড় ঘর। পরিপাটি সাজানো গোছানো। দেয়ালে নাম-করা আর্টিস্টদের ছবি। সেটার ওধারে আরো তুটো ঘর। দেখে শুনে মধুমিতার এটা একটা আলাদা ফ্ল্যাট মনে হল। মস্ত শৌখিন টেবিলের ওধারে বছর চল্লিশেব ধুতি আর চমৎকার কাজ করা পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক বসে। মধুমিতার মনে হল ভদ্রলোক গুজরাটি হবে। তার তুপাশের গদীতে বছর আটাশ তিরিশের আর তুটো লোক। তারাও কেউ বাঙালী নয়। তাদের পরণে চকচকে ট্রাউজার্স আর বুশ শার্ট। দেখতে তুজনেই স্মার্ট বেশ।

মধুমিতা স্মার্ট মেয়ের মত এগিয়ে যেতে এদের প্রধান অর্থাৎ ধুতি পরা ভদ্রলোকটি তু'হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ালো। মধুমিতার এটুকু ভারী ভাল লাগল।

ও প্রতিনমস্কার করতে ধুতি-পরা ভদ্রলোক একনজর দেখে নিয়ে হাসিমুখে জিগোস করল, চন্দনা রায়?

গলায় অবাঙালী টান। মধুমিতা বুদ্ধি করে হিন্দীতে জবাব দিল, জি হাঁ।

—সীট ডাউন প্লীজ। আই অ্যাম কিষেণ মোদী।

ও বসতে নিজেও বসল। তু'দিকের তুজনকে দেখিয়ে বলল, আওয়ার অফিসার্স মিস্টার কার্লেকার অ্যাণ্ড মিস্টার রেহমান। বোথ অফ দেম আর ইন আওয়ার জোনাল ইউনিট।

আবার সৌজন্য বিনিময়। সেই ফাঁকে যতটা সম্ভব তিন জনই ওকে খুঁটিয়ে দেখে নিল। কিষেণ মোদী একটা ফাইল টেনে নিয়ে তার থেকে ওর দরখাস্তটা বার করে বেশ মন দিয়ে পড়ল একবার। আপনি চন্দনা রয় মিস্ আপনি বংগালী?

—জি হাঁ। আপনি হিন্দী বা ইংরেজিতে বলুন, আমার কোন অসুবিধে হবে না।

কিষেণ মোদী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সঙ্গীদের একজনের দিকে তাকালো। তারপর ওর দিকে ফিরে মন্তব্য করল, ভ্যাট্স গুড—

কথায় ফাঁকে আর একটা মোটা বোর্ড ফাইল টেনে নিল। সেটা খুলতেই একগাদা মেয়ের ফোটো বেরিয়ে এলো। দেখে মধুমিতার চক্ষুস্থির। কম করে ষাট সত্তরটা ফোটো হবে। ওর ফোটো ক'টা অবশ্য ওপরের দিকেই ছিল। কিষেণ মোদী একটা করে তুলছে, দেখছে তারপর ওর দিকে তাকাচ্ছে। অর্থাৎ ফোটোতে আর আসলে তফাত কতটুকু দেখছে। তার ফোটোগুলো সঙ্গীদের দিকে বাড়িয়ে দিল। মুখভাব পরিতুষ্ট। মধুমিতা চোখ বুজে বলে দিতে পারে মুখের থেকেও যে ওর ছবি ভালো আসে সেটা বুঝেছে। তিনটে ফোটোই একই ভাবে বাকি দুজনেও যাচাই করল। এদের কাউকেও অখুশি মনে হল না মধুমিতার। রেহমান মন্তব্যই করে ফেলল, পারফেক্টলি ফোটোজেনিক।

এবারে হিন্দীর সঙ্গে ইংরেজি মিশিয়ে প্রশ্নোত্তর শুরু হল। কত বয়েস, কি পড়ছে, আগে আর কখনো ফিল্মে অভিনয় করেছে কি না, মডার্ণ গান বেশি পছন্দ কি ক্লাসিক, কোন্ নাচ বেশি রপ্ত করেছে··· ইত্যাদি। এর কিছু উত্তর দরখাস্ততেই লেখা ছিল। মধুমিতা এতটুকু না ঘাবড়ে জবাব দিন। সব রকমই গাইতে পারে, সব রকমই নাচতে পারে! বহু ফাংশনে নেচেছে, গেয়েছে। কাপ মেডেলও কম পায়নি। না, সিনেমায় অভিনয় করার অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু স্কুল-কলেজের থিয়েটারে কি কি অভিনয় করেছে গড়গড় করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলে গেল। বাংলায় নয়, পরিষ্কার হিন্দী আর ইংরেজি মিশিয়ে। মাতৃভাষা বাংলা জানে না এ-তো কেউ ভাববে না। তারপর সুন্দর করে হাসল, আপনারা নতুন আর্টিস্ট চান শুনেই আমি বিশেষ আশা নিয়ে এসেছি কারণ আপনাদের সিলেকশন টেস্টে যোগ্যতা প্রমাণের স্কোপ পাব।

হাসল তারাও। অপছন্দ যে হচ্ছে না মধুমিতা স্পষ্টই বুঝতে পারছে। এবারে কার্লেকার মৃদু হেসে বলল, অভিজ্ঞতা বলতে আসলে আমাদের স্টেজ-ফ্রি স্মার্ট আর্টিস্ট দরকার—সেটুকু হলেই হল। আপনার ফিল্মে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা থাকলে আমরা আপনাকে তা ভুলে যেতে বলতাম, সেজন্যেই ফ্রেশারদের চেয়ে অ্যাডভার্টাইজ করা হয়েছে। আওয়ার ডাইরেক্টর্স অলসো প্রেফার ফ্রেশার্স ফর দেয়ার নিউ স্কিম।

মধুমিতার আশা বাড়ছে। কৌতূহলও। —আপনাদের

ডিরেক্টর কে... ?

কিষেণ মোদী জবাব দিল, মাদার কোম্পানির নাম নিশ্চ শুনেছেন—শিব্‌জি প্রোডাকসন্স, সেখানে অনেক ডাইরেক্টরই আছে এখানকার এই সেপারেট ইস্ট্‌জোন অর্গানিজেশানের দুটো ছবিতে আপাতত দুজন ডিরেক্টটর কাজ করবেন, পরে এক্সপ্যানশন শুরু হবে আরো অনেককেই টেনে নেওয়া হবে—যে দু'জন প্রথমে আসছেন—তাঁদের নাম এখনই বলব—আচ্ছা বলি—

শিব্‌জি প্রোডাকশনের নাম তো শুনেইছে মধুমিতা, এখানকা জন্য যে দুজন ডাইরেক্টরের নাম করল এরা, তাইতেই ভিতরে ভিতর রোমাঞ্চ। এতই নামী যে মধুমিতা তাদের চোখে দেখার আশা করেনি কখনো।

মধুমিতার অ্যাপ্লিকেশনে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কিষে মোদী বলল, আচ্ছা, আপনি হলেন মিস চন্দনা রয়, কিন্তু কেয়া অফ লিখেছেন সোনালি সরকার—হু ইজ শি? ইওর গার্ডিয়ান?

এ-রকম ক্যাশাদের জন্য মধুমিতা প্রস্তুত ছিল না। থতমত খে জবাব দিল, না, আমার আত্মীয়া।

কিষেণ মোদীর ভুরুর মাঝে সংশয়ের ভাঁজ পড়ল একটু।—দে হু ইজ ইওর গার্ডিয়ান?

—ফাদার।

—ও। কিষেণ মোদীর বিরস মুখ।—তার মানে আপনা ফাদারের অমতে বা অজান্তে আপনি এ-লাইনে আসতে চাইছেন—উই ডোণ্ট লাইক দ্যাট্‌। তার সঙ্গী দু'জনও আপত্তিসূচকভাবে মাথ নাড়ল।

মধুমিতা মনে মনে বলল, সর্বনাশ করেছে। তাড়াতাড়ি জবা দিল, না, তা নয়, আমার বাবা নিজে একজন ফিল্ম ডাইরেক্টর, তাঁ অমত হবে না—তিনি জানলে বরং দারুণ খুশি হবেন—আই জা ওয়াণ্টেড টু টেক দেম অল বাই সারপ্রাইজ—

কিন্তু এ-ও যেন মোদীর খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না—আপার

বাবা ফিল্ম ডাইরেক্টর !...এটা একটা প্লাস পয়েন্ট, দরখাস্তে আপনার তা লেখা থাকা উচিত ছিল। আপনার বাবার নাম কি ?

বলল। আবার ফ্যাসাদে পড়ার সম্ভাবনায় যোগ করল. উনি প্রায় রিটায়ার করেছেন, ছবি-টবি এখন বিশেষ করছেন না...তবে তবে এখনো স্ক্রিপ্ট করেন. কোনো কোনো প্রোডাকশনে অ্যাডভাইজার হিসেবেও থাকেন—আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন তাঁর আপত্তি হবে না।

কিষেণ মোদী ওর মুখের দিকে চেয়ে ভাবল একটু।—দেখুন. আমরা ঠিক অবিশ্বাস করছি না, কিন্তু কাউকে সিলেক্ট করার পর কানো অসুবিধের মধ্যেও পড়তে চাই না। ফাইল থেকে অন্য একটি মেয়ের ফোটো তার দিকে বাড়িয়ে দিল।—দু'দিন ইন্টার-ভিউয়ের পর এই মেয়েটিকে আমরা মোটামুটি সিলেক্ট করেছিলাম, কিন্তু আজই ঘণ্টাখানেক আগে এসে তিনি জানিয়ে গেলেন, বম্বে াবার ব্যাপারে তাঁর গার্ডিয়ানের আপত্তি আছে...শুধু কলকাতায় লে তিনি আসতে পারেন। আমাদের পর পর দুটো ছবিই হিন্দী াংলা ডাবল্ ভার্সানে হবে—হিন্দীর প্রোগ্রামই প্রথম—তাই শুধু ম্বে কেন, শুটিংএর জন্য দরকার হলে লণ্ডন আমেরিকাতেও যেতে তে পারে—অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, যতটা সম্ভব আমরা লকাতা বা বম্বে থেকে অনেক দূরে গিয়ে গিয়ে শুটিং করাই পছন্দ রি, এটা আমাদের ছবির একটা অ্যাডিশনাল অ্যাট্রাকশন, প্রথম বিটার জন্য আমরা হলিউডে প্রোগ্রাম করতে পারি কিনা সে-ষ্টাও চলছে—

কথার মাঝখানে বেয়ারা আবার ঘরে ঢুকে একটা স্লিপ রেখে াল। মোদী সেটা দেখে কার্লেকারের দিকে চেয়ে বলল, মিস াহুজা—বলে এসো একটু ওয়েট করতে হবে। এঁর হয়ে গেলে াকে ডাকব—

কার্লেকার উঠে গেল। মোদী আবার মধুমিতার দিকে ফিরল। সো উই ডোণ্ট ওয়ান্ট এনি ট্রাবল আফটার-ওয়ার্ডস, সো টু

প্রোসিড ফার্দার, আপনি আপনার বাবার একটা কনসেণ্ট লেটা
পোস্টে পাঠিয়ে দিন, ছবির জন্য আপনাকে কোথাও পাঠাতে আপি
নেই তা-ও লিখতে হবে—ওটা পেলে আমরা নেক্সট ইণ্টারভিউয়ে
জন্য কন্‌সিডার করব।

যে মেয়ের ছবি দেখানো হয়েছে তাইতেই মধুমিতার বুক শুকিয়
এসেছিল। অন্য ধাঁচের চেহারা হলেও দস্তুরমতো সুন্দরী। সে
বাইরে যেতে আপত্তি না করলে মধুমিতা হয়তো বাতিল হয়ে যেত
ওকে এদের মোটামুটি পছন্দই হয়েছিল মনে হয়েছে, কেন যে মরতে
ঠিকানায় ওই সোনালি মুখপুড়ির নামটা দিতে গেল। ভেবে
আফশোস হল, তবু বিপাকে পড়ে মধুমিতা এবারে মাথা খাটালো
দু'চোখ তার মুখের ওপর তুলে ঠোঁটে সপ্রতিভ একটু হাসি টেনে
বয়স্ক লোকটাকেই ঘায়েল করতে চেষ্টা করল একটু। —কনসেণ্ট
লেটারের বদলে আমি যদি আমার বাবাকেই সঙ্গে করে নিয়ে আসি
...আপনারা যদি আমাকে সিলেক্ট করেন, কনসেণ্ট লেটার আপনারা
যেমন চান সে-তো দেবেনই, তবে তার আগে তাঁকে তো আপনাদের
সঙ্গে কথা বলে সব জানতেই হবে—

কার্লেকার ফিরে এসে তার চেয়ার নিয়েছে। এবারে মোদীর
মুখেও হাসি দেখা দিল একটু। মাথা নেড়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত সুরে
বলল, দ্যাট উইল বি ও-কে ফর আস।

—কবে নিয়ে আসব ডেট দিন।

এবারের হাসি দেখে আর তারপর জবাব শুনে মধুমিতাকে বুঝতে
হল লোকটা বোকা একটুও নয়। আর অনায়াসে ঘায়েল হবার
পাত্রও নয়। সবিনয়েই জবাব দিল, আমাদের আরো কিছু ইণ্টারভিউ
বাকি আছে, আরো দু-চার দিন এ-নিয়ে বিজ্‌ই থাকতে হচ্ছে,
আমরাই খবর দেব...বাই দিই বাই, আপনি ফোনে অ্যাভেলেব্‌ল?

মধুমিতা ভিতরে ভিতরে দমে যায় একটু। কিন্তু মাথা সাফ
এখন। সোনালিকে বাতিল করে নিজের বাড়ির ফোন নম্বরই দিল।
সেই ফোন মায়ের ঘরে বলে সতর্কতার রাস্তা করে নিল।—এই নম্বরে

আমাকে বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে চারটের মধ্যে পাবেন, শুধু শনি রবিবার বাদে। ওই ছু'দিন আমার নাচ-গানের ক্লাস থাকে, আর অন্য দিন আমি কলেজ থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে বাড়ি ফিরি।

মোদী মাথা নাড়ল, অর্থাৎ তার বক্তব্য বুঝে নিয়েছে। ফোন নম্বর লিখে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ও-কে—গ্লাড টু মিট ইউ।

মধুমিতাও স্মার্ট মেয়ের মতই সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠল। কিন্তু তার পরেও একটা কথা না জিগেস করে পারল না।—এক্সকিউজ মি...ছুটো ছবির জন্য আপনারা কি ছুজনকে সিলেক্ট করবেন না, ছুটো ছবির জন্যেই এক জনকে?

মোদী হেসেই জবাব দিল, ছুটো ছবির জন্য আমরা অনেককেই সিলেক্ট করব—টু ফর দি লিডিং রোল্স—অ্যাণ্ড আদার্স ফর আদার ইম্পর্ট্যান্ট রোল্স—ইন ফ্যাক্ট, ইস্ট জোনের জন্য অ্যাণ্ড ফর ফিউচার ইন্টারেস্ট, আমরা এখানকার আর্টিস্টদের নিয়ে একটা ইউনিট ফরম্ করতে চাই—তারপর যে যেটাতে ফিট করে। ওর ছুশ্চিন্তা আঁচ করে আবারও হেসেই বলল, আপনি লিডিং রোল-এর জন্য ইন্টারেস্টেড সেটা আমরা বুঝে নিয়েছি—আচ্ছা, নমস্কার।

সকলের উদ্দেশ্যে সুন্দর করে নমস্কার জানিয়ে মধুমিতা বেরিয়ে এলো। বেরিয়ে এসে সামনের ঘরে পা দিয়ে দেখে সেখানে বিশ বাইশ বছরের একটি অবাঙালী মেয়ে বসে আছে। ছুজনে ছুজনকে দেখল। মধুমিতা বেরিয়ে এলো। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল একটা। ...মিস আহুজা...ইন্টারভিউ দিতে এসেছে নিশ্চয়...সুশ্রী বটে, কিন্তু ওর ধারে কাছেও নয়। ভিতরটা তবু উতলাই হয়ে থাকল, ফাইলের সবগুলো ফোটো দেখে নিতে পারলে ভালো হত।

বাড়ি ফিরে বাবার প্রতীক্ষায় উদগ্রীব। মা ঘরে না থাকলে স্টুডিওতে ফোন করতে পারত। বাবা এলো রাত আটটার পরে। উত্তেজনায় বুকের তলায় ঢিপঢিপ, মধুমিতা তার জন্য নিজে হাতে চা করে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

সুবীর রায় মেয়ের মুখে আত্মোপান্ত শুনে তো হাঁ প্রথম।

মধুমিতা সব বলেছে। এমন কি কেন চন্দনা রায় নাম নিয়েছে আর সোনালির বাড়ির ঠিকানা দিয়েছে তা-ও। আর কত আগে থেকে চেষ্টা করে করে শেষে এবারের এই সুযোগ এসেছে সবই বিস্তার করে বলেছে।…বম্বের শিবজি প্রোডাকসন্স-এর শাখা শুনে আর ডাইরেক্টরদের নাম শুনে সুবীর রায় নিজেও কম উৎসাহ বোধ করছে না। কিন্তু দ্বিধা আর একজনের কথা ভেবে।—কিন্তু তোর মা কি রাজি হবে, শুনলেই তো একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে ছাড়বে।

মধুমিতা দপ করে জ্বলে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু কি মনে হতে হেসে উঠল।—মায়ের নামে নিন্দে করছ কেন—মা গলা ছেড়ে কুরুক্ষেত্র বাধায় না চোখ দিয়ে ভস্ম করে?

—ও একই হল।

মধুমিতা এবারে ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, কিছুই হবে না, তুমিও পুড়ে ছাই হবে না, আমিও না।…তোমাকে তো বলেছি বাবা এই স্বপ্ন আমার অনেক দিনের, তোমার ওপর এ-পর্যন্ত যত অবিচার হয়েছে তার সব শোধ বন্দনার মেয়ে চন্দনা নেবে। নেবেই নেবে তুমি দেখে নিও।

বাবাকে রাজি করাতে বেগ পেতে হবে না মধুমিতা জানতই। মন স্থির করে ফেলার পর বাবাও এখন উদগ্রীব। প্রত্যেক রাতে বাড়ি ফিরে চুপি চুপি ওকে ডেকে খোঁজ করছে চিঠি বা ফোন এলো কি না।

ঠিক চারদিনের দিন বেলা চারটেতে ফোন এলো। কিষেণ মোদীর সেক্রেটারি জানাচ্ছে, মিস রয় তাঁর বাবাকে নিয়ে আগামী পরশু দিন যেন তাঁর সঙ্গে অফিসে দেখা করেন। শোনামাত্র মধুমিতার বুকের তলায় উত্তেজনার ঝড়। ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন ছাড়ল।

যথাদিনে যথা সময়ে বাবাকে নিয়ে মধুমিতা বাতাস সাঁতরে উপস্থিত। অফিস ঘরে আগের দিনের ওই তিনজনই।

আলাপ পরিচয় হল। কিষেণ মোদী আর তার আগের দিনেই সেই দুই সঙ্গী হাসি মুখে বাবার সঙ্গে হাত ঝাঁকাঝাঁকি করল। তারপর

হাসি মুখে কিষেণ মোদী মধুমিতার দিকে ফিরল।—কংগ্রাচুলেশন্স মিস রয়—ইউ হ্যাভ বিন সিলেক্টেড ইন আওয়ার ফার্স্ট পিকচার'স লিডিং রোল ফর বোথ্ হিন্দি অ্যাণ্ড বেঙ্গলী ভারসানস—

মধুমিতা ভিতরে ভিতরে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু খুশির অভিব্যক্তিতে মনে হল, তাই হবে এ যেন জানাই ছিল।—থ্যাঙ্কস···

সুবীর রায় জিগ্যেস করল, রোলটা কি?

—ছাটস আপ টু দি ডাইরেক্টর, তিনি এখন বম্বেতে স্ক্রপ্ট রাইটারের সঙ্গে বসে স্ক্রপ্ট লেখা সবে শেষ করেছেন খবর পেলাম। আমাদের ওপর শুধু ভার ছিল নাচ গান জানে, আর অভিনয়ে ইন্টারস্টেড এমন একজন ব্রাইট অ্যাণ্ড ভেরি ইয়ং লেডি সিলেক্ট করা - তবে, ফর ইওর ইনফরমেশন এটুকু বলতে পারি, গল্পের থিম হল, এক বয়স্কা বাইজীর এডুকেশন আর নাচে গানে অ্যাকমপ্লিশড্ একটি মেয়েকে সোসাইটিতে প্লেস করার প্রবলেম নিয়ে। আপনার মেয়ের সেই অ্যাকম্প্লিশড্ নায়িকার রোল—আই অ্যাম শিওর ইট উইল বি এ থ্রিলিং সাবজেক্ট যাতে কাজ দেখাবার সুযোগের অভাব হবে না।

মধুমিতার শুনেই রোমাঞ্চ। অভিজ্ঞ বাবাও খুশি হয়ে মন্তব্য করল, থিম ইজ রিয়েলি গুড।

কিষেণ মোদী মধুমিতার দিকে ফিরল।—ফাইনাল নেগোশিয়েশনের আগে আপনাকে কিছু টেকনিকাল টেস্টের জন্য আসতে হবে ···ভয়েস টেস্ট, ফোটো টেস্ট অ্যাণ্ড লাইক ছাট, আমরা টেপ রেকর্ডে আপনার একটা গানও তুলব—আমার ধারণা ও সব টেস্ট আপনার পক্ষে ফরম্যাল হবে—আপনার ফোটো দেখেছি, গলাও শুনছি···স্টিল রুটিন ওয়ার্ক আমাদের ফলো করতে হবে। দু'দিন বাদের সময় দিয়ে জিগ্যেস করল, ওদিন আসার সুবিধে হবে?

মধুমিতা তখুনি মাথা নাড়ল।—হবে।

কিষেণ মোদী সুবীর রায়ের দিকে ফিরল, মেয়ের সঙ্গে প্রথম বার অন্তত আপনিও বম্বে আসছেন নিশ্চয়?

মুহূর্তের দ্বিধা। কারণ, এরা এরোপ্লেন ছাড়া নড়ে না। তার পরেই মনে হল, কনট্রাক্ট, সই-সাবুদের সময় এরা অ্যাডভান্স তো কিছু করবেই। জবাব দিল, তা তো বটেই···প্রথম বার অন্তত আমার সঙ্গে থাকা দরকার।

কিষেণ মোদী আধমিনিট ভেবে বলল, মেয়ে আর্টিস্টের জন্য আমাদের অ্যাকোমোডেট করতেই হয়—দেন ইউ উইল বি আওয়ার গেস্ট—আপনারও এয়ার প্যাসেজ আর অন্য সব কিছুর ব্যবস্থা আমরাই করব—অবশ্য এটা শুধু প্রথমবারের জন্য। পরে যদি আসেন, তখনো আমাদের গেস্ট হতে পারবেন, কিন্তু যাতায়াতের খরচ তখন আপনার। উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। সুবীর রায়ও। হাত ঝাঁকিয়ে মোদী বলল, আপনি একজন ভেটারেন ডাইরেক্টর আর খুব ভাল স্ক্রিপ্ট রাইটার শুনেছি···আশা করব, ইউ উইল বি অফ সাম হেল্প টু আস।

হেল্প মানেই টাকা। সুবীর রায়ও সায় দিল, অফ কোর্স।

—থ্যাংক ইউ...।

—আপনাদের সঙ্গে গাড়ি আছে তো ?

—না···ট্যাক্সিতে এসেছি।

ডাইনে তাকাল।—কার্লেকার। মনবাহাদুরকে বলো এঁদের ছেড়ে দিয়ে আসতে। মধুমিতার দিকে ফিরে হাসল। আজ এই লোকের মুখের চেহারাই অন্য রকম। বলল, ফ্রম নাও অন ইউ আর আওয়ার ট্রেজার্ড আর্টিস্ট আপনাকে আর ট্যাক্সির জন্য বদার করতে হবে না।

বিলিতি না হোক, ঝকঝকে নতুন গাড়িই একটা। চৌরঙ্গী ধরে ধরে দক্ষিণে এগুতেই মধুমিতা সচকিত।—ড্রাইভার !

জি মেমসাব ?

মধুমিতা চোস্ত হিন্দীতে নির্দেশ দিল, আমরা এখন আর এক জায়গায় যাব—তুমি চল, আমি তারপর বলে দিচ্ছি—

বাবা অবাক হয়ে তার দিকে ফিরতে, তার হাঁটুতে বড় রকমের একটা চাপ দিল মধুমিতা। পরে সময় বুঝে কানের কাছে মুখ নিয়ে

ফিসফিস করে বলল, এর মধ্যেই ভুলে গেলে ? আমার অ্যাপ্লিকেশনে সোনালির বাড়ির ঠিকানা দিয়েছি না ।

পরের বারে মধুমিতা ইচ্ছে করেই আর বাবাকে সঙ্গে নিয়ে গেল না ! বাবার যাবার ইচ্ছে ছিল খুব । কিন্তু মধুমিতার মতে অত আগ্রহ দেখানো ভাল নয় ।

এবারে একজন বাড়তি লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল কিষেণ মোদী । তার পাশের গদির চেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে একটা বই পড়ছিল । মধুমিতা ঘরে ঢুকতে বই সরিয়ে দেখল একবার, তারপর আবার বইয়ে মন দিতে গেল । তার আগেই মোদী পরিচয় করিয়ে দিতে ভদ্রলোক বইটা হাঁটুর ওপর খোলা অবস্থাতেই উল্টে রেখে সোজা হল ।

—ইনি আমাদের কম্বাইণ্ড অর্গানিজেশনের চিফ পাবলিসিটি মানেজার মিস্টার মোহন কাপুর, আপনি এঁর সঙ্গেই বম্বে যাচ্ছেন । ···আর ইনি মিস চন্দনা রায়, আমাদের নতুন ছবির নিউ ফাইণ্ড । এ ভেরি ভেরি ব্রাইট ইয়ং লেডি । মোদী হেসে রসিকতা করল, এঁকে নিয়ে তুমি পাবলিসিটির কামান দাগার সুযোগ পাবে ।

নমস্কার বিনিময় হল । কিন্তু প্রথম দর্শনে চিফ পাবলিসিটি ম্যানেজারটিকে খুব সুরসিক বলে মনে হল না মধুমিতার । মোদীর কথায় সোনালি ফ্রেমের চশমার খুব হাল্কা লাল্‌চে আভার কাচের ওধারে দুটো চোখ মুখের ওপর কয়েক মুহূর্ত থমকে রইল মধুমিতা লক্ষ্য করল । তারপর আবার চেয়ারে গা ছেড়ে বইয়ে মন দিল ।

প্রথম আলাপের পরেই এই গোছের নিস্পৃহতা প্রত্যাশিত ছিল না । মোহন কাপুরের বয়েস তিরিশ বত্রিশের মধ্যে । গায়ের রঙ লাল্‌চে বাদামী । চমৎকার বিন্যাস করা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি । ওপরের দিকে কানের অর্ধেকটা পর্যন্ত পুরু জুলপি, বাকিটুকু তকতকে শেভ করা । পরণে খুব দামী ট্রাউজার্স আর শার্ট । এই নিস্পৃহতা দেখে

মধুমিতার মনে হল চিফ পাবলিসিটি ম্যানেজার নিজের পদ মর্যাদা, রূপ আর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বেশি সজাগ। হাতে পেপার ব্যাকের কোনো চটকদার ইংরেজি বই হবে। কিন্তু পড়ছে কতটা মধুমিতার সন্দেহ আছে।

ভয়েস টেস্ট বা ফোটো টেস্ট সম্পর্কে মধুমিতার কোন রকম উদ্বেগ ছিল না। তার মাইকের গলা বরং আরো ভালো। আর ফোটোও আজ পর্যন্ত কম তোলেনি। এতটুকু নার্ভাস হবার কারণ নেই। যোদী পাশের ঘরে গেল। মধুমিতার দু'চোখ আবার পাবলিসিটি ম্যানেজারের দিকে ঘুরল। মুখের সামনে বই খোলা, কিন্তু মনে হল ধূসর লালচে কাচের ওধারে তার চাউনিটা এদিকেই পড়ে। একটু বাদে তাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে নানা অ্যাঙ্গেল থেকে গোটা কতক ছবি তোলা হল। আর একজন তার হাইট মেপে নোট করে নিল। মাইকে কথাবার্তা টেস্ট করার পর সেই ঘরে বসেই তারা হারমোনিয়ামে একটা গান টেপ করে নিল। বলা বাহুল্য, মধুমিতা বেশ পছন্দের একটা হিন্দী গান গাইল।

সবকিছুর পর কিষেণ মোদী পরিতুষ্ট মুখে মন্তব্য করল, এভরিথিং সুপার ক্লাস, ইউ উইল গো এ লং ওয়ে মাই ইয়াং লেডি—ও-ঘরে গিয়ে বসুন, আমি আসছি।

এ রকম শুনলে কার না ভেতরটা ভরে ওঠে। আবার অফিস ঘরে এসে মধুমিতা দেখল, চিফ পাবলিসিটি ম্যানেজার মোহন কাপুরের চেয়ার খালি, আর রেহমানেরও। এটা আশা করেনি। ভিতরে ভিতরে মধুমিতা হতাশ হল একটু। ভেবেছিল, এ ঘরে বসে অত বড় ছুটো অর্গানিজেশনের চিফ পাবলিসিটি ম্যানেজারের তার গান শুনে একটু টনক নড়বে। আর মোদীর মত সেও দুটো প্রশংসার কথা বলবে। প্রচার যন্ত্র যার হাতে, নতুন আর্টিস্টের ভবিষ্যৎও অনেকখানি তারই হাতে। এই বয়সে এতটা পদস্থ বলেই লোকটার দম্ভও বেশি বোধ হয়।···যাক, একসঙ্গেই তো যাচ্ছে বম্বে, দেখা যাবে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ফিরে এসে সোজাসুজি চুক্তির কথায় এলো।

কিষেণ মোদী। জিগ্যেস করলো, টার্মস সম্পর্কে আপনার কিছু বলার আছে?

মধুমিতা এত বোকা নয় যে ফস করে কিছু বলে বসবে। ঠোঁটের ফাঁকে একটু বিব্রত গোছের হাসি টেনে জবাব দিল, আমার কিছু বলার নেই···আপনারাই বলুন।

এদিক থেকে কার্লেকার জিগ্যেস করল, ইউ ডিড্‌ন্ট কনসাল্ট ইওর ফাদার? হি ইজ ইন দি লাইন ...।

—না···। তাঁর সঙ্গে এখনো কোনো কথা হয়নি।

মোদী বলল, যাক, আপনার মনে রাখতে হবে এটা আপনার মেইডেন ভেঞ্চার, আর আপনাকে বিরাট ভবিষ্যতের রাস্তা খুলে দিচ্ছি—সো ইউ সুড্‌ন্ট এক্সপেক্ট ট্যু মাচ অ্যাজ এ স্টার্টার।...হিন্দি বাংলা ছুটো ভার্সানের জন্য আমরা আপনাকে এক লাখ টাকা দেব।..অফ কোর্স আপনার ইনকাম ট্যাক্সের জন্য যেভাবে সুবিধে হয় সে ভাবেই দেব—সেটা পরের কথা। ইফ ইউ ক্যান্ হিট দি বুলস্ আই ইন ইওর ফার্স্ট পিকচার, পরের ছবিতেই হয়তো আপনি পাঁচ লাখ পেয়ে যাবেন।

এক লাখ শুনেই আনন্দে মধুমিতার বুকের ভিতরে দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু আদেখলেপনা করলে চলবে না। চুপচাপ ভাবল একটু। দারুণ খুশি হয়েছে এ একটুও বুঝতে দিতে চায় না। বাবাকে জিগ্যেস করার জন্য একদিনের সময় চাইবে কিনা তা-ও ভাবল। কিন্তু না, অতটা রিস্ক নেবার সাহস নেই। দু'চোখ মোদীর মুখের ওপর তুলে হাসল একটু।—ঠিক আছে।..বুলস্ আই হিট করার আগে আমার কোন টার্মর্স থাকা উচিত নয়।

—গুড। স্মার্ট জবাব শুনে মোদী খুশি বম্বে যেতে পারেন কবে? দি সুনার দি বেটার।

—আপনি বলুন?

ভাবল একটু।—আজ মঙ্গলবার, মোহনকে বড় জোর শুক্রবার পর্যন্ত আটকে রাখা যাবে, হি ইজ্ ভেরি ভেরি বিজ্ই···শনিবার মর্ণিং ফ্লাইট যদি বুক করি?

—নো প্রবলেম।

—দ্যাট্‌স ফাইন। আপনার বাবার নাম আর বয়েস ?

—এস. রয়—ফিফটি সেভেন্‌।

একটা কাগজে নোট করল।—আপনি শুক্রবার বিকেলে এসে আপনাদের, আই মিন আপনার আর আপনার বাবার এয়ার টিকিট নিয়ে যাবেন, বা আপনার বাবাকেও পাঠিয়ে দিতে পারেন। আপনার কণ্ট্রাক্ট বম্বেতে সই হবে, আর সেদিনই থার্টি পার্সেণ্ট অ্যাডভান্সও আমাদের বম্বে অফিস পে করবে। বলতে বলতে ডানদিকের ড্রয়ার খুলে এক পাঁজা একশো টাকার নোট বার করল। তার থেকে গুণে দশটা নোট নিয়ে বাকিটা আবার ড্রয়ারে ফেলে দিল —এই হাজার টাকা আপনার এক্সপেন্সের জন্য...এয়ার প্যাসেজ অ্যাণ্ড ফার্স্ট ক্লাস হোটেল অ্যারেঞ্জমেণ্টস্‌ উইল বি অন আওয়ার অ্যাকাউণ্ট।

হাজার টাকা একটা খামে পুরে ওর দিকে এগিয়ে দিল। ধন্যবাদ জানিয়ে মধুমিতা সেটা নিল। তারপর জিগ্যেস করল, বম্বেতে এক নাগাড়ে কতদিন থাকতে হবে ?

—সেটা শুটিং প্রোগ্রামের ওপর ডিপেণ্ড করে। কলকাতার আর্টিস্ট নিয়ে আমরা যতটা সম্ভব বড় প্রোগ্রাম করতে চেষ্টা করি। মাঝে গ্যাপ থাকলে আপনি চলে আসবেন—প্রত্যেক বারই আপনার যাতায়াতের খরচ কোম্পানি দেবে···আপনার বাবা শুধু প্রথম বারের জন্য সেটা পাবেন।

বাবা উদগ্রীব প্রতীক্ষায় ছিল। সব শোনার পর সে-ও খুশিতে আটখানা। দুজনে পরামর্শ করে ঠিক করল, খুব চুপচাপ যাবার ব্যবস্থা করে রাখা হবে, মাকে এয়ার প্যাসেজ হাতে পাওয়ার পর শুক্রবার রাতে জানানো হবে।

কিন্তু শুক্রবার সকালেই ব্যাপারটা যেন ঢাক-ঢোল বাজিয়ে জানান দেওয়া হয়ে গেল। বাবা-মেয়েতে ক'দিন ধরেই কি পরামর্শ

চলছে বন্দনা আগেই লক্ষ্য করেছিল। শুক্রবার খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ বিষম ধাক্কা। সিনেমার পাতা বা সিনেমার খবর পড়ে না। কিন্তু পাতা ওল্টাতে গিয়ে যে ছবিটার দিকে চোখ গেল সেটাই এমন ধাক্কার কারণ। কাগজে মধুমিতার নাচের পোজ্-এর চেনা ছবি (যে ছবি মধুমিতা তার দরখাস্তর সঙ্গে রেজিস্ট্রি করে পাঠিয়েছিল)। বন্দনা বিমূঢ় খানিকক্ষণ। নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে পাচ্ছে না। কিন্তু এমন ভুল তার হবে কি করে! তারপর ছবির নিচের দু'তিন লাইনের খবর পড়ল। ইস্ট জোন সিনে কোলাবোরেশনের প্রথম ডবল-ভার্সান ছবির উচ্চশিক্ষিতা নৃত্যগীত পটীয়সী নতুন তারকা শ্রীমতী চন্দনা রায়। বম্বেতে শিগগীরই এই ছবির শুটিং শুরু হতে যাচ্ছে।

নাম চন্দনা রায় দেখে বন্দনা একটু ধোঁকা খেল না। ছবিটা এত চেনা আর এত স্পষ্ট, ধোঁকা খাওয়ার কারণও নেই। তাছাড়া সন্ত আসা ফিল্ম আর্টিস্টরা ছবির জন্য নাম বদল করেই থাকে, এও অজানা নয়। মেয়েও তাই করেছে, চন্দনা নাম নিয়ে ও তার মা বন্দনাকে বিদ্রূপই করতে চায় তা-ও বুঝতে বাকি থাকল না। নিস্পন্দের মত বসে রইল খানিক। তার কেবলই মনে হতে লাগল মেয়েটা হারিয়ে গেল। বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে যেতে লাগল। বাপই যে মেয়েকে এমন সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কাগজটা হাতে করে খাট থেকে নামল। বেরিয়ে এলো।… পাশের ঘরে। বাবা মেয়ে দুজনেই সেখানে। ভবিষ্যত জল্পনা কল্পনায় দুজনেই মশগুল। হঠাৎ এই মুখ দেখে বা এই ঘরে দেখে দুজনেই অবাক একটু।

কঠিন চোখে বন্দনা প্রথমে মেয়েকে দেখল খানিক। তারপর তার বাবার দিকে ফিরল।—তোড়জোড় করে মেয়েকে তাহলে এবারে সিনেমায় দিচ্ছ?

সুবীর রায়ের বিমূঢ় মুখ।—তোমাকে কে বলল?

জবাবে বন্দনা কাগজটা তার মুখের ওপর ছুড়ে মারল।

সুবীর রায় সেটা তুলে নিতেই ছবিটা চোখে পড়ল। মধুমিতা ছুটে এসে কাগজটা কেড়ে নিয়ে দেখতে লাগল। তার উদ্ভাসিত মুখ। কি কাণ্ড, শুক্রবারের কাগজে যে এমন জোর খবর থাকতে পারে ভাবেইনি। মায়ের শাসনের আর সে একটুও পরোয়া করে না। মা তখনো যেন বাবাকে চোখ দিয়ে ভস্ম করছে। মায়ের দিকে ফিরল।—শোন মা, বাবা কিচ্ছু জানত না, এর জন্য যা করা দরকার সব আমি নিজে করেছি। মোটামুটি ঠিক হয়ে যাবার পর বাবাকে বলেছি। প্রথম হিন্দী-বাংলা ছবির জন্য এক লাখ টাকার কনট্রাক্ট—কাল সকালের ফ্লাইটে বম্বে যাচ্ছি, আজ রাতেই তোমাকে সব বলতাম।

বন্দনার ইচ্ছে হল, সেই একবারের মত চুলের মুঠি ধরে ওকে কাছে টেনে আনে, তারপর মারতে মারতে একেবারে অজ্ঞান করে ফেলে মাটিতে শুইয়ে দেয়। কিন্তু এ-ও জানে সে আর সম্ভব নয়, এখন সব-কিছুই তার নাগালের বাইরে।

চোখ দুটো ধকধক করছে, মেয়ের বাবার দিকেই তাকালো আবার।—মেয়েকে বম্বে পাঠাচ্ছ, তার আগে আমাকে কিছু জানানোও দরকার মনে করলে না? তোমার মনের সাধ এতদিনে মিটেছে তাহলে। সব ভুলে গেছো?

সুবীর রায়ের প্রথমে নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে।—শুনলে তো ও নিজেই সব করেছে, ফাইনাল হয়ে যাবার আগে মিতা যে তোমাকে কিছুতে বলতে দিলে না···তাছাড়া আবার কি আছে, আমি তো সঙ্গে যাচ্ছি। ও যখন এ-লাইনে যাবেই, তুমি আমি তো ঠেকাতে পারব না...ওর এত ইচ্ছের জোর যে শুরুতেই মস্ত পার্টি পেয়ে গেছে...

ঘৃণায় বিদ্বেষে যন্ত্রণায় বন্দনা আর সেখানে দাঁড়াতে পারল না। নিজের ঘরে এসে খাটে বসে পড়ল। অবসন্ন। কেবলই মনে হল,

আর কোন আশা নেই। ঘর একেবারেই ভেঙেছে। প্রায় দু'যুগ আগের কয়েকটা মুখ চোখের সামনে এগিয়ে আসছে। বটোকেষ্ট বনার্জি···মাধব ঘোষ···নিজের স্বামী। আর তাদের সামনে যাকে দেখছে. সে বন্দনা নয়...মধুমিতা। কতগুলো লুব্ধ নেত্রের সামনে মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে বাপ আনন্দ করছে. লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখতে।

বন্দনা কি করবে? সে কি পাগল হয়ে যাবে।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় মধুমিতা সেজেগুজে বাবার সঙ্গে বেরুল। মা নিজে থেকেই জেনেছে, ভাল হয়েছে। এখন নিশ্চয় ঘরে বসে ভাবছে বন্দনার মেয়ে চন্দনা কত সহজে কত বড় অসাধ্যসাধন করতে পারে। মধুমিতার ভিতরটা আনন্দে ফুলে ফুলে উঠছে।

একটা পরব-টরব আছে বোধ হয়. ট্যাক্সি পেলই না। ট্যাক্সির চেষ্টায় খানিকক্ষণ হয়রান হযে বাবাকে বলল, দেরি হয়ে যাচ্ছে, ট্রামে চলো—

ট্রাম থেকে নেমে খানিকটা হেঁটে দুজনে সেই বাড়ির কাছাকাছি এলো। তারপর বাবাকে নিয়ে মধুমিতা ভিতরে ঢুকে সোজা দোতলায়। ঘরে শুধু কিষেণ মোদি আর কার্লেকার।

কিষেণ মোদী দু'জনকেই সাদর অভ্যর্থনা জানালো তারা বসার পর হেসে জিগ্যেস করল, রেডি ফর টুমরোজ মর্নিং ফ্লাইট?

বাবা মেয়ে দুজনেই মাথা নাড়ল।—রেডি।

—ছাট্‌স ফাইন...একটু অপেক্ষা করুন, আধ ঘণ্টার মধ্যে আপনাদের টিকিট এসে যাবে—এয়ার অফিসে লোক চলে গেছে! মিস্টার রয়, আপনি আমাদের অ্যারেজমেণ্ট সব শুনে নিয়েছেন তো?

জবাব দেবার আগেই বাধা পড়ল। পিছনের ঘর থেকে এ-ঘরে এসে ঢুকল মোহন কাপুর আর রেহমান। মধুমিতা সঙ্গে সঙ্গে অপ্রতিভ মুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মোহন কাপুরের উদ্দেশ্যে দু'হাত জুড়ে নমস্কার জানালো। জবাবে লোকটা সামান্য মাথা নাড়ল কি নাড়ল না। চোখে আছে সেই ধূসর লালচে কাচের সৌখিন চশমা। কোম্পানির কোনো বিশিষ্টজন ধরে নিয়ে সৌজন্যের খাতিরে

মধুমিতার বাবাও উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মোহন কাপুর তার দিকে তাকালও না। লম্বা পা ফেলে দরজার দিকে। পিছনে স্নেহমান।

মোহন—লিভিং? পিছন থেকে কাপুর ডাকল।

ইয়া,—হোয়াই? ঘুরে দাঁড়ালো।

—মিস রয় অ্যাণ্ড হার ফাদার আর রেডি ফর টুমরোজ মর্নিং ফ্লাইট। হ্যাভ সেন্ট মাই সেক্রেটারি টু গেট ইওর টিক্টেস –

মোহন বাবুর সোনালি চশমার ধূসর লালচে কাচের ভেতর দিয়ে দু'জনের দিকেই তাকালো একবার।—ও, কে। চলে গেল।

মধুমিতার আজও মনে হল লোকটা দেমাকে ফুলেই আছে। সর্বদা অমন রঙিন চশমা পরে স্টাইল দেখানো হয়, আবার চুরি করে দেখতেও সুবিধে। কত দেমাক পরে দেখা যাবে। মধুমিতা ঘড়ি দেখল। সাড়ে ছ'টা। ভেবেছিল তাড়াতাড়ি টিকিট দুটো হাতে পেলে টুকটাক আরো দুই একটা কেনা কাটা সারবে।

কিষেণ মোদী বাবার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে। তার সময়কার ছবির গল্প শুনছে, তার ডিরেকশনে যে-সব ছবি হয়েছে তা শোনার ব্যাপারেও ভদ্রলোকের উৎসাহ কম নয়। শুধু স্ক্রিপ্ট নয় বাবা এখন সিনেমার গল্প লেখে শুনে মোদি সত্যি খুশি। ওরা ব্যবসা বোঝে, বেশ আগ্রহ নিয়ে বলল, আমি ট্রাংক কলে আমাদের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে রিকোয়েস্ট করব তিনি যেন আপনার দুই একটা গল্প শোনেন। হি লাইকস বেঙ্গলী স্টোরিজ, অ্যাণ্ড ফ্র্যাংলি স্পিকিং আমার মতেও বাঙালী লেখকদের গল্পের তুলনা নেই। আপনি পারলে আপনার এই একটা গল্পের ইংরেজী সিনপসিস সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

এর মধ্যে মোদী দু'দফা কফি খাইয়েছে। আর টিকিট আনতে দেরী দেখে বিরক্তি প্রকাশ করেছে। আসার সময় মধুমিতা রাস্তায় জ্যাম দেখেছিল। ভাবল সে-জন্যেই এত দেরী হচ্ছে।

টিকিট আসতে রাত সাড়ে সাতটা। লোকটা ঘরে ঢোকামাত্র কিষেণ মোদী তাকে ধমকে উঠল, টিকিট আনতে গিয়ে ঘুমিয়ে

পাড়েছিলে ?" তিনটে টিকিট হাতে নিয়ে দেখল! তারপর একটা নিজের ড্রয়ারে রেখে অন্য দুটো বাবার দিকে বাড়িয়ে দিল, এই আপনাদের টিকিট নিন।

তৃতীয়টা নিশ্চয় মোহন কাপুরের। মধুমিতা তক্ষুনি ঠিক করে ফেলল প্লেনে ওই লোকটার পাশেই বসবে, বাবাকেই আলাদা সীটে বসতে বলবে। মধুমিতা আগে আর এরোপ্লেনে কখনো চড়েনি। কিন্তু সোনালির মুখে শুনেছে একদিকে তিন সীটের অন্য দিকে দু' সীটের ব্যবস্থা থাকে। তিন সীটের থেকে দু'সিটের হলেই আলাপ করতে সুবিধে। লোকটার বয়েস ওর তুলনায় বেশি কিন্তু দেখতে যে অদ্ভুত সুন্দর, অত দেমাক সত্ত্বেও তা অস্বীকার করতে পারে না।··· পাশে বসবে বটে, কিন্তু মধুমিতাও নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলবে। আলাপ ওই লোকই সেধে করবে জানা কথাই। পাবলিসিটি ম্যানেজার হিরোইনের দিকে নজর দেবে না তো কি। মধুমিতা এতটুকু তোষামোদের ধার দিয়েও যাবে না। ও যে আর পাঁচটা আর্টিস্টের মতো নয় এ বুঝিয়ে দিতেই হবে, কিন্তু তারই মধ্যে খুব ভদ্র ব্যবহার করবে।

বাবা বলল, ঠিক আছে।

কিষেণ মোদী জানালো, আপনাদের ফ্লাইট সকাল আটটায়। এয়ার পোর্টে ছ'টায় রিপোর্ট করতে হবে...আপনাদের তো তাহলে ভোর পাঁচটারও আগে বেরুতে হবে···তখন আপনাদের ট্যাক্সি পেতে অসুবিধে হবে না গাড়ির ব্যবস্থা করব?

জবাব দেবার আগে টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোন এ-ঘরেও আছে, কিন্তু ওই টেলিফোন বাজল পিছনের ঘরে। কার্লেকার উঠে ধরতে গেল।

বাবা কিছু বলার আগেই বন্দনা জবাব দিল, আপনি গাড়ীর ব্যবস্থা করলে তো খুব ভাল হয়, আজই তো ট্যাক্সি না পেয়ে—

—মিস্টার মোদী—! ও-ঘর থেকে কার্লেকার বেশ জোরেই ডেকে উঠল, ইওর ফোন—আরজেন্ট!

—এক্সকিউজ মী, প্লিজ ওয়েট, আই উইল মেক অ্যারেঞ্জমেন্টস। উঠে পরদা ঠেলে পিছনের ঘরে চলে গেল। ফিরতে কম করে পাঁচ মিনিট। এসেই হাসি মুখে বসল, আপনাদের এক্ষুনি যাওয়া হচ্ছে না মধুমিতার দিকে তাকালো, হিয়ার ইজ্ সাম গুড নিউজ ফর ইউ ·· আপনার ছবির ডাইরেক্টর হঠাৎ থেকে ফ্লাই করে চলে এসেছেন, আমার বাড়িতেই উঠেছেন। আপনি অফিসেই আছেন শুনে তিনি আপনাকে দেখার জন্য ভীষণ ব্যস্ত—মোর সো বিকজ্ আই ডেসক্রাইবড্ ইউ অ্যাজ্ এ সুপার স্টার—সো হারি আপ্—লেট্স গো। বাবার দিকে তাকালো, আপনার কিছু ভাবনা নেই—আমি আপনাদের পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব—আর কাল সকালেও আপনার বাড়ি গাড়ি পাঠাব।

এর থেকে আর অভাবিত খুশির খবর কি হতে পারে! মধুমিতা সানন্দে উঠে দাঁড়াল।—ঠিক আছে, চলুন—বাবা এসো।

নিচে নেমে তারা তিন জন একটা প্রকাণ্ড বিলিতি গাড়িতে উঠল। কার্লেকার আর যে-লোকটা প্লেনের টিকিট এনে দিয়েছে তারা সামনে ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল। মধুমিতা ভাবল, ডাইরেক্টারটির কদর আছে বটে, সে এসেছে বলে সকলেই হন্তদন্ত হয়ে চলল।

॥ সাত ॥

বন্দনা নিজের ঘরের খাটে বসে ছিল। আজ ভাল করে ক্লাসও নিতে পারেনি। বাড়ি ফিরেও ভেবেই চলেছে। না, আর এখানে নয় হস্টেলে একা আলাদা ঘর নিয়ে সেখানে চলে যাবে। নিভাকেও নিয়ে যাবে। কিন্তু তাতে যন্ত্রণার উপশম কতটুকু। নিজের ফেলে আসা দিনের অনেক কথাই মনে পড়েছে। ভিতরের ছটফটানি বেড়েই চলেছে মাঝে মাঝে কালীর ফোটোটার দিকে তাকাচ্ছে। মনে মনে বলছে, আর কিছু চাই না, একটু সুমতি দিও, মেয়েটা যেন ভেসে না যায়

দেখো—আমার মতো দশা যাতে না হয় দেখো।

রাত ঠিক সাতটা বেজে পনেরো মিনিটে টেলিফোন বেজে উঠল। বন্দনা এত অবসন্ন যে উঠতে ইচ্ছে করছে না। মেয়ে বা তার বাপের টেলিফোন হতে পারে ভেবে আরো বিরক্তি। বার তিন চার বেজে উঠল। ধরল। হ্যালো... ?

ছোটমা ?

বন্দনা ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মত চমকে উঠল।—হ্যাঁ—কে—বলছে ? কে কে কে ?

ওধারে ঠাণ্ডা গলা।—আমি বহ্নি, চন্দনা রায় কে...মিতা ?

হ্যাঁ—কেন ? কি হয়েছে ?

তেমনি ঠাণ্ডা গলা—আমি চিনতে পারিনি, আজ বাবার সঙ্গে দেখে চিনেছি। শোনো ছোটমা, বেশি কথা বলার সময় নেই...মিতার ভীষণ বিপদ, ও এক সাংঘাতিক র‍্যাকেটের জালে পড়েছে, বম্বেতে পা দেবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ও বরাবরকার মত হারিয়ে যাবে...দরকার বুঝলে ওরা বাবাকেও চিরদিনের মত সরিয়ে দেবে যা বলি খুব ভালো করে শুনে নাও...তুমি...

কথা শেষ হল না ফোনে চাপ করে একটা আওয়াজ ভেসে এলো। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা শব্দ। কেউ যেন কাউকে আঘাত করল। মনে হল, ওদিকের ফোনটা টেবিলের ওপর আছড়ে পড়ল।

হ্যালো—হ্যালো—হ্যালো !

সাড়া নেই। কেউ রিসিভারটা জায়গায় রাখল মনে হল। লাইন কেটে গেল। বন্দনা ফোন নামালো। পা দুটো থরথর কাঁপছে। বহ্নিরই গলা সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা শেষ করার আগে কে থামালো ওকে ? দু'টো শব্দ হল কিসের ? বহ্নির কি হল ? মিতা আর তার বাপের কি হল ? কাল সকালের প্লেনে বম্বে যাবে আজ এখনো ফিরছে না কেন ? কি হল ? কি হল কি হল কি হল ?

এর পর প্রতিটি মুহূর্ত বন্দনার বুকে হাতুড়ির ঘা বসিয়ে চলল। কি করবে এখন জানে না। মেয়ে আর তার বাবা কোথায় তা-ও

জানে না। পাগলের মতো সকালের কাগজটা খুঁজে বার করল। না, মেয়ের ছবির নিচে শুধু ইস্ট জোন্ সিনে কোলাবোরেশনের নাম, ঠিকানা নেই। কাগজ ফেলে বন্দনা ফোন গাইড খুলে বসল। ওই নামে যদি ফোন নম্বর পায়। কিন্তু মন বলছে পাবে না। ফোন গাইডের ছোট অক্ষরের নাম গুলোতে চোখ বসছে না, চোখে ঝাপসা দেখছে। তবু প্রাণপণে খুঁজছে বন্দনা।

পেল না।

এখন? পুলিশে খবর দেবে? বঙ্কির কোন অঘটন ঘটেছে। সন্দেহ নেই। তার কথা শেষ হবার আগেই কেউ তাকে আঘাত করেছে। ভাবতেও শরীরের রক্ত হিম, যে রকম শব্দ হয়েছে তাতে মনে হচ্ছে কেউ তাকে মাথায় আঘাত করেছে। কিন্তু তার আগেই বঙ্কি যা ফাঁস করেছে সেটুকু র‍্যাকেট দলের না জানার কথা নয়। শুনেছে বলেই ও-ভাবে আঘাত করেছে। তাহলে অমন সাংঘাতিক র‍্যাকেট ধরা পড়ার জন্য মেয়েকে আর তার বাবাকে বাড়ি ফিরতে দেবে? বন্দনা না জানলে দিত। এখন আর দেবে না, দিতে পারে না।

তাহলে বন্দনা এখন কি করবে?

ফোন তুলে প্রদোষ খাসনবিশের নম্বর ডায়েল করল।... বাড়ি নেই। তার ভাই প্রবোধ খাসনবিশকে চাইল।...সে ও বাড়ি নেই। কপাল খুব মন্দ না হলে দু'ভাইয়ের একজনও বাড়ি থাকবে না কেন। তারা দুজনেই আটটা সোয়া আটটার মধ্যে ফিরবে শুনল। বন্দনা জানালো, ভীষণ দরকার, তাদের যে কোন একজন ফিরলে যেন এই নম্বরে ফোন করেন। নিজের ফোন নম্বর দিয়ে রিসিভার রাখল।

বন্দনা পাগলের মতো ঘর বার করতে লাগল। গলির বাইরেও এসে দাঁড়ালো একবার ফিরে এলো। চোখের সামনে বিভীষিকার ছায়া পড়ছে থেকে থেকে। তিন তিনটে মানুষকে নিয়ে ওরা কি করবে? কি করতে পারে? রান্না ঘরের দিকে নিভা আর ভোলা, বন্দনার ইচ্ছে হল ওদেরই চিৎকার করে ডাকে! বলে কিছু। নিজের ঘরে

কালীর ফোটোর সামনে এসে দাঁড়াল। বন্দনা মুখে বলছে না কিছু, দু চোখে অব্যক্ত আকুতি, কিছু কি করার আছে? আমি কি করব এখন কে বলে দেবে?

...ঘড়িতে রাত আটটা বেজে দুই। টেলিফোন বেজে উঠল। বন্দনার বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল। ছুটে এসে ফোন ধরল! সাড়া দিল।

ওদিকে অপরিচিত কণ্ঠস্বরে কেউ জিগ্যেস করল, এই নম্বর কিনা। বন্দনা জানালো, হ্যাঁ, এই নম্বর।

পরিষ্কার বাংলায় ওদিক থেকে কথা ভেসে এলো।—এই মাত্র এক ভদ্রলোককে আমরা পি. জি. হাসপাতালে নিয়ে এসেছি, বছর তিরিশ একত্রিশ বয়েস, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি, গায়ের রং লালচে। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, লাল ধুসর কাচ···। তার পকেটের একটা কাগজে এই ফোন নম্বরটা লেখা ছিল, তাই ফোন করেছি—ও-রকম চেহারার আপনাদের পরিচিত কেউ আছে?

বন্দনার দম আটকে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে সন্দেহ ঝিলিক দিয়ে উঠল, এরাও ওই গ্যাং-এর লোক হতে পারে।

বঙ্কির চেহারা এত বছরে কেমন হয়েছে জানে না। জবাব না না দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে জিগ্যেস করল, কোন ওয়ার্ডে আছে?

এমারজেন্সি ওয়ার্ডে। আপনাদের লোক কিনা বলুন···ওই চেহারায় আপনার পরিচিত কেউ আছে?

হ্যাঁ, আমার ছেলে।

—তাহলে তো আপনার খুব বিপদ কেউ মাথায় আঘাত করেছে —আপনি আর একটুও সময় নষ্ট না করে এক্ষুনি চলে আসুন।

মুহূর্তের মধ্যে কে বুদ্ধি যোগাল বন্দনা জানে না। একটু সময় দরকার। মন বলছে তাকেও ফাঁদে ফেলার জন্য টেনে আনার ষড়যন্ত্র এটা। যতটা সম্ভব ব্যাকুল গলায় বলল, আমার স্বামীর বিশ পঁচিশ মিনিটের মধ্যে ফেরার কথা, তিনি এলেই আমি ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাচ্ছি, তার মধ্যে তিনি না এলে আমি একাই যাব···আপনারা যদি

দয়া করে ততক্ষণ একটু অপেক্ষা করেন।

ঠিক আছে, আমরা অপেক্ষা করছি—আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন চলে আসুন, ডাক্তার বলছে কেস সীরিয়াস। ইমিডিয়েট অপারেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

কেটে দিল।

...সত্যি কি? বঙ্কিকে কেউ গুরুতর জখম করেছে সন্দেহ নেই। আর আঘাতও নিঃসন্দেহে মাথাতেই করেছে, নইলে গলা দিয়ে যন্ত্রণার শব্দ বেরুত, টেলিফোনও ওভাবে হাত থেকে পড়ে যেত না। পাগলের মতো টেলিফোনে প্রথমে পি. জি'র নম্বর খুঁজল। কিন্তু মনে হতে থেমে গেল। না, নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। এটা বেশি রাত নয়, তবু এরই মধ্যে তাকে রাস্তায় পাওয়া গেল, তাকে পথের মানুষ তুলে হাসপাতালে নিয়ে এলো, তার পকেটে বাড়ির ফোন নম্বর পাওয়া গেল···তাকে ফোন করে চলে আসতে বলা হল—এত-সব হল কি করে? হয় কি করে? যারা মেরেছে তারা কি ওর পকেটে হাতড়ে দেখেনি? অন্য দিকে ওই গ্যাং জানে মেয়ে কাদের খপ্পরে পড়েছে তার মায়ের তা জানতে বাকি নেই। মেয়ে আর বাবা তাদেরই খপ্পরে, তাহলে সবার আগে এখন তারা কার মুখ বন্ধ করতে চাইবে? বন্দনার ছাড়া আর কার?

বন্দনা আবার ফোন তুলে খাসনবিশের বাড়ি ধরল। আটটা বেজে ছয়···! সাড়া পেল। না, দু'ভাইয়ের কেউ এখনো ফেরেনি। বন্দনা আবার তাগিদ দিল, আসা মাত্র যেন এই নম্বরে ফোন করা হয়—গুরুতর বিপদ।

···ঘড়িতে আটটা বেজে নয়। পাগলের মতো আবার ফোনের দিকে এগলো। কিন্তু তার আগেই ফোন বেজে উঠল।

হ্যালো?

আমি প্রবোধ খাসনবিশ, কি ব্যাপার?

খুব বিপদ। হাতে সময় নেই, যা বলি আপনি দয়া করে শুনে নিন। মিনিট চারেকের মধ্যে মেয়ের সিনেমার ব্যাপার থেকে বঙ্কির

আর তার পরের ফোনের খবর জানলো। বলল, শুনুন, আমার ধারণা, আমার গলির বাইরে ট্যাক্সি মজুত রেখেই ওরা আমাকে ট্র্যাপ করার জন্য হাসপাতালে আসতে বলেছে। তা যদি না হয়, ট্যাক্সি আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। আর যদি ওদের গ্যাং হয়, তারা আমাকে আমার মেয়ে আর তার বাবা যেখানে আছে সেখানেই নিয়ে যাবে—আমার বাড়ির ঠিকানা লিখে নেবার দরকার আছে? বাড়ি আপনার চেনা—

দরকার নেই, তাছাড়া দাদাও এসে গেছেন।

তাঁকে যা বলার আপনি বলুন, আর শুনুন, এখন থেকে ঘড়ি ধরে ঠিক পঁচিশ মিনিট বাদে আমি বেরিয়ে সামনে যে ট্যাক্সি পাব তাতে তাতে উঠব—ওই গ্যাঙের ট্যাক্সি হলেও—এর মধ্যে আপনাদের যদি কিছু করার থাকে করুন। আমি আমার মেয়ের কাছে যেতে চাই।

ও-দিক থেকে প্রবোধ খাসনবিশ কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আর একটি কথাও শুনতে না চেয়ে টেলিফোন নামিয়ে রাখল বন্দনা।

…পুলিশ চাইলে পনেরো মিনিটের মধ্যে গাড়িতে এখানে চলে আসতে পারে। আসুক না আসুক তারা কিছু করতে পারুক বন্দনা যাবে। ভীষণ কোনো ফাঁদে পড়তে যাচ্ছে জেনেও যাবে। তার কিছু হারানোর নেই। এই প্রাণেরও আর মায়া নেই।

পরনের শাড়িটাই ঠিক করে নিল। কালীর ফোটোর সামনে এসে দাঁড়াল একটু। তারপর ঠিক সময় ধরেই গলির বাইরে এসে দাঁড়াল। …একটু দূর থেকে একটা ট্যাক্সি এগিয়ে আসছে। ড্রাইভারকে পাশের লোকটা তাকাতে বন্দনা হাত তুলল। ট্যাক্সি থামল। বন্দনা উঠল। পা এতটুকু কাঁপল না। গলাও না। পি. জি. হসপিটাল।

ট্যাক্সি চলল। পিছনের আসনে স্থির হয়ে বসে বন্দনা সামনের লোক দুটোকে দেখছে। পাশে বা পিছনে কোন দিকে তাকাচ্ছে না। দু'মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি যে রাস্তায় খুব আস্তে বাঁক নিল সেখানে লোডশেডিং। হাসপাতালের ওটা পথ নয়। তবু বন্দনা খুব স্থির। খুব শান্ত। আরো গজ বিশেক এগিয়ে গাড়িটা প্রায় থেমে এলো,

আর সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারের পাশের লোক ঘুরে সোজা তার বুকের কাছে রিভলভার ধরল। হিসহিস কথা, একটুও শব্দ করবেন না মুখ বুজেই থাকুন!

পলকের মধ্যেই দু'দিকের দরজা খুলে দু'টো লোক উঠল—সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির স্পীড বাড়ল। লোক দুটো বন্দনার দু'পাশে বসল। একটুও আঁতকে না উঠলে ওদের সন্দেহ হবে। সে চেষ্টা করতেই এক-জনের চাপা হাসি। তারপর মুখ বুজে থাকার নির্মম ইশারা। সামনের লোক সোজা হয়ে বসেছে। এখন বন্দনার বাঁদিকের লোকের রিভলবার তার পাঁজর ছুঁয়ে আছে।

বন্দনা নিস্পন্দের মত বসে। এখনো ডাইনে বাঁয়ে বা পিছনে তাকাচ্ছে না। প্রবোধ খাসনবিশের অস্তিত্ব ধারে কাছে আছে কিনা জানতে চায় না। বন্দনা সবকিছুর জন্য প্রস্তুত।

তবু কিছু না বলাটা অস্বাভাবিক।—আমাকে ফোন তাহলে আপনারাই করেছিলেন···কি চান আপনারা?

রিভলবার হাতে লোকটা খুব চাপা গলায় ধমক দিল, একটি কথাও নয়, আমরা আপাতত আপনাকেই চাই।

গাড়িটা টালিগঞ্জ ছাড়িয়ে আরো দক্ষিণে চলল। রাস্তায় অজস্র গাড়ি। যাচ্ছে আর আসছে। তারপর ক্রমশ নির্জন, ফাঁকা।

ট্যাক্সি একটা কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকে একটা দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়াল। বাইরেটা অন্ধকার ভিতরে আলো জ্বলছে।

বন্দনাকে নামিয়ে ওরা সোজা দোতলায় নিয়ে তুলল। পিছনে একজনের রিভলবার পিঠ ছুঁয়ে আছে। দু'পাশে আর দু'জন। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠল। একটা ঘর পেরিয়ে আর এক ঘরে। সেখানে হাত-মুখ বাঁধা অবস্থায় বসে আছে মধুমিতা আর সুবীর রায়। ত্রাসে দু'জোড়া চোখ ঠিকরে পড়ছে। তার মধ্যে বন্দনাকে নিয়ে আসতে দেখে জোরে আর্তনাদ করে উঠতে চাইল দুজনেই, কিন্তু মুখ এত জোরে বাঁধা যে অস্ফুট গোঙানি ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না।

কিষেণ মোদী এগিয়ে এলো। বন্দনাকে এক নজর দেখে ওদের

একজনকে জিগ্যেস করল, এভরিথিং স্মুদ ?

সে মাথা নেড়ে সায় দিল।

মোদী বন্দনার কাছে এসে আবার দেখল একটু নিরীক্ষণ করে। বলল, সো সরি ম্যাডাম। আপনার ছেলেকে দেখতে চান ?

বন্দনা সোজা চেয়ে আছে। জবাব দিল না।

মোদী কাউকে ইশারা করতে সে ওদিকের পর্দাটা টেনে ধরল। বন্দনা, মধুমিতা তার বাবাও শিউরে উঠল। মেঝের ওপর একটা দেহ পড়ে আছে—বেঁচে আছে মনে হয় না। শুধু মধুমিতা বুঝল না মোহন কাপুর তার মায়ের ছেলে হল কেমন করে।

পর্দাটা ফেলে দেওয়া হল। মোদী সামান্য হেসে খুব অমায়িক সুরে আবার বলল, নট ইয়েট ডেড, বাট হি উইল বি ডেড সুন্...বোথ ইউ অ্যাণ্ড ইওর হাসব্যাণ্ড উইল ফলো হিম ট্যু ব্যাড ছাট ইউ নো সো মাচ নাও...ওনলি ইওর ডটার উইল বি সেফ উইথ আস, এ ফ্রেশ অ্যাণ্ড লাভলি ফ্লাওয়ার সি ইজ...উই নিড হার—

কথা শেষ হবার আগেই ঘরের প্রতিটি মানুষ সচকিত। একটা লোক দিশেহারার মত ছুটে এসে চেঁচিয়ে উঠল, পুলিশ !

সঙ্গে সঙ্গে নিচে, সিঁড়ির কাছে পর পর হুইস্‌ল্‌-এর শব্দ। ঘরের লোকগুলো এদিক-ওদিক ছুটল। কেবল গাড়ির সেই লোকটাই রিভলবার হাতে বন্দনাকে আগলে রেখেছিল। কয়েক পা ছুটে গিয়েও সে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর হিংস্র আক্রোশে বন্দনাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েই আবার ছুটল।

বন্দনা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

হাসপাতালের বড় কেবিনে চার হাত ফারাকের দুই বেড্-এ শুয়ে বন্দনা আর বহ্নি। বন্দনার কাঁধ ভেদ করে গুলি চলে গেছল। অজ্ঞান অবস্থাতেই অপারেশন করা হয়েছে। জ্ঞান ফেরার পরেও ডাক্তার তাকে দু'দিন ওষুধে প্রায় অজ্ঞান করে রেখেছিল। বহ্নিকে নিয়ে চারদিন যমে মানুষে টানাটানি গেছে। তার স্কাল অপারেশন

করতে হয়েছে। নিজের অবস্থা ভুলে বন্দনা ওর জন্যেই বেশি ব্যাকুল
ডাক্তার জানিয়েছে সংকট কেটেছে। গত রাতে জ্ঞান ফিরেছে। আর
সকালে বন্দনা তাকে নিজের কেবিনে আনিয়ে নিয়েছে।

এখন বিকেল। সুবীর রায় অদূরে চেয়ারে মাথা নিচু করে বসে
মনস্তাপের এমন মূর্তি আগে আর কখনো দেখা যায়নি। মধুমিতা
মাটিতে তুই হাঁটুর ওপর বসে মায়ের বিছানায় মুখ গুঁজে কেবল
কেঁদেই চলেছে। দরজার কাছে দু'জন পুলিশ মোতায়েন, বহ্নি রায়কে
এই কেবিনে নিয়ে আসার ফলে তাদেরও আসতে হয়েছে।

বন্দনার দিকে চেয়ে বহ্নি হাসছে মিটিমিটি। শরীরের এত যন্ত্রণা
যেন এখনও ওর ভিতর স্পর্শ করতে পারছে না। মধুমিতাকে একবার
দেখে নিয়ে হেসেই বলল, মেয়েটা যে কেঁদেই গেল সেই থেকে—ওকে
ঠেলে আমার কাছে পাঠাও তো ছোটমা।

বন্দনা ওর দিকেই চেয়ে আছে। ওকেই দেখছে। তুই চোখে
হাসি চিকচিক করছে। সঙ্গে বোধ হয় আরো কিছু।

তার দিকে চেয়ে এবারে বহ্নি বলল, ছোটমা, এমন করে দেখছ
কি, এখন যদি আমার সমস্ত জীবন জেল হয়, একটুও তুঃখ থাকবে
না। আমি কোনো একদিন আবার তোমার কাছে ফিরব বলেছিলাম
—ফিরলাম তো···

বিছানায় মুখ গুঁজেই মধুমিতা জোরে জোরে মাথা নাড়ল আর
ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। দাদার সমস্ত জীবন জেল হবার কথা শুনে
এই কান্না।

ঘরে ঢুকল প্রদোষ খাসনবিশ আর প্রবোধ খাসনবিশ। বহ্নি
কিছু বলছিল বাইরে থেকে দেখেই ভিতরে এসে হাসি মুখে প্রবোধ
খাসনবিশ জিগ্যেস করল, ছেলে কি বলছিল?

বন্দনার মুখ এখন বিষণ্ণ, ভারাক্রান্ত।—ও বলছিল, এরপর সমস্ত
জীবন জেল হলেও ওর একটুও তুঃখ থাকবে না।

প্রবোধ খাসনবিশের মুখে অকৃত্রিম হাসি। বহ্নির দিকে
তাকালো।— ইউ আর এ ব্রেভ ম্যান—জাস্ট মিসগাইডেড—তোমা

তে একদিনের জন্যও জেল না হয় সে ব্যবস্থা তোমাকে দিয়েই হবে—তোমার হাতেই ওদের মৃত্যুবাণ। বন্দনার দিকে ফিরল, আপনি ওর জন্যে কিছু ভাববেন না। দরজায় পুলিশ রাখার আসল কারণ ওই গ্যাঙের কোনো ছুট্ লোক ওকে ঘায়েল করে ওর মুখ বন্ধ করতে চাইতে পারে। হাসল আবার।—একটু ভাল হয়ে ক'দিনের কাগজ পড়বেন. কত বড় একটা ইনণ্টারন্যাশনাল র‍্যাকেটের গ্যাংকে আপনি আমাদের হাতের মুঠোয় পুরে দিয়েছেন—এদিকে মণিপুর আর নেপাল বর্ডার জুড়ে এদের ডেন—এ পর্যন্ত এই ওয়েস্ট বেঙ্গলেরই সতেরোটা মেয়ে ওদের খপ্পরে পড়ে নিখোঁজ হয়েছিল...এই ক'দিনেই

রও চারজনকে পাওয়া গেছে—আপনি সুস্থ জানলে কাগজের লোকেরা ছেঁকে ধরল বলে। অনেক কষ্টে ঠেকিয়ে রেখেছি।

কাগজের লোক নিয়ে বন্দনার এতটুকু আগ্রহ নেই, এমন কি যে গ্যাঙ ধরা পড়েছে তাদের নিয়েও না। বঙ্কির জেল হবার ভয় নেই শুনে কৃতজ্ঞ চোখে তার দিকে চেয়ে রইল। মৃদু মৃদু হেসে প্রদোষ খাসনবিশ বলল, আর ওর পুরস্কারের কথাটা বললি না?

ভাই হেসে উঠল।—শুধু আপনার বুদ্ধি আর অসম্ভব সাহসের জন্যেই এত বড় একটা ডেঞ্জারার্স গ্যাংকে এভাবে ধরা সম্ভব হয়েছে বলে এখানকার মিনিস্ট্রি থেকে আপনাকে বীরাঙ্গনা পুরস্কার দেবার জন্য সেণ্টারের কাছে সুপারিশ করা হবে শুনেছি।

বন্দনা প্রায় ঘাবড়ে গিয়ে বলে উঠল, না না, আপনারা এ সব করতে যাবেন না—আমি সকলকে ফিরে পেয়েছি আমার কাছে এর থেকে বড় পুরস্কার আর কিছু নেই! আর কিছু নেই!

প্রদোষ খাসনবিশ আর প্রবোধ খাসনবিশ তার দিকে চেয়ে তার ভিতরের সুষমাটুকুই দেখছে যেন। ওদিক থেকে সুবীর রায় নিজের স্ত্রীকেই নতুন করে দেখছে। বিছানা থেকে চোখের জলে ভেজা মুখ তুলে মধুমিতাও তার এত দেখা মাকে নতুন করে আবিষ্কার করছে।

অল্প অল্প হাসছে আর চেয়ে আছে বঙ্কিও। এই ছোটমাটিকে শুধু তারই যেন জানতে চিনতে কোন দিন ভুল হয়নি।

—শেষ—